SAGAR BEDE

By

Biswa Bandhu Sanyal

Sumit Kumar Sanyal

মূল্য আট টাকা মাত্র

প্রকাশক

শ্রীস্বপনকুমার বারিক

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী

শ্রীসব্যসাচী দাশগুপ্ত

মুদ্রক

শ্রীতীর্থনাথ পাল

নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস

২/১, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

প্রথমেই বলে রাখা দরকার—এটা নিছক একটা উপন্যাস নয়, যদিও কাহিনীর মাধ্যমেই বলা হয়েছে। আমি বলতে চেষ্টা করেছি সামগ্রিকভাবে নাবিকদের জীবনের কথা। তাদের সুখ দুঃখ হাসি কান্না সব কিছু। আর সঙ্গে সঙ্গে জানাতে চেষ্টা করেছি জাহাজ বস্তুটিকে। তবে বলতে চেষ্টা করলেও বলা তত সহজ হয় না সব সময়ে। উপন্যাসের রস মরে যায়। তাই অনেক কানুন কি অনেক যান্ত্রিকতার কথা বাদ দিয়ে যেতে হয়েছে। যেমন, জাহাজে কাজ নেবার কথা কেবলমাত্র আর্টিকল্‌এর ওপর দিয়ে সেরেছি এবং দেখিয়েছি ছ'মাসের আর্টিকলই কেবলমাত্র সই করান হয়। আসলে ছ'মাস এবং এক বৎসরের আর্টিকলা আছে। তাছাড়া কনট্রাক্টও করতে হয়। সে অনেক ল্যাঠা। লিখতে গেলে অযথা কচকচি বেড়ে যাবে বলেই এড়িয়ে যেতে হয়েছে। আসল কথা সেটা নয়। আসল কথা হচ্ছে—আমি চেষ্টা করেছি যাতে জাহাজ এবং জাহাজী জীবনকে স্পষ্ট করে পাঠকের চোখের ওপরে তুলে ধরা যায়। আর সেইজন্যই বেছে নিয়েছি কার্গো বা মালবাহী জাহাজ। যাত্রীবাহী জাহাজের সুযোগ সুবিধা যাদের নেই।

যদি তা পেরে থাকি তাহ'লেই বুঝব আমার পরিশ্রম সার্থক।

এই অবসরে বিশেষ দুইটি মানুষ, যাঁরা আমাকে উপদেশ ও প্রেরণা দিয়ে সাহায্য করেছেন, যাঁদের সাহায্য ছাড়া এই নাবিকদের কথা বলা আমার দ্বারা সম্ভব হ'ত না, তাঁদেরকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁরা দুইজন হলেন শ্রীবারীন্দ্র লাল মৈত্র ও শ্রীশক্তি বল।

ইতি

লেখক

সেই অনাদিকাল থেকে ঘরকে বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদে যারা ঘরছাড়া হ'য়ে এসে উঠেছে অর্ণবপোতে, যাদের নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে সাগরের বাতাস, তাদের নামেই উৎসর্গিত হ'ল এই **'সাগর বেদে'**

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

কেয়াঞ্জলি

কত ঘাট কত ঘটনা

মালিকা বেগম

সাগর বেদে

সাগর বেদে

ড্রাই-ডকিং-এর পালা চলেছে জাহাজের। চলবে এখন এই বুড়ো জাহাজকে যৌবনের রং দেবার কাজ মাস দেড়মাস ধরে। আমাদেরও প্রায় ছুটি। নামমাত্র ডিউটি দিয়ে যেতে হয় প্রতিদিন একবার করে। সেই সুযোগেই নিয়ে বসেছি দিস্তে কয়েক কাগজ আর গোটা দুই কলম। অকর্মা নাপিতের ধামা ভরা ক্ষুর। তাও স্ব-ইচ্ছায় বসিনি। ইচ্ছা এবং প্রেরণা চিনুর। আমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে সেও হ'য়ে পড়েছে কিছুটা অভিজ্ঞ, আমাদের অর্থাৎ জাহাজীদের জীবন সম্বন্ধে। তাই তার ভীষণ ইচ্ছা আমাদের কথা আমি নিয়ে এসে ফেলি তুনিয়ার চোখের সামনে।

তার কথা রাখতেই বসে গিয়েছি আমার কেবিনে। আধ দিস্তে কাগজ গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেয়। বুঝে উঠতে পারছি না কোথা থেকে আরম্ভ করব। গোড়া থেকে শেষে, না শেষ থেকে গোড়ায়? তার চাইতে যদি একটা ভাঙাচোরা বয়লার দিয়ে বলত সারিয়ে দিতে, বোধহয় অনেক সহজ হ'ত আমার পক্ষে। কলম ধরতে গেলেই ভিড় জমিয়ে আসে এতগুলি বৎসর ধরে দেখা অগুন্তি মানুষ আর বিচিত্র সব ঘটনা। কাকে রাখি আর কাকেই বা বাদ দিই? এ এক মহা ফ্যাঁকড়ায় ফেলেছে আমাকে চিনু।

মরণকে সামনে রেখে যারা খেলতে খেলতে হেলতে তুলতে পাড়ি মারে অসীম জলধির এধার থেকে ওধার, ঘরকে বাঁচাতে গিয়ে যারা হয়েছে ঘরছাড়া, তারা যেন তুনিয়াব্যাপী মানব-সমাজের ভেতরে থেকেও তাদের কেউ নয়। নিজেদের নিয়ে নিজেরাই গড়ে তুলেছে এক নতুন সমাজ। সে সমাজ চির যাযাবর বেদেদেরই মত। হাসলে দেখবার কেউ নেই। চোখের জল সমুদ্রের লোনা জলে যায় মিশে। তাই তারা ছিনিয়ে নেয় তাদের সাময়িক সুখটুকু তুনিয়ার বুক থেকে। সেখানে তারা নিষ্করুণ। চরম আত্মকেন্দ্রিক।

বিড়ম্বিত-ভাগ্য এই জলচারীদের ভেতরে আমিও একজন। ছোটকাল থেকেই টানত আমাকে বিদেশের মাটি। গল্পের বইএর চাইতে ভ্রমণ-

বৃত্তান্তের দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। তাই আপন বিবেচনা অনুযায়ীই কৈশোর যৌবনের মাঝখানে ম্যাট্রিক পাশ করেই ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম বি. ও. এ. টি. পড়বার জন্যে। তারপর একের পর এক। ট্রেনিং পাশ হ'তে মেরিন্ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত। মোটে পাঁচটিত' ছিল সরকার অনুমোদিত কারখানা। নিলে ওরাই নেবে। নৈলে বি. ও. এ. টি. আর জাহাজ পর্যন্ত এগুলো না। 'বোট' হয়ে গেল।

আমাদের দিনেশ মজুমদার মাঝে মাঝে সংস্কৃত বলত। ও নাকি পাঠ্য-জীবনে সংস্কৃতে খুব ভাল ছিল। তার ভেতরে যেটি প্রায়শঃই বলত সেটি হচ্ছে—ভাগ্যে লিখিতং ধাতা, খণ্ডায় কোন বেটাচ্ছেলে। ব্যাকরণ-কৌমুদী দিয়ে হিসেব করে দেখিনি তার কথার কতটুকু অংশ সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। কিন্তু ভাগ্যের ব্যাকরণ-কৌমুদী অনুযায়ী কথাটি যে একদম নিকষিত হেম তা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। নৈলে আমার মত মানুষও কিনা তিন তিনটি কারখানা থেকে ইণ্টারভিউ এবং পরে নিয়োগ পত্র পায়!

যাইহ'ক, কোম্পানী বাছাই ক'রে একটিতে যোগ দিলাম যখন তখনও উনবিংশ বৎসরের জন্মতিথিটি আমার চাপা পড়ে রয়েছে দেয়াল-পঞ্জীর কয়েকটি পৃষ্ঠার নিচে।

দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষানবিসি। এক একটি বৎসর যায় আর মনে হয় বুকের ওপরে চাপানো পাঁচটি পাথর থেকে খসে গেল একটি। মাথার ভেতরে অহরহ হিস্ হিস্ করতে থাকে ইঞ্জিনগুলি। স্টীম, টারবাইন আর ডিজেল। এরই ভেতরে, তিনবৎসরের মাথায় একটি ঘটনা ঘটে গেল কারখানায়। কামারশাল, লেদ, টার্ণার ক'রে পুরো একটি কারখানার কাজে ওস্তাদ ক'রে তুলতে হবে আমাদের। দম নেবার সময় নেই, দেয়ও না ওরা। যে জীবনী-শক্তি নিয়ে কাজে আসি, ফিরে যাই তার সমস্তখানিই খুইয়ে দিয়ে। প্রতিদিনই যেন একটি করে ঝড় বয়ে যায় শরীরের ওপর দিয়ে। এ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই ক'রতে হ'লে শুধুমাত্র শারীরিক শক্তি থাকলেই

চলে না। মনোবলও চাই প্রচুর। তারই অভাব ছিল চিন্ময়ের। মাঝে মাঝে গুঙরিয়ে উঠত সে—আমি ভাই আর পারবনা।

পারলও না। আট্‌কে ছিলাম নিজের কাজে। লেদের একটা নতুন কাজ শেখাচ্ছিল হেড মিস্ত্রী। বিদ্যে তার মাথায় নয়, চোখের দৃষ্টিতে আর আঙ্গুলের ডগায়। চোখ তার যন্ত্রের মাপ বলে দেয়। তার দৃষ্টিশক্তি নিজের চোখদুটিতে ধরে নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় একটা গোলমাল শোনা যায় মিলিং সেকশান থেকে। হাতের কাজ ফেলে রেখে ছুটে যাই ওদিকে। দেখি, কাজ ক'রতে ক'রতে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছে চিন্ময়। ধরাধরি ক'রে তাকে কারখানার বাইরে নিয়ে গিয়ে দিলাম শুইয়ে। কিছুক্ষণের চেষ্টায় জ্ঞানও ফিরে এল। কিন্তু খুব দুর্বল। বাসে চেপে বাড়ি ফিরবার শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট নেই তার শরীরে। বাধ্য হয়েই কাঁধ দিতে হ'ল। একটা ট্যাক্সি জোগাড় ক'রে এনে তাকে নিয়ে গেলাম তার বাড়ি। তারপর কতবার ভেবেছি—কেন গেলাম? আমি না গেলে আর কেউ যেত নিশ্চয়ই। আমার অত দায়টা ছিল কিসের? কিন্তু ঐ যে দিনেশ বলত—ভাগ্যে লিখিতং ধাতা—

চিন্ময়দের বাড়িতে সেই আমার প্রথম পদার্পণ। তাও আবার অসুস্থ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। একাধারে লজ্জার জড়তা আর কর্তব্যবোধের সহজতা—চলেছে মোরগের লড়াই। এমনই এক অবস্থায় চিন্ময়কে সঙ্গে নিয়ে ঢুকি বাড়ির ভেতরে।

সেদিনই প্রথম দেখলাম চিনুকে। সদর দরজা খুলে দিয়েই হকচকিয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন ক'রতে পারেনি কোন। আমিও আপনা থেকে বলতে পারিনি কিছু। চিন্ময়কে ধরে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সে যাচ্ছিল আমাদের আগে আগে। যাচ্ছিল আর বারে বারেই ফিরে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। দাদা অসুস্থ। মনের ভেতরে আকুলি বিকুলি ভাব। কিন্তু বুঝে পাচ্ছে না কি তার কর্তব্য এখন। ক্ষণে ক্ষণেই তাকায় আমার মুখের দিকে। মায়ায় ভরা দুটি চোখে তার কত না জিজ্ঞাসা। আমিও তেমনি অভিজ্ঞতায় তে-মাথা। তবুও খাটো করতে পারি না নিজেকে। চিন্ময়কে শুইয়ে দিয়ে বলি—একটু দুধ গরম ক'রে আনুন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ধমক্ আসে চিন্ময়ের তরফ থেকে—আপনি কিরে? চিনু আমার চাইতে চার বছরের ছোট। তার বাক্যটির উদ্দেশ্যের মুখখানি দেখা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে কিন্তু বিধেয় যে রঙীন হ'য়ে উঠেছে তা বেশ স্পষ্টই দেখেছিলাম সেদিন। যৌবনের রং। এ লালিমা যতদিন ফুটে ওঠে ততদিনই যৌবন ভাণ্ডারের মধু থা ̈ক অক্ষয়। মিলোয় যখন তখন সে মধুতেও ধরে টান। রং-চটা পাত্রের তখ.: আকর্ষণ কম, কর্তব্য অধিক।

একটা কথা আছে—আগাড়ি দর্শণধারী, পিছাড়ি গুণ বিচারি। ঠিক সেই রকমই হচ্ছে—প্রথমে চোখের নেশা, পরেতে হৃদয়ে মেশা। হয়ত' চোখেরই নেশা, বুঝতে পারিনি ঠিক। যেমন বুঝতে পারিনি আমার কাজকে। জাহাজ চিনেছি, বিভিন্ন ধরণের ইঞ্জিন আর তাদের কাজও জেনেছি। শুধু বুঝতে পারিনি সমুদ্রের বুকে ভাসবার পর তার দায়িত্ব কতখানি। টেলিফোনের দিকে সজাগ কান রেখে আর মিটার বোর্ডের ওপরে দৃষ্টি গেঁথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা গহ্বরের ভেতরে কাটিয়ে দেবার অভিজ্ঞতা তখনও লেখা হয়নি আমার মনের ডাইরীতে। ভবিষ্যতের দিনগুলি তাই তখনও স্বপ্নে রঙীন।

আর এক স্বপ্ন চিনুকে ঘিরে। কেরানীগিরির সহজ রাস্তা বেছে নিয়েছে চিন্ময়। বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ-সূত্র। কারণ নেই আর তাদের বাড়ি যাওয়ার। তবুও এক একদিন ফিরবার পথে কে যেন কান ধরে টেনে নামায় বাস থেকে। চিন্ময় বা তার বাবা কেউই তখনও ফেরেনি অফিস থেকে। নিশ্চিন্ত মনেই কড়া নাড়ি নির্দিষ্ট বাড়ির দরজার। ঘটাং করে খুলে যায় সেটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই অনুযোগ—এতদিনে বুঝি আসবার সময় হ'ল? ভাবি তাই, সময়ে ঐ অনুযোগটুকুও কত মিষ্টিই না লাগে। এক মাঝির গান শুনেছিলাম, মনে আছে—

মনুরে তুই গুটাস্‌নে তোর পাখনা দু'খানা,
নদীর বুকে বসত করি আমরা দু'জনা।
নাও এর বুকে আমি যেমন, আমার বুকে সে,
আগড়ুম বাগড়ুম কত কথা জলেরই দেশে।

তাই, আগড়ুম বাগড়ুম কত কথাই বটে। কোথা দিয়ে কেটে যায় এক ঘণ্টা সময়। শুধু একঘণ্টা নয়, আরও দুটো বছর পার হ'য়ে গেল কোথা দিয়ে। আসন্ন সময়। জীবনের বিচরণ-ক্ষেত্র রেখাঙ্কিত হ'য়ে যাবে এবার। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কাজ দেখে চলেছে ফোরম্যান। অকৃত-কার্যতায় ফিরে যেতে হবে কেরানীগিরির বন্দীশালায়। বাধ্য হ'য়েই ভুলতে হ'ল চিনুকে। দীর্ঘ কয়টি মাস শুধু বয়লার, ইঞ্জিন, রিভলিউশান কাউণ্টার, স্টিয়ারিং—আমি আর আমি নয়, মূর্ত্তিমান একটি জাহাজে পরিণত হয়ে গেলাম যেন। ঘুমের ঘোরেও মাষ্টারের সঙ্গে ভয়েস পাইপে কথা বলেছি কিনা কে জানে।

সে সাধনা সার্থক কিনা আজও বুঝতে পারিনি ঠিক। তবে ফল হ'য়েছিল ভালই এবং সার্টিফিকেটও পেয়েছিলাম কারখানার কাছ থেকে। সে কি আনন্দ চিনুর। আজও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই সে দৃশ্য। বাঁধন হারিয়ে ফেলেছে সে। এতদিনের পরিচয় এবং মন বদলের পালা শেষ করেও নিজেকে টেনে সরিয়ে রাখত যে চিনু সে-ই সেদিন ছুটে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে। গলার স্বর নেমে গিয়েছে ফিস্‌ফিসানিতে। উন্মুখ দৃষ্টি মেলে ধরেছে আমার মুখের দিকে। আনন্দের বাষ্পে সে দুটি ছাওয়া। মুখর তারা তাদের ভাষায়। পাঠকের নাম যার হৃদয়। পাঠ ক'রে চলেছি। একটু কাঁপনও জেগেছে মনে। বসন্তের হাওয়া লেগে যেভাবে কাঁপে বন-পলাশ। তার রক্তিম বুকে মিলনের সুর। আমার পরম পাওয়ার সে মুহূর্ত্তখানি ভুলবার নয়। দু'হাতে তার মুখখানি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম—তুমি খুশী? বুকের ভেতরে মুখ গুঁজে মাথা ঝাঁকিয়েছিল সে। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেছিল—তুমি কত বড় হবে। কত দেশ দেখবে। তারপরই সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে—আমাকে সঙ্গে নেবে না? অবোধ প্রশ্ন। বুঝি। তবুও এক কথায় 'না' বলতে নিজের বুকেই অনুভব করি যে ব্যথা বাজতে পারে তার বুকে। একটু ঘুরিয়ে বলি—আমাদের দেশের জাহাজে সে নিয়ম এখনও হয়নি যে।

বারে, তাহ'লে আমি বুঝি বসে বসে শুধু দিন গুণব?

সে মেয়ের অভিমান ভাঙাতে বেশ কয়েক ঢোক ঘোল খেতে হয়েছিল আমাকে সেদিন। তবুও অনুভব করেছিলাম হৃদয়ের পূর্ণতা। মন-মরুর ক্ষুধা সহজে মেটে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পাচ্ছে দ্রৌপদীর শাক-অন্ন একটুখানি ভালবাসার পরশ। আপন ভাগ্যকে ধন্য মেনে দ্বিগুণ উৎসাহে দরখাস্তের পর দরখাস্ত ছেড়ে চলেছিলাম।

তারপর একে একে কোথা দিয়ে পার হ'য়ে গেল কয়টি মাস। মনের কোণে হতাশার ছায়া। বাড়ির চোখও রুক্ষ। মুখে কিছু না বললেও বুঝতে কষ্ট হয় না একটুও। দোষ দিই না তাদের। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের সাধনার পর স্বর্ণ-ডিম্বের পরিবর্তে যদি অশ্বডিম্ব ফললাভ ঘটে তাহ'লে অন্যপরে কা কথা মুনিঋষিরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। চিনু বলে—দেখ অশোকদা, শুধু মন্ত্রপাঠ করলেই যদি কাজ হ'ত তাহলে মানুষে তীর্থস্থানে যাওয়ার কষ্ট ভোগ করত না। আকাশ তার অন্তরের চেহারা লুকোতে পারে না। সহজেই প্রকাশ হ'য়ে যায় তার মুখের ওপরে। কিন্তু প্রকৃতির অন্তরে কি আছে তা প্রণিধান করা সহজসাধ্য নয়। অনেক আয়োজন, নিয়োজন এবং বিশ্লেষণের পর ধরা দেবে তা। চিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চেষ্টা করি তার অন্তরকে। সাধ্যকি। আনাড়িত' এ রাস্তায়। তাই দৃষ্টির সুড়ঙ্গ পথে নামতে গিয়ে শুধু 'নয়নে তোমার নয়ন রাখি' হ'য়ে যায়। যৌবন-সূর্যের লাল রংটি আবার ফুটে ওঠে তার শুভ্র কোমল কপোলে।

কি দেখছ অমন ক'রে? জিজ্ঞাসা করে সে।

হতাশ হ'য়ে গিয়েছ, না?

যাঃ, হতাশ হব কেন? কাজ তোমার ঠিকই হবে, ভালোই হবে। আশার ভরসা দেয় সে—ফুলত' ফোটেনি এখনও।

কার ফুল? তোমার, না আমার?

ধ্যেৎ—ঘুরে একদম আমার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় সে। স্পষ্ট অনুভব করি আমার পিঠের ওপরে তার কোমল মুখের স্পর্শ। বলে—সে ফুলত' তোমার আমার একসঙ্গেই ফুটবে।

সে ফুল কি ফুটেছিল? চিনুর, কি আমার?

কথা মেনেছিলাম তার। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজীদের তীর্থস্থান 'ডক'গুলিতেও ধর্ণা দিতে আরম্ভ করেছিলাম। সকাল হ'তে না হ'তেই তৈরী হ'য়ে নিই ধর্ণা দেবার জন্যে। ডে-ডিউটির অফিসাররা ঠিক সাতটায় গিয়ে জাহাজে উঠবে। তার মুখেই গিয়ে তাদের কাউকে ধরে জেনে নিতে হবে কোন জাহাজে ইঞ্জিনীয়ারের কাজ খালি হ'য়েছে বা অতি শীঘ্র হ'তে পারে। পারি না শুধু পোর্ট-কমিশনার্সের এলাকার ভেতরে ঢুকতে। নিষিদ্ধ দেশ। বাবু ঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট, খিদিরপুর ডক, এক একদিন এক এক তীর্থ। কলকাতাবাসী অফিসারেরা আসে, 'বোট' বলে একবার হাঁক দেয়, তারপর তরণীর সাহায্যে তরিয়ে গিয়ে ওঠে নির্দিষ্ট জলযানে। অপাংক্তেয় আমি পড়ে থাকি নিমন্ত্রণ বাড়ির দরজার বাইরে অনাহূতের মত। পতিতপাবনীর পূত সমীরণও কেমন স্তব্ধ ভার বোধ হয়। চিড় ধরতে থাকে পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে ফিরবার রঙীন স্বপ্নখানির গায়ে। এমন সময় আলাপ হ'য়ে গেল মাণিক দত্তের সঙ্গে। ভদ্রলোকের দরজীর দোকান আছে খিদিরপুরে। জাহাজের নাবিক খালাসীদের পোষাক তৈরী করাই তার প্রধান কাজ। জাহাজে জাহাজে ঘুরবার 'পাশ'ও তার আছে।

দাঁড়িয়েছিলাম সিঁড়ির ধারে। একটু দূরেই জলে গা ভাসিয়ে রয়েছে এস, এস অর্থাৎ ষ্টীমসীপ রাজহংসী। পূর্বদিনই মাত্র এসে ভিড়েছে ঘাটে। কার্গো জাহাজ। পেট তার চালানি মালের ডিমে বোঝাই। ক্রেনের সাহায্যে খালাশ হচ্ছে সেই ডিমের রাশি। খালাশ হবে, তারপর আবার হবে পূর্ণগর্ভা, তবে তার যাত্রা হবে সুরু। সে কমসে কম সাত আট দিনের ধাক্কা। দৃষ্টির ঠোঁট দু'খানি দিয়ে সেই রাজহংসীর গায়ের পালকগুলিই দিচ্ছিলাম নেড়ে। এমন সময় কে একজন পাশ থেকে বলে ওঠে—ওটায় যাবেন নাকি ?

চমকে ফিরে তাকাই প্রশ্নকর্তার দিকে। মনের আকাশে চিড়িক ক'রে ওঠে আশার আলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা প্রশ্ন করি—আপনি কি ওখানে কাজ করেন ?

উত্তরে জ্বলে ওঠা আলোটিকে বেশ ভালভাবে নিবিয়ে দিয়ে সে বল্লে—না। আমার দরজীর দোকান আছে। আপনি বুঝি কাজ খুঁজছেন?

হঁ্যা। মেরিন-ইঞ্জিনীয়ারিং শিখেছি। দরখাস্তও করেছি অনেক।

ফলাফল যে কি হ'য়েছে তা আর স্পষ্ট ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই। তীর্থস্থানে হত্যা দেওয়া দেখেই বুঝে নিতে পারে সুধীজন।

গুম্ হ'য়ে গেল মানুষটা। ধ্যানস্থ যেন। মা জাহ্নবীকে সামনে রেখে যেন কোন মাড়োয়ার-নন্দন তার বিগতদিনের ব্যবসায়ে লাভের পাপ-স্খালনের জন্যে মন্ত্রোচ্চারণ ক'রছে—সর্ব্বপাপো হরো মাতা। আমি ব্যোম্। কোথায় ভেবেছিলাম জাহাজে জাহাজে ঘোরা মানুষের কাছে একটু খোঁজ খবর পাওয়া যেতে পারে—হঠাৎ নজরে পড়ে একটু দূরে অপেক্ষমান 'অরুণা'র সামনের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে একজন চীনা সাহেব। যেমন নজরে পড়া অমনি পাশের মানুষটির কথা ভুলে যাওয়া। 'হ্যালো সাহেব' বলে ছুটতে যাব, জেগে ওঠে মানিক দত্ত।

গোটা পাঁচেক টাকা হবে?

মোক্ষম বাধা। শুনুন টুনুন নয়, একেবারে মালকড়ির প্রশ্ন। গোঁৎ খেয়ে থেমে যেতে হয়।

নাত'। কেন?

কোন সময়েই থাকে না। কাজের চেষ্টায় বেরুবেন, তাও গোনাগুনতি পয়সা নিয়ে।

হেসে ফেলি দত্তের কথায়। সে ত' আর জানেনা যে আসবার সময় বাসের ভাড়াটা কোন রকমে জোটাতে পেরেছিলাম। যাবার বেলায় পা দুটিই সম্বল।

আসুন, বলে এগিয়ে যেতে থাকে দত্ত। আমি সম্মোহিত-প্রায় চলতে থাকি তার পিছন পিছন।

সেই মাণিক দত্তকে ভুলতে পারব না কোনওদিন। যে সুর বাঁধতে গিয়ে বারে বারেই বিফল হ'য়েছি, উঠে এসেছি আসর থেকে অক্ষমতার

কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে নিয়ে, সেই সুর আপন হাতে বেঁধে দিল সে।

ইডেন গার্ডেনএর মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এসেছিল বেলেঘাটায়। আমি ভাবি, ভদ্রলোক বুঝি দয়া ক'রে চলেছেন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। মনের ভাবনা চলেছে সেই রাস্তা ধরে। এমন সময় একটা গলির ভেতরে ট্যাক্সিটা ঢুকছে দেখে চেঁচিয়ে উঠি—এ গলি নয়, এ গলি নয়। এর পাশেরটা।

কি এর পাশেরটা? দত্তের গলায় বিরক্তির সুর। বাধা পড়ায় ঘ্যাঁচ্ ক'রে থেমে গিয়েছে ট্যাক্সি।

আমাদের বাড়ি। নির্বোধ উত্তর দিই আমি।

আশ্চর্য! পাশের গলিতে আপনার বাড়ি? অথচ জানেন না যে এখানেই একজন ইঞ্জিনীয়ার থাকেন?

উত্তর দিই না সে কথার। ট্যাক্সিটা ততক্ষণে আবার এগুতে আরম্ভ করেছে সঠিক নির্দেশ পেয়ে। আমি শুধু ভাবছি জানার অহঙ্কারে এতই মশগুল আমরা যে একবার ভুলেও পরিমাপ নিয়ে দেখি না আমাদের সেই জানার পরিধি কত ছোট। যে পল্লীর বুকে বাস ক'রে শেষ করলাম আমার পাঠ্য জীবন, পা বাড়িয়েছি দুনিয়ার খোঁজ নিতে, সেই পল্লীই রয়েছে আমার অচেনা। আর দূরের মানুষ মাণিক দত্ত এসেছে আমাকে সেই নিকটের মানুষটিকে চিনিয়ে দিতে। লজ্জায় অধোবদন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

একটু এগিয়ে ডানদিকে মোড় ঘুরেই দাঁড়িয়ে যায় ট্যাক্সি। নেমে পড়ে দত্ত। আমি পশ্চাতে। 'একটু দাঁড়াও' বলে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করবার আদেশ জানিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির দরজার কড়া ধরে নাড়া দেয় সে। 'কে?' বলে এক ভদ্রলোক দরজা খুলে এসে দাঁড়ান। তাঁকে দেখেই হৈ হৈ ক'রে ওঠে দত্ত।

কি ব্যাপার কমলবাবু, একদম দেখা সাক্ষাৎ নেই। কোন কিছুর অর্ডার নেই। ডুব মারলেন নাকি?

হ্যাঁ। একমাসের জন্যে।

একমাস !

যেন জাহাজীদের জীবনে তিরিশটি দিন ছুটি উপভোগ করবার নজীর এই প্রথম, এমনভাবেই শব্দটাকে উচ্চারণ করে দত্ত। তারপরই বদলে যায় তার সুর—তা কাকে লাগালেন আপনার বদলিতে ?

নেয়নি বোধহয় এখনও কাউকে।

তাহলে একে একটা চান্স ক'রে দিন না সার। মিনতিতে ভরপুর মাণিক দত্তের গলার সুর—আপনাদেরই পাশের গলিতে থাকে। সার্টিফিকেট আছে কারখানার।

কমলবাবুর দৃষ্টি আমার মুখের ওপরে। জীবনে একটিবারই মাত্র ইণ্টারভিউএর সম্মুখীন হ'য়েছি কারখানায় ঢোকবার সময়ে। তাতেও আমি ঘাবড়ে যাইনি। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তে মনে হয় স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ যেন ঠিকমত চলছে না আমার। আর সে ভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে। ভয় হয় যদি এ সময়ে কোন বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন করে বসেন কমলবাবু !

কি কি ধরণের বয়লারে কাজ করেছেন ?

দুম্‌ ক'রে জিজ্ঞাসা করে বসেন কমলবাবু।

তবু ভাল, বয়লার সম্বন্ধে প্রশ্ন। এক ডাক্তারীর অনেক দিক। চোখ, দাঁত, বুক, গলা ক'রে দিকের অন্ত নেই। এক একজন এক এক দিকে ছোটে।. তেমনি জাহাজী বিদ্যারও অনেক দিক। আমি ইঞ্জিন আর বয়লারকেই রপ্ত করেছি। প্রশ্নটাও সেই মুখো। ঝট্‌পট্‌ উত্তর দিই—ট্যাঙ্ক টাইপ বয়লার আর ওয়াটার টিউব বয়লারে কাজ করেছি।

আবার প্রশ্ন—কত রকম স্টীমইঞ্জিন দেখেছেন ?

উত্তর—রেসিপ্রোকেটিং এবং স্টীম টারবাইন্‌।

প্রশ্নের পালা শেষ। দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মাণিক দত্তের ওপরে।

একটা ট্যাক্সি দেখুন। আমি তৈরী হয়ে আসছি।

ট্যাক্সি ওয়েটিংএ রয়েছে। উত্তর দেয় দত্ত।

তাহলে একটু দাঁড়ান, বলে ঘরের ভেতরে ঢুকে যান কমলবাবু।

একদিনে সাড়ে দশটাকা ট্যাক্সিভাড়া গচ্ছা দিয়ে তবে কাজ হ'ল আমার। কার্গো অর্থাৎ মালবাহী জাহাজ এস, এস, কমলায়। ক্যাপ্টেনের

সামনে সই ক'রে দিলাম আর্টিকল্‌এ। সে আবার আর এক ফ্যাঁকড়া। চাকরী হবে কোম্পানীর অধীনে। নিয়োগপত্র আসবে সেখান থেকে।. মাইনেও দেবে তারাই। কিন্তু কনট্রাক্ট হবে পরিবহন মন্ত্রীদপ্তরের সঙ্গে। তাঁদেরই প্রতিনিধি হ'য়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ লকার সই করিয়ে নিলেন আর্টিকিল্‌এ। কাগজে পত্তরে ছ'মাসের চুক্তি। তার কমে হয় না। কিন্তু আসলে একমাস। হ'ক একমাস। এই অভিজ্ঞতার নজীর দেখিয়েই হবে ছ'মাসের কাজ। ধীরে করি গিরিরে লঙ্ঘন। কিছু অগ্রিমও এসে গেল হাতে। মিঃ লকার হুঁসিয়ার ক'রে দিলেন—২২ তারিখ বিকেল বেলা আমরা জাহাজ ছাড়ছি। তোমাকে সকাল ৮টার ভেতরেই এসে জাহাজে উঠতে হবে। ঐ একটুখানিই নয়। উপদেশের ছড়াছড়ি। কিছু কানে যায়, কিছু যায় না। মনরে, তুই গুটাস্‌নে তোর পাখ্‌না ছ'খানা। উড়ে যেতে ইচ্ছে করে ঐ যেখানে মন-জাহাজ আমার নোঙর ফেলেছে। কিন্তু এই কাঠখোট্টা মানুষটার সে জ্ঞানগম্যি কি কিছু আছে? নিজের উপদেশ-পুরাণ শেষ হ'তেই ডাক পড়ে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের। চীফের সঙ্গে আমাকে লটকে দিয়ে বিদায় নিলেন লকার। আমরা চললাম অতল গহ্বরে, যেখানে পাঁচজন ইঞ্জিনীয়ার আর দশজন খালাসীর তত্ত্বাবধানে সযত্নে রাখা হয়েছে 'কমলা'র পরাণ-পাখী। তার নাড়িনক্ষত্রের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'তেই পড়ে আসে বেলা।

চলুন। অনেক দেখাশোনা হ'ল। তারপর জাহাজ ছাড়লে এই-ই হ'য়ে যাবে ঘড়-বাড়ি। এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে টিফিন খেয়ে বাড়ি যাবেন।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বেশ তালেই গাইছিলেন তিনি—

মানিক দত্তের সঙ্গে আপনারত' আলাপ আছে। ওর কাছে আপনার মাপটা দিয়ে আসবেন। আর্জেণ্ট অর্ডার। একটা ওভার-অল আর একপ্রস্থ অফিসারস্‌ ড্রেস বানিয়ে দেবে।

তারপরই হঠাৎ বেখাপ্পা বেতালা গেয়ে ওঠেন—আর এ ক'দিন সকাল ৭টায় আসবেন, ছুটি বিকেল ৪টায়।

আহা, কথা নয়ত' মস্তিষ্ক প্রদাহে ঘৃতকাঞ্চনের প্রলেপ! এমন সুখবরটা

চিনুকে জানাবার একটু সুযোগও মিলবে না আমার! আজকের কর্ম কাবার। এতক্ষণে ওর বাবা, দাদা দু'জনেই বেরিয়ে পড়েছে অফিস থেকে। আর কাল থেকে পিঞ্জরাবদ্ধ। তাহ'লে? মরিয়া হ'য়ে একবার ব'লতে চেষ্টা করি—ক্যাপ্‌টেন বললেন যে ২২ তারিখে আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে।

তা বলতে পারেন। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দেন চীফ—তবে ইঞ্জিন-রুমের সমস্ত দায়িত্ব আমার।

এরপর আর কথা নেই। এ কয়টিদিন কপালে বেগার খাটা লেখা আছে বুঝতে পারলাম। আরও কত কি লেখা আছে কে জানে। ওপরের ডেকে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিয়ে ওঠেন চীফ—রতন, ফিফ্‌থ্‌ ইঞ্জিনীয়ারের কেবিনটা খুলে দিতে বল সুখানীকে আর মিঃ সরকারের টিফিন এনে দাও।

চীফ বোস, আমিও ঘোষ। 'সরকার'টাত' মলাট। মনে মনে ঠিক করে গিয়েই জাহাজে উঠি পরদিন সকালে—দেখি, আজ তুমি ঠেকাও কি ক'রে আমার চিনুর কাছে যাওয়া। চীফ তখনও গরহাজির। ক্যাপ্টেনত' বটেই। সোজা গিয়ে ঢুকি ফোর্থ ইঞ্জিনীয়ার স্যামুয়েলের ঘরে। মাদ্রাজী ক্রীশ্চান। ভদ্রলোকের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার বিষয় নিয়ে আলাপ জমাতে থাকি। প্রথম যখন জাহাজের কাজে এল তখন সামুদ্রিক অসুস্থতা হ'য়েছিল কিনা। কাজটি অত্যন্ত একঘেয়ে বোধ হয় কিনা ইত্যাদি। হেসে হেসেই উত্তর দেয় সে আমার সব কথার। এবং সবশেষে যোগ করে—শুধু মাইনেটাই এখানকার যা মোলায়েম, আর কিছু নয়। যা বোঝবার সবই বোঝা গেল ঐ একটি কথায়। যা বোঝা গেল না, তা হচ্ছে বাইরের দুনিয়া কি টানেনা ভদ্রলোককে? তারই উন্মাদ করা নেশাতেই কি সে ছুটে এসে স্বীকার ক'রে নেয়নি এই ভাসমান জীবন? আমি কিন্তু এখনও অনুভব করি আমার ভেতরে ছিল সেই উদ্দাম আকাঙ্খাটি। মনে পড়ে, পাঠ্যজীবনে একখানি বই আমাকে অত্যধিক আকর্ষণ করত। সেটি হচ্ছে ম্যাপবই। তার বন্দরে বন্দরে পড়েছিল আমার পেন্‌সিলের দাগ। এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরের

দূরত্বও অনেক ক্ষেত্রে ছিল মুখস্থ। এখনও বলতে পারি নাগপট্টম্ থেকে কলম্বো, অবশ্য সিংহল দ্বীপ প্রদক্ষিণ ক'রে, প্রায় পাঁচশত মাইল। তাই বোধহয় অন্য কোন লাইন ধরবার কথা চিন্তাও করতে পারিনি। বেছে নিয়েছিলাম বি, ও, এ, টি।

মা মাঝে মাঝে ছড়া কাটেন। শুনে শুনে আমারও কতকগুলো ছড়া মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—এ কথা সে কথা, দেলো দিদি আলাপাতা। সে নীতি আমিও প্রয়োগ করি এখানে। ফোর্থকে বলি—দেখুন, চীফ বলেছেন আজ সকাল থেকেই ইঞ্জিন-রুমে কাজ করতে। কিন্তু আমারত' পোষাক নেই। এই কোট প্যান্ট নিয়ে—

অসম্ভব। বলে ওঠে ফোর্থ, আপনি ওভার-অলএর অর্ডার দিতে চলে যান। আমি চীফকে বুঝিয়ে বলব। অর্ডার দিয়ে আবার এখানে আসবেন কিন্তু, নৈলে খিঁচে যাবেন। বলেছেন যখন, কাজ করুন বা না করুন, জাহাজে হাজির থাকতে হবে।

আলাপাতা যখন জুটেছে দিদির সঙ্গে প্রয়োজনও তখন মিটেছে। স্যামুয়েল সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে তর্ তর্ করে নেমে যাই জাহাজের গায়ে ঝোলান সিঁড়ি বেয়ে। শেষ ধাপের জন্যে পা বাড়িয়েই হাঁক দিই—বোট!

সোজা খিদিরপুর। তিনটি জিনিস দেবার ছিল মানিক দত্তকে। প্রথম ধন্যবাদ, দ্বিতীয় ট্যাক্সিভাড়ার টাকা, তৃতীয় ওভার-অল এবং ড্রেস-এর অর্ডার। কাজ সেরে বেরুতে বেরুতেই দশটা। এরপর বেহালা। প্রায় ফাঁকা চলেছে ফিরতি ট্রামগুলো। বেহালার বন্দর থেকে যে মাল তুলেছিল, ঢেলে দিয়ে এসেছে তা এসপ্ল্যানেড আর ডালহৌসীর বন্দরে। ফিরতি পথে যা জুটেছে তাই তুলে নিয়েছে। লাভ না হ'ক, খরচাটা উঠে যাবে তাতে। আমিও হাত পায়ের ক্রেনের সাহায্যে এসে ঢুকে পড়ি তার খোলের ভেতরে।

চিনুদের বাড়ির দরজায় গিয়ে যখন ধাক্কা দিই তখনকার মনের অবস্থাটা ঠিক বোঝাতে পারব কিনা, বুঝতে পারছিনা আমি। উত্তেজনায় শুকিয়ে

গিয়েছে গলা, বুক। শরীরের ভেতরে প্রবল কাঁপুনী। মুখের ওপরে স্বেদ-কণার স্পর্শ। এত উত্তেজনা কিসের? জীবনের পথে সফল হ'তে চলেছি, তারই? না, অন্য কিছুর? আরও কতবার এসেছি এ বাড়িতে, কিন্তু এরকম কখনও হয়নিত'? কি যে হ'ল শরীরের ভেতরটায়! দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছি না আর। ওখানেই বসে পড়ব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে খুলে যায় দরজাটা। আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসায় চিনু। তারপরই ছুটে গিয়ে একগ্লাস জল এনে দেয় হাতে। জলটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করবার পর প্রথম শব্দ বের হয় আমার মুখ থেকে—আঃ। একটু সুস্থ হ'তেই আর এক কাণ্ড যা ক'রে বসল সে তাতে আমি একেবারে বাক্যহারা। তার সেই কাজটিই বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিল সেদিন, মন তার কতখানি তৈরী। ভালও লেগেছিল যেমন একটু লজ্জাও পেয়েছিলাম তেমনি। খালি গ্লাসটা আমার হাত থেকে নিয়ে নামিয়ে রেখেই পাশে এসে দাঁড়াল সে। আঁচল দিয়ে আমার মুখখানা ভাল ক'রে মুছিয়ে দিয়ে একটা হাতপাখ নিয়ে এসে বসল আমার পাশে। মন্দ লাগছিল না পরিস্থিতিটা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল একথা শুনলে হয়ত' ঈর্ষাও জাগতে পারে কারও কারও মনে। কিন্তু ঈর্ষা করবার কোনও কারণ নেই। কেননা আমার পরিস্থিতি ঐখানেই শেষ নয়, গড়িয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত।

কি হ'য়েছিল? এতক্ষণে কথা বের হয় তার মুখ থেকে।

কি জানি, রহস্য করি আমি, তোমাকে দেখবার চিন্তায়—

থাক্, বাধা দেয় সে, অত চিন্তা না করলেই আমি একটু নিশ্চিন্ত থাকব। বাব্বাঃ, মুখের দিকে তাকিয়ে যা ভয় হ'য়েছিল আমার।

কাজ পেয়েছি।

হুম্ ক'রে কথাটা জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই বোঁ ক'রে একপাক খেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় সে—সত্যি?

২২ তারিখের বিকেল বেলা জাহাজ ছাড়ছে।

২২ তারিখ? ওমা, আর চারদিন মাত্র হাতে আছে? কতদিন থাকতে হবে?

একমাস।

এক মা···স!

একটা মাস যেন তিরিশটি দিনের চাইতেও অনেক বেশি দীর্ঘ বলে মনে হয় চিনুর। কিন্তু তখনও ত' জানে না সে একটা মাস কত নগণ্য এক বৎসর দেড় বৎসরের পাল্লার কাছে।

কোথায় কোথায় যাবে?

তার জিজ্ঞাসু চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে শুধু নির্মুক্ত আকাশের নীলিমাই দেখতে পাই। অপরিচ্ছন্নতার লেশমাত্রও নেই তার কোথাও।

ঠিক জানিনা এখনও। তবে একমাস যখন তখন দূরে কোথাও নয় নিশ্চয়ই। বলতে বলতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াই—চলি এখন। ডিউটি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম খিদিরপুরে ন্যাকার-বোকারের অর্ডার দিতে।

কথাটা বলি বটে কিন্তু যাওয়া আর হয় না। কেমন ভুল হয়ে যায় সব। এমন দৃশ্য, তার ঠিক উপমা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। যদি বলি শিউলীর মুখের ওপরে টল্‌টল্‌ করছে একফোটা শিশির, তাও যেন ঠিক প্রকাশ করা হবে না। হাসি আর কান্নার এ এক অপূর্ব মিশ্রণ! বিষন্ন বিদায় মুহূর্ত্তটিকে তরল ক'রে দিয়েছে ন্যাকার-বোকার। বাষ্পে ভরা দুটি চোখের কোণে চিক্‌চিক্‌ ক'রছে একটুখানি হাসির রেখা। পা আটকে গিয়েছে আমার। মোহমুগ্ধ চোখে দেখেই চলেছি সেই মেঘ আর রোদের খেলা। হঠাৎ এক ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিয়ে 'যাও, তুমি ভারি ইয়ে' বলেই পাশের ঘরের দিকে যেতে থাকে সে। যেতে যেতেই হুকুম জানিয়ে যায়--পালাবে না কিন্তু; কিছু খেয়ে যাবে।

সেই কিছু খেয়ে ফিরে এসে যখন জাহাজে উঠি তখন 'লাঞ্চ' খাবার সময় হ'য়ে গিয়েছে।

আন্দামান চলেছি। মাষ্টারের বিশ্রাম। আমারও। তালিকাভুক্ত কাজ অবশ্য একটা আছে। সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত উইঞ্চ দেখা। অর্থাৎ ক্রেন ইত্যাদির তদারক করা। ঠিক থাকলেই ভাল।

নইলে যেমন ভাবে হ'ক ঠিক করে তুলতে হবে। তার জন্যে কারখানায় লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে শক্ত ক'রে দিয়েছে হাড়।

দাঁড়িয়ে রয়েছি। রেলিঙে ভর দিয়ে। ক্রমে দূরে সরে যাওয়া পরিচিত স্থানটির দিকে দৃষ্টি। ভাল লাগছে না মন। ইচ্ছে করছে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে উঠে পড়ি ঐ অতটে। কাজ নেই আমার দেশান্তরের হাওয়া খেয়ে। সকাল বেলা এসে যখন জাহাজে উঠি, বাড়ি থেকে সকলেই এসেছিল। শুধু আসেননি মা। বলেছিলেন—না বাপু, আমি যেতে পারব না। যদি কলকাতার কোন অফিসে চাকরী করতিস আর একদিন আমাকে তোদের অফিস দেখাতে নিয়ে যেতিস, তাহ'লে যেতাম। তারপরই প্রশ্ন করেছিলেন মা—হ্যাঁরে, আন্দামান কতদূর? উত্তর দিয়েছিলাম- প্রায় ৬৭০ মাইল। উত্তর শুনে গুম্ হ'য়ে গিয়াছিলেন মা। কি যেন হিসেব করেছিলেন মনে মনে, তারপর আবার প্রশ্ন করেছিলেন—এর মধ্যে কোন ইস্টিশান নেইরে? হেসে বলেছিলাম—আছে। একশো কুড়ি মাইল গিয়ে একবার থামবে স্যাণ্ড হেডএ। নেমে যাবে পাইলট। তারপর সাড়ে পাঁচশ' মাইলের ভেতরে আর থামাথামি নেই। এরপর যে কথাটি বলেছিলেন মা, বাংলা দেশের সেই সনাতন মায়ের মনের চিত্রখানিই ফুটে উঠেছিল তাতে। বলেছিলেন, এবার ফিরে এসে কলকাতার কোনও অফিসে চাকরীর দরখাস্ত করবি।

মা আসেননি। এসেছিলেন বাবা, ছোটবোন আর ভাই। আর যে আসবে বলে বিরাট আশা করেছিলাম—না এসে ভালই হয়েছে। বাবার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলে সে যে কতটা শোভন হ'ত এবং বাবাও যে কি ভাবতেন, সে কথা ভাবতেও ভয় করে।

জাহাজ তখনও ছিল নোঙরাবদ্ধ। তাই ফিফ্থেরও সারাদিন ডিউটি। ডায়নামো চলে দিনরাত। বাবা আর ভাইবোনদের বিদায় দিয়ে এসে জাহাজে উঠি। পোষাক বদলে গিয়ে ঢুকি ইঞ্জিন ঘরে। কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে সব। অভিমানের মেঘখানা এসে জমাট বাঁধছে মনের আকাশে। কেন সে এলনা? না হয় বাবার সঙ্গে পরিচিত হতই। আজ না হোক, কালত' তাকে সে পরিচয় দিতেই হবে। তবে? খেয়াল নেই

অন্যমনস্কভাবে কখন আবার উঠে এসেছি ওপরে। ডেকের ওপরে পা দিতেই সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ার বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক এদেশী না ওদেশী, বোঝা মুস্কিল। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ দুই-ই তাঁর সমানভাবে চলে। আমাকে উঠতে দেখেই দাঁড়িয়ে যান—উইঠা আইলা ক্যান্? মনডা বুজি ভাল্ লাগেনা?

ধরা পড়বার সলজ্জ হাসি আমার মুখে।

এখানেই ডাঁড়িয়ে যাও। বেশি এদিক ওদিক যেওনা। চীফের বুটের খটাখট্ শব্দ কানে গেলেই নেমে যাবে।

পিঠখানা আস্তে করে চাপড়ে দিয়ে চলে যান তিনি। আমিও তাঁর কথার একচুল নড়চড় না ক'রে সেইখানেই রেলিঙে ভর করি।

সামনের রাস্তাটি যেন একটি বিরাট অজগর। অলস আবেশে গা ঢেলে দিয়ে পড়ে রয়েছে। তার ওধারেই ফোর্ট। এতবড় দুর্গ ইংরাজ শক্তিকে আর কোথাও করতে হয়নি। দুর্গের পাশের মাঠটিতে চলেছে ঘুড়ি কাটাকাটির পাশাখেলা। শুধুই হারজিত নয়, লেনদেনের ব্যবস্থাও কিছু কিছু চলে। আবার মনটা ফিরে আসে বর্তমানে। এখনও যা সামনে রয়েছে আমার, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই তা সরে যাবে কত দূরে। ভাবতেও খারাপ হয়ে যায় মনটা। জাহাজের এধার থেকে ওধার একবার ঘুরে গেলেন মাস্টার। যাবার সময় একটু থেমে উপদেশ দিয়ে গেলেন—দেখ ফিফ্‌থ, যখনই কাজ থেকে ছুটি পাবে, একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। ইঞ্জিনীয়ারদের প্রয়োজন হলে ডিউটির হিসাবের গণ্ডি মুছে যায়। জাহাজের জীবন তোমাদের হাতে, মনে থাকে যেন।

চলে গেলেন তিনি। আবার সেই একাকীত্বের পালা। সামনে সরীসৃপ-দেহ রাস্তাটা। হুস্ ক'রে একটি বাস এগিয়ে গেল। তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। একটু এগিয়ে স্টপেজে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সেটা। নামল একটি মেয়ে। ধ্বক্ ক'রে ওঠে বুকের ভেতরে—চিনু না! পোর্ট কমিশনার্স-এর শেডের পাশ দিয়ে আসছে সে। কি যেন খুঁজছে গঙ্গার বুকে। হ্যাঁ, চিনুই ত'! স্থান কাল সব ভুল হয়ে যায় আমার। রেলিঙের ওপরে যতটা সম্ভব ঝুঁকে পড়ে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠি—চিনু! তারপরই

হুড়মুড় ক'রে নেমে যাই সিঁড়ি বেয়ে। আর হাঁক দিতে হয় না। সিঁড়ির গায়ে লাগানই ছিল বোট। লাফিয়ে নেমে পড়ি তার ওপরে।

বিরহে কি সুর বাজে? বেহাগ? জানিনা ঠিক। সঙ্গীত-মার্গে আমি আবার অন্ধপথিক। একবার চেষ্টা করেছিলাম। তার দু'তিন দিন পরেই পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক এসে বাবা'কে বলেছিলেন—বিনয়বাবু, অশোককে বলবেন মনে মনে গলা সাধতে। বাস্, বাবার হুকুম হ'য়ে গেল, গলা সাধতে হ'লে হারমনিয়াম নিয়ে খালধারে গিয়ে বসতে হবে।

বললাম ত' জানিনা কি সুর বাজে। কিন্তু বেজেছিল একটা ঠিকই। তার কম্পন দেখেছিলাম ওর সুন্দর বাঁকানো দুটি ঠোঁটের গায়ে। আর মীড় ছিল তার চোখে। বিষাদ, লজ্জা আর মিলনের আনন্দ। ভাবের খেলা। ঘুরে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিষাদ সোমের ওপরে। স্বর ফোটে না গলায়। যতবারই চেষ্টা করতে গিয়েছে, ফুঁপিয়ে উঠেছে। শেষে ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠেছে—যাও, পারব না কিছু বলতে। ঐ ছোট্ট কথাটুকু বলতেই তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল ক'ফোটা চোখের জল। সান্ত্বনা দিয়েছিলাম আমি—একটা মাসত', দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আরও কি কি বলেছিলাম। বলেছিলাম কেন, বলেই চলেছিলাম। প্রথম যৌবনের ভালবাসা। রূপ তার সবাক্। আমি তার ব্যতিক্রম নই। যতই বলি, মনে হয় বুঝি বলা সব হ'ল না, থেকে গেল কিছু। চলেছে কথার তুফান মেল। এমন সময় জাহাজের দোতলা থেকে রেড সিগন্যাল দেখিয়ে দিলেন চীফ।

ফিফ্‌থ্! তোমার ডিউটি জাহাজে, পাড়ে নয়।

কোন রকমে বিদায় নিয়ে ফিরে এসে উঠেছি নৌকোয়। যে রুমালখানি আমাকে দিয়েছিল সে, সেখানি নাড়িয়েই তাকে জানিয়েছি বিদায় সম্ভাষণ।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। বাঁকের পর বাঁক ঘুরে জাহাজ হ'য়েছে ডায়মণ্ড হারবারমুখো। ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে গঙ্গার দেহ। জলযানের ভিড়ও গিয়েছে কমে। ভাগীরথীর কূলে কূলে গড়ে-ওঠা কলকারখানার পরিচ্ছদের শেষ হয়েছে বজবজে। তারপর শুধু শ্যামলিমা।

পল্লী-প্রকৃতির এমন প্রাণস্পর্শী ছবি দেখবার কথা ভাবতেও পারিনি কোনদিন। মুগ্ধ আমার নয়ন, বিমুগ্ধ আমার আত্মা।

ভুলে গিয়েছিলাম আমাকে, আমার কাজকে। সত্তা-হারা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম রেলিঙের ওপরে ঝুঁকে পড়ে। পাছে হারিয়ে যায় কিছু, পাছে চোখ ফস্‌কে যায় প্রকৃতির বিশেষ কোন দৃশ্য।

কে একজন পাশে এসে দাঁড়াল। তাকাই না তার দিকে। কেমন যেন ইচ্ছা করে না। ঘুরে ফিরেই মনে পড়ছে আমার মামার একটি কথা। স্টেশন-মাস্টার তিনি। উত্তর বঙ্গের দিকেই তাঁর যত ঘোরাফেরা। হঠাৎ ঝড়ের মতো এক-একদিন এসে উপস্থিত হতেন। তাও ছ'মাস কি এক বছর পরে। দরজার কাছ থেকেই হাঁক ছাড়তেন—ওরে বুলি! মাকেও দেখেছি, ঐ ডাকটি শোনবার জন্যে যেন মুখিয়ে থাকতেন। ছুটে গিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতেন মামাকে। তারপর মামার হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে নিতেন নিজের হাতে। আর একহাতে মামার হাত ধরে নিয়ে এসে বসাতেন একটা মোড়ার ওপরে। বাস্, আরম্ভ হ'য়ে যেত দু'ভাই-বোনের ছোটবেলাকার গল্প। দাদামশাইও ছিলেন স্টেশন মাস্টার। তাঁর বিচরণ-ক্ষেত্র ছিল সমস্ত বিহার প্রদেশ। ডুমরাওন, বক্সার, নৌতনোয়া। স্মৃতির স্বল্প-গভীরা স্রোতস্বিনীর ওপর দিয়ে ছুটে বেড়াতেন দু'ভাই-বোন। কোথায় কবে কার তালাও থেকে সিঙ্গাড়াফল তুলতে গিয়ে প্রায় ডুবে গিয়েছিলেন মামা। মাতাঙ্গা কোদো খেয়ে কবে দু'জনে তাঁরা টানা ঘুম লাগিয়েছিলেন। আর সে ঘুম ভেঙেছিল দু'দিন পরে। এমনি আরও কত ঘটনা। তারই মাঝে হয়ত' একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে যেতেন মামা। দৃষ্টি চলে যেত অনেকদূরে—যেখানে স্টেশন কোয়ার্টারে রেখে এসেছেন মামীমা আর ছেলেমেয়েদের। সেই দূরের কথা ভাবতে ভাবতেই বলে উঠতেন—বুঝলি বুলি, মানুষই কাক। কাল বা ছিলাম কোথায়, আজ বা এলাম কোথায়?

মামার সেই কথাটিই আজ বারবার মনে পড়ছে। তাই, কাকই বটে। দু'চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাকে ফিরি করিয়ে নিয়ে বেড়ায় জীবনের ঘাটে ঘাটে। উপজীবিকার অন্বেষণে তার উড়ে বেড়াবার দিকদিশার ঠিক নেই কিছু।

এই বিরাট নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে কতই ক্ষুদ্র বলে মনে হয়, তাই নয় ?

প্রশ্নটি আমার চিন্তাধারার সমান্তরাল না হলেও, ভাববাদী। ফিরে তাকাই তার দিকে। অনন্ত রাও। জাহাজী জীবনে এই ধরনের ভাববাদ অচল। তখন নয়, এখন, জীবনের এতগুলি বছর ধরে সাতসমুদ্রের বুকে চষে বেড়িয়ে তবে বুঝতে শিখেছি। তখনও ত' আমি এ বিদ্যালয়ের শিশু পড়ুয়া। তাই বেশ মিলে যায় রাও-এর সঙ্গে। কথায় কথায় ওর বাড়ীর কথা এসে পড়ে। মহারাষ্ট্রের কোন এক গ্রামে ওদের বাড়ী। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে যেতে হ'ত পড়তে। পাহাড়িয়া জায়গা। জল-সরবরাহের পরিমাপ যন্ত্রটি প্রকৃতির হাতে। সমুদ্র দেখেছে বই-এর পাতায়। তাই ছোটকাল থেকেই স্বপ্ন পুষেছে মনে, বড় হয়ে জাহাজে কাজ নেবে। দেখে বেড়াবে দেশের পর দেশ। পরিচিত হবে কত মানুষের সঙ্গে।

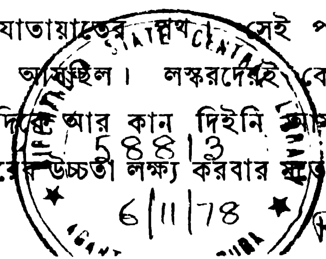
কিন্তু আমার এমন ভাগ্য, চাকরি নিলাম এই জাহাজে—সখেদে বলে ওঠে রাও—এইজন্যেই কি এত কষ্ট ক'রে কাজ শিখেছিলাম ?

কেন, কি হ'ল ?

এ হতভাগা জাহাজ কলম্বোর বেশী যায় না। কোথায় রেড সী আর কোথায় পার্সিয়ান গাল্‌ফ, সবই রয়ে গেল আমার অজানা।

দুঃখ হওয়াটাই স্বাভাবিক। ডানা ভেঙে গিয়েছে মন-পাখিটার। কাতরাতে হবে বৈকি। হয়ত' আমিও ভাগী হ'তাম ওর দুঃখের, কিন্তু এক মাসের মেয়াদের কথা মনে পড়তেই উপে যায় সে ভাব।

দাঁড়িয়ে আছি দু'জনে পাশাপাশি। ঢেউ কেটে নতুন ঢেউ সৃষ্টি ক'রে চলেছে প্রপেলার। আমার পাশেই ক্রেন। তারপরই একতলা সমান নীচুতে হ্যাচ্। মালে বোঝাই। তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা। লস্করদের কেবিন থেকে যাতায়াতের পথ। সেই পথের ওপর থেকে কাদের গলার স্বর ভেসে আসছিল। লস্করদেরই কেউ কেউ দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে ভেবে, ওদিকে আর কান দিইনি আমরা। কিন্তু কান দিতেই হয় একসময়। স্বরের উচ্চতা লক্ষ্য করবার মত। ক্রমেই চড়ছে



সেটা। চীনা, হিন্দী আর এ্যাংলো হিন্দীর কড়া উত্তর প্রত্যুত্তর। শুনে মনে হয়, বুঝি ঝগড়া বেধেছে দু'জনে। তাড়াতাড়ি নামতে যাই নীচে। বাধা দেয় রাও।

মারামারি বাধবে যে? একটু বিরক্তই হই আমি।

না, বাধবে না। ও রকম ঝগড়া—কথাটা সম্পূর্ণ শেষও করতে পারেনা রাও। ঘুষির শব্দ কানে আসে। তাড়াতাড়ি নেমে যাই দু'জনে। ততক্ষণে আরও কয়েক পশ্‌লা বর্ষণ হ'য়ে গিয়েছে। ছুটে গিয়ে দু'জনে দুই মোষকে আঁকড়ে ধরে টানতে থাকি। আমার কপালে আবার পড়েছে জ্যাকি খাঁ। তার এক একটা হ্যাঁচ্‌কা টানে মনে হয় এখুনি বুঝি রিং-আউট হয়ে রেলিঙ টপ্‌কে গিয়ে জলে পড়ব। শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও ঐ বুনো মোষকে বাগে আনা দায়। হঠাৎ কি মনে হয় আমার, জ্যাকিকে ছেড়ে দিয়ে ধীর শান্ত গলায় বলি—জ্যাকি, আমরা আশা করিনা যে তোমরা আমাদের সামনেও মারামারি করবে। আর আশ্চর্য হ'য়ে যাই দেখে যে এত টানাটানিতেও যে কাজ হয়নি, তাই হয় আমার ধীর শান্ত গলার স্বরে। থেমে যায় জ্যাকি।

ছিঃ, নিজেদের ভেতরে মারামারি করে? চল, ওল্ডম্যানের কাছে চল।

প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে জ্যাকি আমার কথায়।

নেহি যায়েগা।

ওধার থেকে সুচিংও বলে ওঠে—ক্যাপিতাকো পাশ নেহি যায়েগা।

এ এক সমস্যা। জাহাজে কিছু ঘটলে ক্যাপ্টেনই বিচারক। কিন্তু এরা মানবে না তা। এখন কি করা যায় এদের নিয়ে? ভয়ও হয় ছেড়ে দিতে। আবার হয়ত' ষাঁড়ের লড়াই আরম্ভ হ'য়ে যাবে। রাও তখনও হাত ছাড়েনি সুচিংএর। বরঞ্চ একটু বেকায়দাতেই পিছমোড়া ক'রে ধরে রেখেছে তাকে।

ছোল্ দিজিয়ে হাম্‌কো। বলে ওঠে সুচিং।

হ্যাঁ, ছেড়ে দিই আর দু'জনে মনের আনন্দে মাথা ফাটাফাটি করে মর। বলে রাও।

কিসিকা সাত্? উত্তর দেয় সুচিং—উস্‌কা সাত্? উ আদমী নেহি, জানোবাল্।

চোপ্ পিলা কুত্তা, খিঁচিয়ে ওঠে জ্যাকি, মু তোড় দেগা।

তাড়াতাড়ি তাকে আড়াল করে দাঁড়াই। বলি, চলো আমার সঙ্গে। আমার ঘরে গিয়ে বসে থাকবে।

একরকম টেনেই নিয়ে যেতে থাকি জ্যাকিকে। আমরা ওপরে উঠছি দেখে রাও বুঝি সুচিংকে ছেড়ে দিয়েছিল। ছুটে এসে সিঁড়িতে উঠে পড়ে সে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্যাকির এক বিরাট লাথি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে যায় নীচে। এক মুহূর্তে সকল সুষ্ঠ চিন্তাধারার ওলট পালট হ'য়ে যায় আমার। সাঁ ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়েই ঠাস্ ক'রে এক চড় বসিয়ে দিই জ্যাকির গালে। তারপরই তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে আমার ঘরের সামনে দাঁড় করাই। দরজা খুলে ওকে যখন ঠেলে ঢুকিয়ে দিই ঘরের ভেতরে তখনও থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে আমার সমস্ত দেহ।

ও গিয়ে বসে পড়ে মেজের ওপরে। উত্তেজনার ধাক্কাটি কাটাবার জন্যে দরজার কাঠামোটি ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমাকে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় মিনিট কয়েকের ভেতরেই আমি ধাতস্থ হয়ে উঠি। সে আবার আর এক জ্বালা। উত্তেজনা থামতেই অনুশোচনায় ভরে যায় মন। যা কোনদিন ভুলেও করেনি তাই করলাম আজ। ধিকৃত মনের কোণে কিছু ভয়ও এসে হাজির হয়। ঐ বিরাট বপু মানুষটিকে যে মারলাম, ও ত' এখন টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলতে পারে আমাকে! তখুনি আবার ঠিক করে নিই নিজেকে। ভয় থাক আমার মনের কোণে চাপা পড়ে, প্রকাশ করা চলবে না তা। বরঞ্চ—হ্যাঁ, তাই ঠিক। ঘরের ভেতরে ঢুকে ওর মাথার ওপরে হাতটা রেখে বলি—জ্যাকি, আমাকে ক্ষমা করো।

কথা বলেনা সে। দু' হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে বসে রয়েছে চুপটি ক'রে। আমি গিয়ে বসি আমার বিছানায়। পাশেই একটি 'সেটি'। বিছানায় বসেই হুকুম জাহির করি—সেটিতে উঠে বস।

মাথা ঝাঁকায় ও। লাফিয়ে নেমে পড়ে আর একটা ঝাঁকানি দিই ওর মাথায়।

জ্যাকি ! তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। আমাকে অপমান করোনা।

এতক্ষণে মুখ তুলে ওপর দিকে, আমার মুখের দিকে তাকায় ও। কি যেন খোঁজে আমার ভেতরে। পায় কিনা জানিনা। তবে পরমুহূর্তেই গুম্‌রে ওঠে—উ শালা হামারা দোস্ত্। তব্‌ভি উস্‌কো হাম ছোড়েঙ্গে নেহি। উ হামকো সাদী করনে বোলা।

সত্যিইত,' এমন জঘন্য অপরাধ মানুষে করে কখনও ! মনের ভেতরটা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। একটু আভাষ তার জেগে উঠেছিল আমার ঠোটের কোণেও। তড়াতাড়ি সেটাকে ভেতরে চালান ক'রে দিয়ে বলি—সত্যিইত', কি অন্যায় কথা ! তা কাকে সাদী করতে বলেছিল ?

উস্‌কো জরুকা একঠো বহিন্ হায়, উন্‌কী সাথ্।

যাক্, তবুও বিবাদের কারণের একটা হদিস্ পাওয়া গেল। সুচিং চীনা হ'য়ে তার শালীর বিয়ে দিতে চায় জ্যাকির সঙ্গে। সেইখানেই এর আপত্তি, কথা কাটাকাটি এবং পরে হাতাহাতি।

ও, তাহ'লে চীনা মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী নও তুমি ?

ফোঁস ক'রে ওঠে জ্যাকি—কেঁও, চীনা আদমী নেহি হায় ? উস্‌কা জান্ নেহি ?

এগুলেও ভেড়ের ভেড়ে, পেছুলেও ভেড়ের ভেড়ে। যাই কোথারে বাবা ! আবার এক ঝাঁকি দিই ওর মাথায়। বলি—ওঠত', উঠে বস ওখানে। সব খুলে বল। দেখি চেষ্টা ক'রে কোনও রাস্তা বের করা যায় কিনা।

সেটিতে উঠে বসে সে। বলে—সাবুদকা কোই জরুরৎ নেহি হায়। হাম্ সাদী নেহি করেঙ্গে।

আহা, তা না হয় না করলে। কিন্তু আর যাতে মারামারি না হয় তাত' করতে হবে।

একথা মানে সে। দোস্তের সঙ্গে মারামারি করতে কেইবা চায় ? কিন্তু সব সময় কানের কাছে প্যান্ প্যান্ করলে কার ভাল লাগে সেটা ? তাইত' হাত উঠে গেল তার। নইলে সুচিং, তার প্রাণের দোস্ত্ ছিল যে—

বলতে থাকে জ্যাকি—

হ্যাভারলি লেনের একটি বস্তীতে থাকে ওরা। পাঁচমিশোলী পল্লী। খোঁজ নিলে সব জাতেরই নমুনা কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে এই পল্লীতে। আর যে বস্তীতে থাকে ওরা, সেটা চীনা এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানে প্রায় বোঝাই। দু'চারটি ঘরে আছে মুসলমান বাসিন্দা। সেই বস্তীরই দুটো ঘরের ভাড়াটে সুচিং আর জ্যাকি। এখন নিজেরা ভাড়াটে। আগে ছিল ভাড়াটের ছেলে। একসঙ্গে মার্বেল, লাট্টু খেলেছে। সুচিং-এর বাবা কাগজের ফুল তৈরী করত। একটু বড় হ'লে দু' বন্ধুতে সেই ফুল নিয়ে গিয়ে বসত ক্যানিং ষ্ট্রীটে। খেলেছে, খেয়েছে, কতদিন ঘুমিয়েছে একসঙ্গে; আবার সামান্যতম কারণে করেছে মারামারি। কিন্তু বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি কখনও। এখন সে ছেদ টেনে আনছে সুচিং নিজে। লিফাং-এর সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ ছিল সুচিং-এর। প্রায় সম-অবস্থা উভয় পরিবারের। বরঞ্চ লিফাংদের অবস্থা এককাঠি বেশি খারাপ ছিল সুচিংদের চাইতে। তাতে ভালবাসা আটকায় না। এ এমনই এক মানসিক অবস্থা যেখানে পয়সার হিসাব কষতে বসলে এর গাঢ়ত্ব যায় হারিয়ে। তা হারাতে দেয়নি ওরা। এমনকি জ্যাকির নাক সিঁটকোনিতেও না। সুচিং-এর বাবার বিশেষ মত ছিল না এ ভালবাসায়। তার কারণ লিফাং-এর বাবার ছিল জুতো সেলাই-এর কাজ। এক চীনা জুতোর দোকানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেটে মাস গেলে যা পেত আর অর্ধেক যেত তরল গরলে আর বাকী অর্ধেকে চলত বাপ আর দুই মেয়ে লিফাং এবং ওয়াংলির দিন।

বহুৎ দফে উস্‌কো কহা, জেনানা আদমীকো গরমে মৎ ঘুষাও। তো উ শুনাই নেহি। মহব্বৎমে একদম বেঁহোস হোগিয়া।

সত্যিই তো, মহব্বৎএ বেঁহুস হ'লে কখনও চলে? সর্ব রকম হুঁস্ রেখে মহব্বৎ করতে হবে। লড়াইএর সৈনিকদের মত। ট্রেঞ্চ, কাঁটাতারের বেড়া, রসদ, হাসপাতাল, অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। সমস্ত ব্যবস্থা করবার পর দেখা গেল একটিমাত্র জিনিসেরই অভাব সেখানে। সেটি হচ্ছে প্রাণ। যা আছে তা হচ্ছে হুকুমের যন্ত্র। মহব্বৎ-এর ক্ষেত্রেও তাই। সতের রকম হিসাবের পলি জমে জমে প্রাণের গভীরতা যায় কমে। মনের

ড্রেজারে সেই পলি কেটে গভীরতা বাড়াতে গেলেই লোকে বলবে, বেহোঁস হো গিয়া।

'বলে চলে জ্যাকি আমার চিন্তায় ছেদ টেনে দিয়ে—

বছর বাইশ তেইশ বয়স যখন সুচিং-এর, বাপকে বলল, বিয়ে করব। বাপও নজর রেখেছিল ছেলের ওপরে। একটু অসন্তুষ্টও ছিল। সোজা উত্তর দিল ছেলেকে—রোজগার কর, বিয়ে কর। ব্যস্, ছেলে এসে উঠল এই জাহাজে। বিয়ে হল তার এক বছর পরে। বিয়ে করেই আলাদা বাসা করল সুচিং। সেই বস্তীতেই। জ্যাকি তখন কাজ করে একটা কারখানায়।

সেই কারখানা থেকেও একদিন বিদায় নিতে হ'ল জ্যাকিকে। কি নিয়ে কথান্তর হ'য়েছিল, মেরে বসেছিল মালিককে। তারপর আর কাজ নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে ফ্যা ফ্যা করে। ঘরভাড়া দিতে পারে না। কথা শুনতে হয় মালিকের। সেও শুনেছে, কাজ নেই জ্যাকির। সেই সময়েই একদিন সুচিং ধরে নিয়ে এল তাকে এই জাহাজে।

উ হামকো বাঁচায়া, ফির মারনেকোভি ফিকির কিয়া। বলে জ্যাকি।

বাঁচ বার খবর না হয় পেয়েছি, কিন্তু মারবার আবার কি কল করল সে? জিজ্ঞাসা করি জ্যাকিকে। উত্তর দেয় সে—

এখানে কাজ নিয়ে একবার মাত্র কলম্বো ঘুরে এসেছে। একক জীবন। নেই কোন পিছটান। খাচ্ছে জাহাজী খানা, ঘুমুচ্ছে জলের বুকে। পয়সা লাগে না। উপরন্তু মাসে মাসে অগ্রিম পায়। কিনেছে ঘড়ি, ভাল জুতো, করিয়েছে ভাল প্যাণ্ট, সার্ট। রাস্তায় বেরুলে কে বলবে যে ওর লস্করী জীবন। ভালই কাটছিল দিন। হঠাৎ হোঁচট খেল এই বস্তীতে। ঘর খুলে পা ছড়িয়ে শুয়ে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, এমন সময় একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। হাতে এক কাপ চা। লাফিয়ে উঠে বসে জ্যাকি— ই গর নেহি, ই গর নেহি—কে কার কথা শোনে? মেয়েটা ততক্ষণে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখেই ছুটে পালিয়েছে।

ওয়াংলিকে সেই প্রথম দেখল জ্যাকি। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে বুঝতে পারেনি কিছুই। পরে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হ'তেই ব্যাপারটা সরল

হ'য়ে গেল তার কাছে। বন্ধুর কীর্তি! যেমন বোঝা তেমনি আবার মাথায় খুন চাপা। কাপটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েই একলাফে উঠোনের ওপরে এসে পড়ল। চীৎকার ক'রে উঠল সুচিং-এর ঘরের দিকে তাকিয়ে—ফিন্ কোই লেড়কী ই গরমে আয়েগাতো—আট্‌কে গেল কথাটা। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে সুচিং। বিষণ্ণ মুখ। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় কিছু একটা যেন তার হয়েছে। ধীরে ধীরে জ্যাকির পাশে এসে দাঁড়ায়। বন্ধুর হাত দু'খানি ধরে বলে—উস্‌কি কুছ্ নাৎবোলা। উস্‌কি বাপ মাল্ গিয়া।

বলা বন্ধ করে জ্যাকি। কিন্তু স্পষ্ট হুকুম জারি ক'রে দেয়, তার ঘরে যেন কোন জেনানা আদমী না ঢোকে। বলেই নিশ্চিন্ত সে। জানে, তার হুকুমের নড়চড় করবে এমন মরদ কেউ নেই এ বস্তীতে। জানত না তখনও যে হুকুম জারি করবার লোক যেমন আছে, হুকুম না মানার মানুষেরও তেমনই অভাব নেই। জানতে পারল সে কথাটা জাহাজী জীবনের দ্বিতীয় পাক ঘুরে এসে। কি সব ছুট্‌কো ছাট্‌কা মেরামতির কাজে আটকে থাকল জাহাজ। নামমাত্র ডিউটি দিয়েই নেমে পড়ে জাহাজ থেকে। ঘোরে রাস্তায় রাস্তায়। হয় সিনেমা দেখে, নয়ত' জমে যায় বন্ধুদের সঙ্গে তাসের আড্ডায়। খেলা ভাঙে যখন, তাসের আসরের অনুপানের নেশায় তখন পথ চলাও কষ্টকর তার পক্ষে। কোনরকমে ঘরে ঢুকে গড়িয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে। আঁকাবাঁকা পাগুলো ঘন ঘন পড়তে থাকে তার।

ঘরে ঢুকেই ধপাস্ করে বসে পড়ে বিছানার ওপরে। জুতোজোড়া খোলবার জন্যে টুলটা টান দিয়ে নেয় পা রাখবে বলে। কিন্তু পা তোলা আর হয় না। চোখ আটকে গিয়েছে টুলের ওপরে ঢাকা দেওয়া খাবারের দিকে। ভুলে যায় গড়িয়ে পড়বার কথা। মনের ভেতরে আগুনের আক্রোশ। ইচ্ছা করছে ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে মেয়েটার। শুধু বন্ধুর সেই কাতর অনুরোধটাই তার রাশ ধরে টেনে রেখেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রাগেরও মোড় ঘোরে। সে নেই, এটাতো আছে। এক লাথি মেরে ছিট্‌কে ফেলে দেয় টুলটা। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে ঝন্‌ঝনিয়ে

শব্দ ওঠে। ওধারের ঘর থেকে কে যেন বেড়ালের উৎপাত মনে করে ঘুম-চোখেই তাড়া দিতে থাকে। সেদিকে আর কান দেয় না জ্যাকি। জুতো পায়েই গড়িয়ে পড়ে বিছানায়।

একদিনেই শেষ হয় না অত্যাচারের পালা। বেড়েই চলে ক্রমে। বিছানাপত্তর ভদ্রলোকের আকার ধারণ করে। ঘরে বিশেষ কিছু নেই বলে আগে তালা দিত না দরজায়। আজকাল তালা দেয়। তাতেও মুক্তি নেই। নকল চাবি আটকায় কে? তার ওপরে ভোর হ'তে না হ'তেই সুচিং চা নিয়ে আসে। আসে বটে সুচিং, কিন্তু তার কাজের পিছনে যে মানুষটি আছে তাকেও স্পষ্ট দেখতে পায় জ্যাকি। এক একবার ভাবে সে, চীৎকার ক'রে প্রতিবাদ করবে এর। আবার তখুনি মত বদলায়—নাঃ, তার চাইতে এ বস্তী ছেড়ে দেওয়াই ভাল। ঠিক, চলেই যাবে সে এখান থেকে।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। ঘর ছেড়ে দেয় সে। মেয়াদ শুধু ভাঙা মাসের কয়টি দিনের। অন্য কোথাও ঘরের খোঁজ ক'রে চলেছে। হয়ত' পেয়েও যাবে। তবুও শান্তি নেই মনে। এই বস্তীটার ওপরে তার অসীম মায়া। বাল্যের স্মৃতি বিজড়িত। প্রকাশ ক'রে বলা যায় না ঠিক। এক অশরীরির শক্তি নিয়ে তারা যেন পিছন দিকে টানে। শুয়ে শুয়ে সেই কথাই ভাবছিল জ্যাকি। যাবে ঠিক করেছে অথচ ভেবে পাচ্ছে না যাবে কি না। সুচিং-এর বাবাটা চেঁচিয়ে চলেছে। শুনতে পাচ্ছে সে। ছেলে পৃথক হওয়ার পর থেকেই এই রোগে ধরেছে তাকে। কথায় কথায় চীৎকার ক'রে ওঠে। লিফাং গিয়ে সামনে না দাঁড়ানো পর্যন্ত চেঁচিয়েই চলবে। বেটায়-বৌ গিয়ে পাশে বসে, গল্প করে আর কাগজের ফুল বানাতে সাহায্য করে শ্বশুরকে—জল হ'য়ে যায় সুচিং-এর বাপ। বুঝে পায়না জ্যাকি, যাকে ঘরে আনতে এত নারাজ ছিল মানুষটা, তাকে কাছে পেলেই অমন শান্ত হ'য়ে যায় কি ক'রে সে। হাতখানা আড় ক'রে ফেলা ছিল চোখের ওপরে। দেখতে পায়নি কে ঘরে এসে ঢুকেছে তার। আপন খেয়ালে হাতখানা সরাতেই যে মুর্তিখানি চোখে পড়ে তার, তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে বসে জ্যাকি। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাপটি এগিয়ে

ধরে বলে ওয়াংলি—আপ মাৎ যাইয়ে। এমনিতেই মেজাজ হ'য়ে গিয়েছে খারাপ, তার ওপরে আবার আব্দার! খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে ওঠে জ্যাকি—যায়েগা, জরুর্ যায়েগা। তুম্হারা কেয়া? যাও, চলা যাও হিঁয়াসে। তবুও নড়েনা মেয়েটা। ঘুরে ফিরেই বলতে থাকে—আপ্ মৎ যাইয়ে। শুনতে শুনতে শেষে ক্ষেপে গিয়ে চীৎকার করে ওঠে জ্যাকি—তুম্ জাহান্নাম্মে যাও। বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সে।

তারপর থেকে জাহাজই ঘরবাড়ি হয় জ্যাকির। কিন্তু এখানেও সেই একই বিপদ। সুচিং এড়োহাতে তার পিছনে লেগেছে। আবার মুস্কিল এমন যে দু'জনে একই সঙ্গে কাজ করে বয়লারে। কাজ একসঙ্গে, ছুটিও তাই। আর কানের কাছে দিনরাত মন্ত্রজপ—ওয়াংলি তুম্কো মহব্বৎ কর্তি হায়।

হাম্ এত্না দফে কহা, সাদী নেহি করেগা, জেনানা আদমী হাম্কো পসন্দ্ নেহি আতা, তবভি শালালোগ—

উঠে দাঁড়ায় জ্যাকি। আবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে।

বস, বস, বলে তাকে বসিয়ে বুঝিয়ে বলি, মারামারি করলে চাকরী যাবে। তার চাইতে আমি বলব সুচিংকে ওয়াংলির বিয়ে আর কারও সঙ্গে দিতে। আমরা না হয় চাঁদা তুলে কিছু টাকা সাহায্য করব ওকে।

খুশি জ্যাকি। বলে ওঠে—উও ঠিক বাত। কিন্তু সংশয় যায় না কিছুতেই। প্রশ্ন করে—মানেগা?

নিশ্চয়। কেন মানবে না? তুমি যাও। আমি সুচিংকে ডেকে এনে এখুনি বলছি ওকে।

ঘটনা শোনা গেল। শুধু বোঝা গেল না একটি কথা। স্ত্রীলোকের ওপরে এত ঘৃণা কেন জ্যাকির। ওরা চীনা বলে এ ঘৃণা নয়। তবে? আবার বলে, ওর দোস্ত্ ওকে বাঁচিয়ে তুলে ফের মারবার চেষ্টা করছে। তাহ'লে শুধু ঘৃণাই নয়, কিছুটা ভয়ও আছে তার সঙ্গে। কেন সে ভয়?

উত্তর পাওয়া যায় সুচিংএর কাছ থেকে।

জ্যাকি খাঁর আসল নাম জ্যাক খাঁ। বাপ দাওদার খাঁ ভালবেসে

বিয়ে করেছিল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের মেয়ে মিস্ প্রেটিকে। উভয়েই ঐ হ্যাভারলি লেনের বাসীন্দা ছিল। দাওদার কাজ করত একটি জাহাজে। পূর্বরাগ যখন চলেছে তখনই প্রেটির দেহে দেখা দিল মাতৃত্বের লক্ষণ। দাওদারকে জানাল সে। বলল তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলতে। ইচ্ছা থাকলেও দাওদারের উপায় ছিল না। জাহাজ ছাড়বে ছু'একদিনের ভেতরেই। শুধু আশ্বাস দিল প্রেটিকে—হ'তে দাও। আমি ঘুরে এসেই বিয়ে করব। কথা রেখেছিল সে। প্রায় এক বৎসর পরে ঘুরে এসে যখন বিয়ে করল প্রেটিকে তখন তার কোলে শিশু জ্যাক। দাওদার ছিল বিদেশে, তাই প্রেটি আপন পছন্দ মতই পুত্রের নাম রেখেছিল জ্যাক। দাওদারও এ নিয়ে কোন কথা বলেনি।

জ্যাকির বয়স যখন ছয় কি সাত সেই সময়ে এক জাহাজডুবি হ'য়ে মারা যায় দাওদার। খবর পেয়ে প্রেটির সে কি কান্না! উস্কো খুস্কো চুল। একটা মোড়া পেতে বারান্দার ওপরে বসে থাকে। আর ছু'চোখের কোল বেয়ে ঝরঝরিয়ে পড়তে থাকে গলিত ব্যথার ধারা।

কিন্তু ব্যথা যেমন আছে তেমনি আছে সংসার। আর আছে জ্যাকির খিদের বায়না। বাধ্য হ'য়েই উঠতে হয় প্রেটিকে। জমান পুঁজিতে চলে কয়েকটা মাস। তারপরই আরম্ভ হয় অভাব। কোনরকমে সংসারের কাজ সেরেই ধান্ধায় বেরিয়ে পড়তে হয়। একটা কিছু. করতেই হবে। কিন্তু অসময় যখন আসে তখন পাকা ধানের ওপরেও শিলা বৃষ্টি হয়। সারাটা দিন ধরে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে যায় প্রেটি। কোন রকমে দেহটিকে টেনে নিয়ে এসে ফেলে বস্তীর ঘরটিতে। ঠিক এমনি সময়ে স্বয়ং মুস্কিল আসানের মতই তার সামনে এসে দাঁড়াল স্টিফেন ডি'কস্টা। একহারা চেহারার মানুষটার সর্বাঙ্গে পয়সা দিয়ে মেজে তোলা চাকচিক্য। প্রেটির চোখে লোলুপ দৃষ্টি। পয়সাটাকে এখন যেমন চিনেছে তেমনভাবে আর চেনেনি সে কোনও দিন। তবে লোভ তার ছিল, আর তেমনি ছিল তার প্রতিবন্ধক। সংসারে টান না ধরে সেদিকে দাওদারের প্রখর দৃষ্টি ছিল। গোণা কড়িতে মেপে চলত সে। ডি'কস্টা তা নয়। বেহিসাবী পয়সা ছড়ায় সে। রূপিয়ার রূপোলি আলোর ঝল্‌কানি লেগে চিক্ চিক্ ক'রে

ওঠে প্রেটির লুব্ধ চোখের তারা। প্রলুব্ধ সে হারিয়ে ফেলে সোজা রাস্তার নিশানা। নতুন পাওয়া আদর্শ ডি'কস্‌টার সঙ্গে গিয়ে ঢোকে জীবনের চোরাগলির ভেতরে। তারপর আর তাকে হ্যাভারলি লেন কি তার আশে পাশে কোথাও দেখা যায়নি। জ্যাকির বয়স তখন বছর আট নয়। বাপ হারাবার পর দু'তিনটি বৎসর তার জীবনে নিয়ে এসেছিল সোনার দিন। যা চাইত তাই পেত' ডি'কস্‌টার পয়সায়, মায়ের হাত দিয়ে। তারপরই সে সোনায় লাগল পারার পরশ। প্রথম কয়েকটা দিন কাটল তার মন-মরা হ'য়ে। তারপর এল আত্মচিন্তা। বাঁচতে হ'লে খাদ্য চাই। তার জন্যে চাই কাজ। হ্যাভারলি লেন ছেড়ে সে ফিয়ার্স লেনের এক চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকল। তবুও কাঁদেনি সে একটি দিনও।

সেই থেকেই মেয়েদের ওপরে এক বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ ক'রে এসেছে জ্যাকি। ভালবাসা দূরের কথা, তাদের নামও সহ্য ক'রতে পারে না। যে জ্বালায় জ্বলছে সে জীবনের এতগুলি বৎসর ধরে, ওয়াংলির প্রতি উপেক্ষা তারই অভিব্যক্তি। দোষ দেয়না তাকে সুচিং, কিন্তু মেয়েটার কথাটাও ত' একবার ভাবতে হবে। মাঝে মাঝে থাকতে না পেরে জাহাজ-'ঘাটায় ছুটে আসে ওয়াংলি। দাঁড়িয়ে থাকে প্রাণভরা আশা নিয়ে। ·যদি একটিবারও অন্ততঃ দেখা যায় জ্যাকিকে। কিন্তু মানুষটা এমনই পাষণ্ড যে মেয়েটাকে দেখলেই সেই যে জাহাজের খোলের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, বেরিয়ে আসে ওয়াংলি ফিরে যাওয়ার অনেক পরে।

ও, সেইজন্যেই বুঝি তুমি ওকে বলছ বিয়ে ক'রতে? জিজ্ঞাসা করি আমি।

জী, কেঁউ সাদী কলেগা নেহি? একটু চড়া গলাতেই বলে সুচিং, তুম্‌ আদমী হায়, উ আদমী নেহি? উস্‌কি মহব্বৎকী দাম নেহি হায়? বলেই দৃঢ় মন্তব্য করে সে—হাম্‌ বোলতা ছার, সাদী জ্যাকিকো কল্‌নেই হোগা। হাম্‌ কলায়েগা।

উঠে চলে যায় সুচিং। আমার মনে শুধু একই প্রশ্ন—পারবে কি

ওয়াংলি তার মহব্বতের দড়ি দিয়ে জ্যাকিকে বাঁধতে ? ওদের সার্থকতার উদাহরণ দিয়ে নিজের মনকে ক'রে তুলতে চাই আরও সবল। জাত বা ধর্মের গণ্ডীতে ওরা আবদ্ধ নয়। সেদিক দিয়ে আমার হাত পা বাঁধা। এ বাড়ি, ও বাড়ি, মত হবে না কোন পক্ষ থেকেই। আমরা কায়স্থ, চিনুরা ব্রাহ্মণ।

জাহাজ এগুচ্ছে অতি সাবধানে। তার গতিপথ ধরে। দূরে দেখা দিয়েছে টেবল্ আইল্যাণ্ড। প্রথম লাইট-হাউস। স্থানটি আন্দামানের কাছাকাছি হ'লেও ব্রহ্ম-সরকারের অধীন। জলের নীচে মৃত্যু প্রহরীরা সঙ্গীন নিয়ে দাঁড়িয়ে। সামান্য অসাবধানতায় ফেঁসে যেতে পারে জাহাজের তলা। তাই নাবিক এখানে একচুলও স্থানভ্রষ্ট হ'তে চায় না তার নিৰ্দিষ্ট পথ থেকে।

এ তিনদিন ধরে একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করেছি আমি। জ্যাকি সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ারের হাতে পায়ে ধরে তার ডিউটির সময় পরিবর্তন ক'রে নিয়েছে। অর্থাৎ সুচিং যখন বয়লারের মুখে খাদ্য ঠেলতে ব্যস্ত, জ্যাকি তখন রেলিঙে ভর দিয়ে প্রাণের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গাইছে। আবার জ্যাকির মুখ যখন বয়লারের আগুনের আঁচে হ'য়ে উঠেছে রক্তাভ, সুচিং তখন খালাসীদের খোপের ভেতরে শুয়ে লিফাং-এর মুখখানি মনে করবার চেষ্টা করছে। আর যেটুকু সময় দু'জনেই একসঙ্গে ওপরে থাকবার জন্যে পায় তার মূল্য এত বেশি যে কথা বলে নষ্ট করা যায় না তা, ঘুমিয়েই কাটাতে হয়। এতবিছুর ভেতরেও ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল সুচিং। দাবড়ে দিয়েছে জ্যাকি। যে ওকে মেরে ফেলতে চায় তার সঙ্গে আবার ভাব কিসের ?

যেটা ছিল দিগ্বলয়ে মেঘের আকার ধারণ করে, এতক্ষণে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তা। আন্দামানে দ্বীপের সংখ্যার মত পাহাড়ের সংখ্যাও অল্প নয়। যদিও উচ্চতায় কোন মর্যাদাই দাবী করতে পারে না তারা। আর আছে বন এবং বন্য-জাতি। ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে দ্বীপ। আমার চোখে সবই নতুন। ভাবতেও ভাল লাগে, আবার মানুষের মধ্যে এসে

পড়েছি। ক'লকাতার জন-কোলাহল অনেক সময় বিরক্তি ধরিয়ে দিত মনে। খুঁজে বেড়াতাম একটু ফাঁকা জায়গা। মানুষের গলার শব্দের যেখানে অভাব। এখন মনে হয় তাই-ই কত মিষ্টি ছিল। তবুওত' ছিলাম মানুষের ভেতরে, শক্ত মাটির ওপরে। সমুদ্রের বিরাটত্ব অনস্বীকার্য কিন্তু তার একাকীত্ব বড় বেদনাদায়ক।

হারবার নেই, জেটি আছে। দূরে নোঙঃ ফেলে দাঁড়াতে হয় না। সুখানী স্টিয়ারীং ছেড়ে নেমে এসেছে গ্যাং-ওয়ে চার্জে। অর্থাৎ জাহাজ থেকে নামা ওঠার রাস্তায় সে হয়েছে প্রহরী। প্রতিটি কেবিনের চাবির দায়িত্ব তার ওপরে। রেলিঙে ভর দিয়ে দু'চোখ ভরে দেখে নিচ্ছি এদেশের যতখানি দেখা যায়। বিশ্বাস এসে দাঁড়ালেন পাশে। ভদ্রলোকের ভালবাসা আদায় ক'রতে পেরেছি। সেটা আমার ক্ষমতায়, না তাঁর ছোট ভাইএর মত বলে, জানি না। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, ইঞ্জিন-ঘরে গিয়ে তিনি সব কিছু ছেড়ে দিতেন আমার হাতে আর নিজে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতেন আমার প্রতিটি কাজ। এর দাম চাট্টিখানি নয়।

কি দেখছ? জিজ্ঞাসা করেন বিশ্বাস।

ঐ কুলিদের কাজ। আচ্ছা, ওরাই কি এখানকার আদিম জাতি? —জিজ্ঞাসা করি।

না না, তা কেন হবে? হেসে উত্তর দেন তিনি, এরা হচ্ছে এক জগাখিচুড়ি জাত। একদা শাস্তি নিয়ে এসে যারা সংসার পেতেছিল এখানে, তাদেরই বংশধর। সব জাত মিলেমিশে গিয়েছে ওদের মাঝে। ভাষাও ওদের অতি নিকৃষ্ট জাতের হিন্দী।

হাঁ করে শুনছি তাঁর কথা, এমন সময় খালাশী কেবিনের ওধার থেকে গোলমাল শোনা যায়। উত্তেজনা যেন ক্রমে বেড়ে চলেছে।

কি নিয়ে গোলমাল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। শুধু ক্যাপ্টেনের নাম ধরে মাঝে মাঝে যে খিস্তিগুলি ছুঁড়ে মারছে, কানে এসে আঘাত করছে তা। বিশ্রী অভদ্র এক ভাষা। আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ওধারে যাব কিনা ভাবছি। একখানা হাত এসে পড়ে আমার কাঁধের ওপরে।

চম্‌কে ফিরে তাকাই, বিশ্বাস। হেসে বলেন—গিয়ে কোন লাভ হবেনা। অনর্থক কতকগুলি গালাগাল শুনতে হবে।

কেন ?

আন্দামানে খাবার জলের খুব অভাব। সেইজন্যে কোন জাহাজ এখানে এলেই আগে খোঁজ নেওয়া হয় পানীয় জল যথেষ্ট পাওয়া যাবে কিনা। যদি তা না যায় তাহ'লেই ট্যাঙ্কে তালা পড়ে। অর্থাৎ জল সরবরাহ হয় পরিমিত মাপে। বোধহয় তালা পড়েছে ট্যাঙ্কে আর খালাসীর দল উঠেছে ক্ষেপে।

কথাটা শেষ করেই ছুটে যান তিনি হ্যাচে নামবার সিঁড়ির দিকে। তর্ তর্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে যান। ক্রেনের গায়ে লট্‌কে তুলতে তুলতে চলেছে ঢেউ-টিনের বাঁধ। সেটি পার হ'য়ে যেতেই আবার ছোটা আরম্ভ হয়। গিয়ে থামেন খালাসীদের সামনে।

এই, আমি কোর‍্যাল ফ্লাওয়ার তুলতে যাব। কে কে যাবে বল ?

এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাই আমি বিশ্বাসের দরাজ গলার কথাগুলি। খালাসীদের কেবিনে ওঠবার সিঁড়ির মাথা থেকে লাফিয়ে পড়ে জ্যাকি। পড়েই তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে চিংড়িমাছের মত—হাম্।

লাফায় না আর কেউ। ওপর থেকেই বলে—আমি যাব, আমি যাব। তাদের ভেতরে সুচিংএর মুখও দেখা যায়—হাম ভি যায়েগা। ওর দিকে নজর পড়তেই 'হাম নেহি যায়েগা' বলে ঘুরে হাঁটতে থাকে জ্যাকি। এমন সময় চোখে পড়ে তার একটি ক্রেন হ্যাচের ভেতরে নামছে। ছুটে এসে তাই ধরে ঝুলে পড়ে। ধীরে ধীরে তলিয়ে যায় জাহাজের খোলের ভেতরে। আমার মত বিশ্বাসও দেখছিলেন তাকে। দেহটি অদৃশ্য হ'য়ে যেতেই আমার মনের কথাটি বেরিয়ে আসে তাঁর মুখ দিয়ে—দৈত্য একটা।

অপূর্ব ব্যক্তিত্ব মানুষটার। কাজ করা মানেই যে যন্ত্র হ'য়ে যাওয়া নয়, এই মানুষটাকে না দেখলে এমনভাবে বুঝতে পারতাম না তা। বড় কড়া যন্ত্রী। কিন্তু সে যন্ত্রের কাছে, মানুষের কাছে নয়। শেখান ভাই-এর মত ভালবেসে। দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে দায়িত্ব-জ্ঞান তোলেন বাড়িয়ে। আবার প্রয়োজন বোধ করলে লাগাম ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান মারতে দ্বিধা করেন

না। জ্যাকির বেলাতেও তাই করলেন দেখলাম। কিছুতেই যেতে রাজী নয় জ্যাকি। বিশ্বাস বললেন—বেশ, যেও না। আমাকে বললেন—নিচে নেমে গিয়ে দুটো নৌকো ঠিক কর। ওদের পরিচালনা করবে তুমি। ঐ ওখানে—বলে দূরের একটি জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐখানে জলের নিচে পাহাড়ের গায়ে পাওয়া যাবে কোর‍্যাল ফ্লাওয়ার।

আর আপনি? তাঁর এই মত পরিবর্তনের কারণটা ঠিক খুঁজে পাইনা আমি।

ইঞ্জিনঘরে ঢুকতে হবে। যাও, আর দেরি করো না। তারপরই হাঁক দিয়ে ওঠেন—জ্যাকি!

হাঁক শুনে কাছে এসে দাঁড়ায় জ্যাকি। মুখে সেই বিদ্রোহ-ভাব।

যাও, পোষাক বদলে এস। ইঞ্জিন সারাই করতে হবে।

মনটাকে এক আদেশ অমান্যের জন্যে তৈরী ক'রে নিয়ে এসেছিল জ্যাকি। এখন অন্য এক উদ্ভট হুকুম শুনে হকচকিয়ে যায় সে। ককিয়ে ওঠে—হামারা ছুট্টি হায়।

কিসের ছুটি? ধমকে ওঠেন বিশ্বাস, ইঞ্জিনঘরের সকলেই যাচ্ছে নৌকোয়। তাহ'লে ইঞ্জিন সারাই করব কি আমি একা? ধমকানি শুধু গলার স্বরে নয়, চোখের দৃষ্টিতেও।

কিন্তু কিছুতেই যেতে চায়না জ্যাকি। দু'দিনের জন্যে ডিউটির চাপ লঘু হ'য়েছে। এ সময়টা সে ঘুরে বেড়াতে চায় ঐ পাহাড়ের মাথায় মাথায়। প্রাণ ভরে আস্বাদ নিতে চায় এক নতুন জীবনের। স্বাধীন, বেপরোয়া।

এতক্ষণ ধরে বিশ্বাসের মনের চেহারাখানি নাগালের ভেতরে পাওয়ার চেষ্টা করছিল জ্যাকি। তারই বুদ্ধি দেখা পেয়ে যায় সে। বলে ওঠে—হাম্ যায়েগা।

থাক্, নাই বা গেলে—নির্লিপ্ত স্বর বিশ্বাসের।

নেহি নেহি সাব, হাম জরুর যায়েঙ্গে। বলতে বলতেই ছুটে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে সে।

স্থির শান্ত উদকরাশি। কাঁচ-স্বচ্ছ। দশ পনের ফুট নিচে পাহাড়ের

অংশটিকেও স্পষ্ট দেখা যায়। এগিয়ে চলেছে নৌকো দুটি। দুপুরের খাওয়া সেরেই এসেছি আমরা। তাহ'লেও প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি আর একবেলার জন্যে। এসব কাজে সময়ের হিসাব থাকে না। ক্রমেই আমাদের জাহাজ সরে যাচ্ছে দূরে। কিম্বা আমরাই চলেছি এগিয়ে ঐ যেখানে সমুদ্রের বুক চিরে মাথা জাগিয়েছে পাহাড়। ওরই পাশে নাকি থামব আমরা। তারপর জলের নীচে পাহাড়ের গায়ে কোথায় আছে বিভিন্ন রংএর পাথরের ফুল তাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

নির্দিষ্ট স্থানে পেঁীছুতে আধঘণ্টার কিছু বেশিই সময় লাগে। তারপরই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখি নৌকোদুটির ওপরে। উপুড় হ'য়ে ঝুঁকে পড়েছে সকলে। জলের দিকে মুখ বাড়িয়ে। দু'হাতে চোখের দু'পাশ ঢেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জলের তলায় তাকিয়ে আছে। ওদের দেখাদেখি আমিও চেষ্টা করি দেখতে। কিন্তু অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতে কিছুই ধরা পড়ে না। কিছুক্ষণ সেই একইভাবে পড়ে থাকে সকলে। আপন খেয়ালে নড়ে বেড়াচ্ছে নৌকো। দাঁড়গুলি উঠে এসেছে জল থেকে। ধৈর্য হারিয়ে উঠে বসি। পোর্ট-ব্লেয়ার নয়, বড় আন্দামান এটা। পোর্ট-ব্লেয়ার এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। মনে হয় ঐ ত' ওখানে। পাড়ি দিতে গেলে ধরা পড়ে জলের দূরত্ব চুরি। হঠাৎ দুলে ওঠে নৌকো। চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে ওরা। তাহ'লে বুঝি দেখা গিয়েছে লাল, হলুদ, সাদা রংএর কোর‍্যাল ফ্লাওয়ার। ঝপাঝপ্ প্যাণ্ট জামা খুলে ফেলে তারা। কেবলমাত্র জাঙিয়ায় লজ্জা নিবারণ করা। একটা ক'রে দা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। অদ্ভুত দেখতে হয় চেহারাগুলি। সকলের চাইতে বেশি আকর্ষণ করেছিল আমার দৃষ্টিকে জ্যাকি। বিরাট-দেহী মানুষটা নৌকোর গলুই-এর ওপরে দাঁড়িয়ে সোজা জলের ভেতরে ডাইভ খেল।

তাকিয়েছিলাম জলের ভেতরে। সঞ্চরমান দেহগুলি কেমন দেখায় তাই দেখতে চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ কানে আসে বিশ্বাসের ধম্‌কানির শব্দ। মুখ ফিরিয়ে দেখি সুচিং উপুড় হ'য়ে শুয়ে তাকিয়ে রয়েছে জলের দিকে। আর বিশ্বাস একটানা ধম্‌কে চলেছেন। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই নেই সুচিংএর। ওর ভাব দেখে মনে হয় দৃষ্টি সরালেই

কোনও কিছু হারিয়ে ফেলবার ভয় তাকে এতখানি অবাধ্য হতে বাধ্য করেছে।

বিশ্বাসের এই ধম্‌কানির কারণটি আমার ঠিক মাথায় ঢোকেনা। ও যদি জলে নামতে না চায় তাতে ধম্‌কাবার কি আছে? একটু ইতস্ততঃ ক'রে শেষে জিজ্ঞাসা করে ফেলি কারণটা। উত্তর যা শুনি তাতে হাত পা অবশ হ'য়ে যেতে চায় আমার। আন্দামানের সাগরে হাঙরের উৎপাত আছে। তাই একসঙ্গে কয়েকজনে জলে নামে। জন দুই পাথরের ফুল তুলবে' আর সকলে দা নিয়ে পাহারা দেবে। তবে ছোট জাতের হাঙরই বেশি। দা'এর দু'চার কোপ খেলেই হয় মারা পড়ে, নয়ত' পালিয়ে যায়। আবার আহত হ'য়ে ধরাও পড়ে দু'একটা।

বকে বকে থেমে গিয়েছেন বিশ্বাস। নিথর সমুদ্রের বুকে যে আলোড়ন জেগেছিল তাও গিয়েছে শান্ত হ'য়ে। রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে আছি আমরা ঐ যেখানে দেখা যাচ্ছে কয়টি চলমান দেহ। স্থির হয়ে গিয়েছে জ্যাকি। পাহাড়ের বুকে কোপ মেরে খসিয়ে নিচ্ছে পাথরের ফুল। তখন বুঝতে পারিনি এ ফুল তোলায় এতখানি ঝুঁকি ওরা কেন নেয়। পরে শুনেছিলাম সৌখীন বাবুদের কাছে বেশ ভাল দামেই বিক্রী হয় এই কোর‍্যাল ফ্লাওয়ার। এটা খালাসীদের উপরি রোজগার।

হঠাৎ নৌকোটা একটু দুলে উঠতেই মুখ ফিরিয়ে দেখি সুচিং নেই নৌকোয়। শুধু তার সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসা তীক্ষ্ণ-মুখ লৌহ-শলাকাটির ভোঁতা দিকটা ডুবে যাচ্ছে দেখা যায়। উত্তেজনার একটা শিহরণ বয়ে যায় দেহে মনে। অমন নিঃশব্দে নেমে গেল কেন সুচিং? তা'হলে কি কোনও—বাধা পায় চিন্তা। বিশ্বাস চেপে ধরেছেন আমার একখানি হাত। এমন শক্তভাবে ধরেছেন যে রীতিমত ব্যথা অনুভব করছি আমি। কিছু একটা ঘটতে চলেছে নিশ্চয়। দৃষ্টিটাকে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ ক'রে জলের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করি। যা দেখি তাতে বুকের রক্ত হিম হ'য়ে যায় আমার। উঠে আসছে জ্যাকি। আর তার দেহখানি লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে বিরাট আকারের একটি হাঙর। আকলুরা ভেসে উঠেছে একটু দূরে। বুকের দম ফুরিয়ে গিয়েছে তাদের। তাড়াতাড়ি এগিয়ে

আসছে নোকোর দিকে। চীৎকার ক'রে ওঠেন বিশ্বাস জল—নাড়িও না কেউ।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি—জ্যাকি আর হাঙরের ঠিক মাঝখানে পাহাড়ের ওপরে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুচিং। দু'হাতের শক্ত মুঠিতে বাগিয়ে ধরে রয়েছে শলাকাটি। যদি জ্যাকিকে ধরতে হয় তাহ'লে ওর মাথার ওপর দিয়ে জীবটিকে ভেসে যেতেই হবে। ভুস্ ক'রে উঠে পড়ল জ্যাকি। খপ্ ক'রে তার হাত থেকে ফুলগুলি ধরে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন বিশ্বাস—হাঙর—সুচিং—

বিষদ্ভাবে বোঝাবার ক্ষমতা নেই যেমন বিশ্বাসের তেমনি জ্যাকিরও শোনবার ধৈর্য নেই। বোঁ ক'রে একটা পাক খেয়েই ডুব দেয় সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সাগরের বুকে সৃষ্টি হয় এক বিরাট আলোড়নের। দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছে আমাদের। কি যে হচ্ছে জলের তলায় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। উৎকণ্ঠায় বুক পর্যন্ত গিয়েছে শুকিয়ে। তাহ'লে কি সুচিংই আক্রান্ত হ'য়েছে? দুটি মানুষের একটিকেও দেখা যাচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে সমুদ্রের স্বচ্ছ জল হ'য়ে উঠছে তীব্র লাল। ঢেউএর ধাক্কায় আবার তখুনি তা মিলিয়ে যাচ্ছে। উত্তেজনার মুহূর্ত যত দীর্ঘই মনে হ'ক, মানুষের নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে থাকবার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এক কি বড়জোর দেড় মিনিটের মাথাতেই ভেসে উঠল সুচিং আর জ্যাকি। ওদের হাত ধরে টেনে তুলে নিতেই অপর নৌকোটিও এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল আকলুদের। জলের বুকে সেই দাপাদাপি তখনও সমান বেগে চলেছে।

নৌকোয় পা দিয়েই বলে ওঠে সুচিং—রডঠো হালামীকা পেটকা অন্দল্ ঘুষা দিয়া।

এতক্ষণে খেয়াল করি আমি ওর হাতে সেই শলাকাটি নেই। হাঙরটার পেটের সঙ্গে গেঁথে রয়েছে বুঝি।

আন্দামান যাওয়া, সেখানে থাকা এবং ফিরে আসা নিয়ে মোট কুড়ি দিনের সমুদ্র যাত্রা আমার। পৌঁচেছি এসে গঙ্গার ঘাটে। মা খুশি। কিন্তু গোলমাল বেধেছে চিনুদের বাড়িতে। ওর বাবা কথায় কথায় একবার

বিয়ের কথা তুলেছিলেন। তাতেই বেঁকে বসেছে ও। বলেছে—বিয়ে করবে না। ভুল ক'রেছে সেইখানে। আইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাকলে বিয়ের কথা ওরকম বহুবারই ওঠে। তারপর আবার চাপাও পড়ে যায় আপনা আপনিই। কিন্তু চিনু ভুল বুঝে দিয়েছে ওর বাবার মনে সন্দেহ জাগিয়ে। শুধু তাই নয়। বাইরে থেকেও নাকি দু'একটা কথা ছিটকে এসেছে তাঁর কানে। সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে এক বিধবা বোনের আমদানি ক'রেছেন তিনি। এতকথা জানতাম না আমি। পূর্বের মতই নিশ্চিন্ত মনে চলেছিলাম বাড়িটার দিকে। অন্তরে পুলক। সমুদ্র-যাত্রা থেকে ফিরেছি, না যেন যুদ্ধ জয় ক'রে এসেছি। পা দু'খানায় যেন পাখনা গজিয়েছে। হাঁটছি, না উড়ছি, খেয়াল নেই নিজেরই। এমন সময় কোথা থেকে এসে ঘিরে ধরে কয়টি ছেলে।

কোথায় যাবেন ?—রুক্ষস্বরের প্রশ্ন একজনের।

থমকে দাঁড়িয়ে যাই।

চিন্ময়দের বাড়ি, কেন ?

সে এখন অফিসে। সেটা জানা আছে নিশ্চয়ই ?

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। তবুও চিনুর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। যেভাবে হ'ক তাকে জানিয়ে দিতেই হবে আমার আগমন-বার্তা। কথাটির উত্তর দিই সেই ভাবেই—কাল সবে জাহাজ থেকে নেমেছি। আজ এসেছি দেখা করতে। আসুন না আমার সঙ্গে। বাড়িতে শুধু বলে যাব চিন্ময় যেন দেখা করে একবার।

এরপর আর কথা চলে না। এর পূর্বে যতবার এসেছি, মনে পড়েনা এদের কাউকে দেখেছি বলে। তাছাড়া বাড়িটা একটেরে হওয়াতে, কে এল আর কে গেল, বড় একটা খোঁজ রাখত না কেউ। আমাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলবার পক্ষে সে ছিল এক অমোঘ সুযোগ। আজ সে পথে পড়েছে কাঁটা। বুঝতে পারি এ উপকারটুকু চিন্ময়েরই কীর্তি। কিন্তু ভাবতে ভুলে গিয়েছিল ও যে ভালবাসার রাস্তা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অনেক অলিগলি পেরিয়ে গিয়ে তবে উঠতে হয় বড় রাস্তার সহজ সার্থক জীবনে। ছেলে কয়টিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই নির্দিষ্ট বাড়ির দরজায়। কড়া

নাড়তেই ভেতর থেকে একটি বয়স্ক গলার সাড়া পাওয়া যায়—কে? তারপরই যে দরজা খুলে দাঁড়ায় তাকে আমি বয়স্কা দেখতে চাইনা কোন-দিনই। ঠোঁটের কোণে সবে জেগে উঠেছিল একটুকরো হাসি, মিলিয়ে যায় আমার পার্শ্বচরদের দিকে নজর পড়তেই। ওর অবস্থা বুঝেই তাড়া-তাড়ি বলে উঠি আমি—চিন্ময়কে বলবেন যে আমি এসেছিলাম। একবার যেন দেখা করে আমার সঙ্গে।

বলব। তবে দাদা যেতে পারবে কিনা বলতে পারছি না, গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় চিনু, পিসীমা আবার একটু অসুস্থ কিনা।

ও, আচ্ছা আমি চলি, বলে ফিরতে গিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়াই—যদি একান্তই না যেতে পারে তাহ'লে চিঠি লিখতে বলবেন। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

একটা পুরোপুরি নমস্কার জানিয়ে ফিরে আসবার সময় এক পলক দেখে নিই আমার দেহরক্ষীদের মুখ। চুপ্‌সে গিয়েছে। পারিশ্রমিক হিসাবে পরিশ্রমটাই লাভ হ'ল তাদের। আর যা বলবার, যা শোনবার সবই সেরে এলাম আমি। এখন শুধু প্রতিক্ষার পালা, কবে পাওয়া যাবে লিপিবদ্ধ বিশদ বিবরণী।

তাও পাওয়া গেল দু'তিন দিনের ভেতরেই। বাড়ির আবহাওয়া গুমোট, বাপ মেয়েতে কথা প্রায় বন্ধ। তার ওপরে পাহারাদারীর জন্যে এক পিসীমাকে নিয়ে এসেছে চিন্ময়। তিনি নাকি হ'য়েছেন গোদের ওপরে বিষফোড়া। এখান থেকে গুছোচ্ছেন আর মেয়ের বাড়ি চালান দিচ্ছেন। এভাবে আর কিছুদিন চললে নাকি স-মূলে উৎখাৎ হ'তে হবে সংসারটিকে। একটু আধটু নয়, প্রায় দু'পাতা জোড়া চিঠি। দুঃখও হয়, হাসিও পায় ওর চিঠি লেখবার রকম দেখে। ছত্রে ছত্রে মনের ভাব বদলের সাক্ষর বিদ্যমান। এই ভাবেই কত অবান্তর কথা বলে, কত প্রয়োজনীয় কথা উহ্য রেখে কোন রকমে শেষ ক'রেছে চিঠিখানি। উপসংহারে এসে লিখেছে, আগামীকাল তোমার এস. এস. কমলার ঘাটে গিয়ে দেখা করব, ঠিক দুটো থেকে আড়াইটার ভেতরে। হাজির থেকো। অনেক কথা আছে।

হাজির ছিলাম। আর ও-ও ঠিক সময়েই এসেছিল। বহুদিন পরে,

মনে হয়, যেন একযুগের পরে এসে আবার এমনভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমরা। সামনেই গঙ্গা। তারই প্রসারতা অনুভব করি নিজের অন্তরে। সার্থকতায় উদার। দু'জনে হাঁটতে থাকি দক্ষিণমুখো। কল্‌কলিয়ে উঠেছে হৃদয়ের আবেগ। নিজের অভিজ্ঞতার থলি উজাড় ক'রে দেবার জন্যে সে মুখিয়ে উঠেছে। কিন্তু তার পূর্বে একটা পছন্দমত বসবার জায়গার দরকার। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে ফোর্টের খালের ওপরের ব্রীজ পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াই চওড়া বাঁধের ওপরে।

এখানেই পা ঝুলিয়ে দিয়ে বেশ বসা যাবে, কি বল?—বলে চিনুর দিকে তাকাতেই দেখি মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে ওর।

কি হ'ল? অমন শুকিয়ে গেলে যে? চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করি।

দাদা।

চম্‌কে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি চিন্ময় দাঁড়িয়ে। দুটি চোখে পরিপূর্ণ জীঘাংসা। আমার চোখে চোখ পড়তেই একরকম লাফিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের সামনে। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—দেখ অশোক, তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি। শুধু তোমার জন্যে আমরা পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না।

উত্তর দিই না ওর কথার। অপেক্ষা করতে থাকি ওর বক্তব্যের সবটুকু শোনবার জন্যে। কিন্তু এর বেশি আর কিছুই বলল না চিন্ময়। চিনুর একখানা হাত চেপে ধরে বলে উঠল—চল।

তুমি যাও, কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল চিনু, আমার একটু দরকার আছে অশোকদার সঙ্গে।

না, কোন দরকার নেই। দাঁতে দাঁত চেপে বলে চিন্ময়।

দাদা, যদি সাহায্য করতে পার আমাদের, কর। যতখানি সম্ভব স্থির শান্ত গলায় বলে চিনু, আর তা যদি না পার, বাধা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো না, মানতে পারব না।

সম্পূর্ণ নির্বাক হ'য়ে গিয়েছিল চিন্ময় সেই কথা শুনে। কেমন এক অক্ষম ক্রোধের জ্বালাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল চিনুর মুখের দিকে। তারপরই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা হাঁটতে সুরু ক'রেছিল। চিনুও

আর অপেক্ষা করতে পারেনি। আজ চলি, পরে আরেকদিন আসব, বলে সেও হাঁটতে সুরু করেছিল বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে।

ফিফ্থ্ ইঞ্জিনিয়ার থেকে প্রমোশান পেয়ে সিক্স্থ্ হ'য়ে গেলাম। কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু ঐ যে কবিগুরু বলেছেন—জগতে কত কি ঘটে যাহা তাহা—। অসম্ভবের রাজ্যের সীমানা আমরা ক্রমেই পেরিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এক মাস্টার মশায় ছিলেন, যিনি পরে ছাত্র হ'য়ে গিয়েছিলেন, কলেজে ঢুকে। তেমনি আমিও সিক্স্থ্এ প্রমোশান পেলাম। আর ব্যাপারটা ঘটালেন বিশ্বাস। তিনিই একদিন খোঁজ দিয়েছিলেন আমাকে—এম্. ভি. অর্থাৎ মোটর ভেস্ল্ বিহঙ্গম্এ সিক্সথ্ ইঞ্জিনীয়ারের কাজটা খালি হ'য়েছে। তুমি তোমার অভিজ্ঞতা জানিয়ে এবং সার্টিফিকেটের নকল দিয়ে দরখাস্ত কর। আমার সঙ্গে ওদের চীফ জাহ্নবীবাবুর একটু জানাশোনা আছে। বলে কয়ে দেখব।

দরখাস্ত ত' অনেক আগে করেছি আমি—উত্তর দিয়েছিলাম।

সেটার ওপরে ধূলোর আস্তরণ পড়ে গিয়েছে। তুলে নিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে দেখতে পারবে না। নতুন একখানা ছাড়—বলেছিলেন তিনি।

শুনেছিলাম সে কথা। ছেড়েছিলাম দরখাস্ত। সঙ্গে অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানলিপির নকল। তাছাড়া ছিলেন পতিতপাবনী জাহ্নবী। তবে গিয়ে সিক্সথ্এ দাঁড়ালাম। এই ষষ্ঠ স্থানটিও আমার কাছে চাট্টিখানি নয়। একমাসের অভিজ্ঞতাতেই একধাপ এগুনো। ছোট জাহাজগুলিতে সাধারণতঃ থাকে পাঁচজন ইঞ্জিনীয়ার। সেখানে পঞ্চম স্থানটি কনিষ্ঠ। কিন্তু বড় জাহাজে থাকে আটজন ইঞ্জিনীয়ার। তার ভেতরে সিনিয়ার থার্ড ও জুনিয়ার থার্ড থাকায় সপ্তমই হচ্ছে শেষ ধাপ। আর ষষ্ঠ হওয়া মানে একধাপ এগিয়ে যাওয়া। যদিচ কর্তব্যে প্রভেদ নেই। অর্থাৎ দাদাদের সাহায্য করা। তাহলেও খুশি আমি। ঘুরে বেড়াব সাত-সাগরের কূলে কূলে বিহঙ্গমএর বুকে চেপে। দেখব সেখানকার মানুষ। তাদের জীবন-যাত্রা। একটু একটু ক'রে পূর্ণ হ'তে থাকবে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি।

সাহস বেড়ে গিয়েছে মায়ের। একপাক ঘুরে এসেছিত'! আর এসে গল্পও করেছি ফলাও ক'রে। চিরসবুজ আন্দামানের চেহারাখানি কি রকম দেখতে। পথ চলতে চলতেই হঠাৎ ঝির ঝির ক'রে ক'ফোটা আকাশ চোঁয়ান জল ভিজিয়ে দিয়ে গেল জামা কাপড়। মা-বাপ নেই এ বৃষ্টির। শাসনের গণ্ডী ভাঙা পথের ছেলে দুরন্তপনা ক'রেই চলেছে এই স্বল্প প্রস্থ আর প্রায় দু'শ মাইল লম্বা জমিখণ্ডের ওপ'র। শীতের বাতাস গায়ে লাগতেই ঝিমিয়ে পড়ে এই দামালপনা। দুষ্টু ছেলেটি যেমন নেতিয়ে পড়ে সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই।

হাঁ ক'রে শুনেছেন মা। আর হয়ত' মনে মনে ভেবেছেন, ছেলে তাঁর কি একখানা কাণ্ডই না ক'রে এল। যাই হ'ক, বিশ্বাসের চেষ্টাতে যখন এম. ভি. বিহঙ্গম্‌এ কাজ পেয়ে গেলাম তখন আর ক'লকাতার কোনও অফিসে দরখাস্ত দিতে বলেননি মা। তাছাড়া কনট্রাক্টের অঙ্কটিও বলেছিলাম মাকে। শুনে তাঁর মুখে একটু হাসিও ফুটে উঠেছিল।

দূরপাল্লার জাহাজ। সুয়েজ পেরিয়ে ছুটবে পাশ্চাত্য দেশের বন্দরে বন্দরে। মনের ভেতরে অনুভব করি ধীর কম্পন। কয়েকদিনের ভেতরেই আবার ছাড়তে হবে কলকাতা। মাল উঠছে জাহাজে। ব্যস্ত গানার আর টালি-ক্লার্কের দল। যেন আত্মীয়-স্বজনেরা তাড়াতাড়ি ক'রে সাজিয়ে দিচ্ছে তাদের বাড়ির মেয়ের বিয়ের যৌতুকগুলি। স্বামীর ঘরে প্রথম চলেছে সে মেয়ে।

একটি গানের দুইটি লাইন মনে পড়ে। কোন এক বিরহীকে গঙ্গার ধারে বসে গাইতে শুনেছিলাম। সবটা যেমন মনে নেই তেমনি দুটি লাইন তার কোনদিনই ভুলব না—

শেষ বিদায়ের ক্ষণটি আমার অশ্রু দিয়ে ভেজা
আমি ভুলব কেমন করে?

আমারও সেই অবস্থা। কেঁদে ভাসিয়েছিল চিনু। বুঝেছিলাম তার মনের অবস্থা। আমি থাকব দূরে। ওর বাবা সেই সময়ে যদি জোর ক'রেই ওকে বসিয়ে দেন আলপনা আঁকা পিঁড়িতে, বাধা দেবার শক্তি কোথায় পাবে? একটি মাত্র সাহস হচ্ছে চিন্ময়। অদ্ভুত মানুষের মন।

পরিবর্তনশীলতার অন্ত নেই তার। যে মানুষ গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে শাসিয়ে গিয়েছিল আমাকে সেই মানুষটির সম্বন্ধেই একটি দীর্ঘ চিঠি পেয়েছিলাম চিনুর কাছ থেকে। লিখেছিল—সেদিন বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম দাদার আগেই। এসে গুম্ মেরে বসেছিলাম নিজের ঘরে। ভাল লাগছিল না কিছুই। কেবলই মনে হচ্ছিল জীবনটা বুঝি সত্যিই ব্যর্থ হ'তে চলেছে আমার। আমি বসে থাকলেও সময়ত' আর বসে থাকে না। সে ঠিক এগিয়ে গিয়েছে তার হিসাব অনুযায়ী। বাবা ফিরে এসেছেন অফিস থেকে। বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে পিসীমার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি সব কথাবার্তা বলছেন। হয়ত' আমার সারাদিনের ডাইরী নেওয়া হচ্ছে। হ'ক্। আমি উঠিও না, নড়িও না। দুর্ভোগ যে ষোল আনার ওপরে আঠারো আনা আছে, তাত' বুঝতেই পারছি। নৈলে আর তোমার তীর্থে গিয়ে মাথা মুড়োব কেন? যাইহ'ক, প্রায় সাতটার সময়ে দাদা ফিরে এল। উস্কো খুস্কো চুল, ধুলোর একটা পাতলা আস্তরণ পড়েছে মুখের ওপরে। বোধহয় সমস্তটা দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। এসে ঢুকল আমার ঘরে। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিল। একটু নড়ে বসতে গেলাম আমি তার দিকে তাকিয়ে। পারলাম না। ঠায় তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। দেখি মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছে দাদা। কি ব্যাপার, মাথায় আসছে না কিছুই। কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর চাপা-স্বরে এমন একটি কথা বলল, যা আমি আশাও করতে পারিনি তার কাছ থেকে। বলল—দেখ্, আমি জানি অশোকের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুই সুখী হবি। আমার তাতে আপত্তিও নেই। কিন্তু বাবার দিকে তাকালে নিজেকে কেমন হারিয়ে ফেলি। কথা শেষ ক'রে আমার মাথাটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে চলে গেল দাদা। শুধু এইটুকুই নয়, আরও একটু কাজ করেছে দাদা। পিসীমার সঙ্গে বাবার ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে। পিসীমার জামাইকে নাকি ঘড়ি কিনে দিতে হবে। অবশ্য লোভের ইন্ধনটা জুগিয়েছে দাদাই। তারপর বাবার কাছে কথা পাড়তেই জ্বলে উঠল আগুন। পুরো দুটো দিন ধরে দাউ দাউ ক'রে জ্বলবার পর আজ জামাই-এর কাছে চলে গেলেন পিসীমা। দাদাই পৌঁছে দিতে গেল তাঁকে।

যাবার আগে বলে গেল—আমি শুধু সাহায্যই করতে পারি, এগিয়ে চলবার ভার তোদের। অতএব চিঠি পাওয়ামাত্রই একবার আসবে তুমি। অনেক কিছু যুক্তি পরামর্শ করবার আছে।

সেই কথাই বলছিলাম যে ঐ চিঠি পেয়েই গিয়েছিলাম চিনুর সঙ্গে দেখা ক'রতে। তখনও ওর মনের এ অবস্থাটি দেখতে পাইনি। বরঞ্চ ঠিক উল্টোটিই দেখেছি। হাত ধরে হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল বিছানায়। তারপর দু'হাত মাজার ওপরে রেখে এক অপরূপ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বলেছিল—কি পুরস্কার দেবে বল ?

হেসে ফেলেছিলাম ওর ঐ মূর্তির দিকে তাকিয়ে। বলেছিলাম—নতুন আর কোথায় পাব ? সবইত' দিয়ে রেখেছি।

আহা, আহ্লাদ! সেত' যা কিনেছ তারই দাম। ওতে হবে না। নতুন কিছু চাই।

বেশ, সাগরপার থেকে এনে দেব।

মনে থাকে যেন। জামাটা খোল। বলেই পাশের ঘরে চলে যায় চিনু। আমি চুপ ক'রে বসে ভাবতে থাকি আজ এ কিসের রহস্যে ধরেছে ওকে। এক একদিন করেত' এমন। কোনদিন বলে—চোখ বোঁজ, মুখ হাঁ কর। কোনদিন বা বলে—ভবতী ভিক্ষাং দেহি বলে হাত পাত। আজ না করব হাঁ, না পাতব হাত। তাহলে কি জামা খুলে পিঠ পাততে হবে আজকে ? ভেবেই চলেছি। ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে যায় সে।

একি, জামা খোলনি এখনও ?

এই যে খুলি, বলে তাড়াতাড়ি খুলতে থাকি জামা। যে অভিমান মেয়ের, এখুনি হয়ত' মুখের ওপরে নেমে আসবে আষাঢ়ে মেঘের ছায়া। জামা খোলা হ'য়ে যেতেই উলের একটি পুলওভার আমার হাতে দিয়ে বলে, দেখত' ঠিক হ'য়েছে কিনা।

মাপ নিলে কখন ? পুলওভারটা গায়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করি।

প্রতিনিয়তই নিচ্ছি। গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় সে—যে মানুষটাকে এতগুলো দিন ধরে এমন নিবিড়ভাবে দেখছি তার গায়ের মাপ ত' আমার চোখে।

এ কথার পরে কিছু বলতে যাওয়া মানে কথাটির পিছনে যে মনটি রয়েছে, তার অপমান করা। পুলওভারটা গায়ে দেওয়া হ'য়ে যেতেই টেনে-টুনে ঠিক করে দেয় সে। কড়া নজর দিয়ে দেখতে থাকে বিশেষ কোন ত্রুটি কোথাও আছে কিনা। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জিটা ভালভাবে চেপে ধরে বেশ সহজ ভাবেই বলি—সুন্দর হ'য়েছে। আমিত' বিশেষ কোন খুঁত দেখতে পাচ্ছিনা।

পিছন, পাশ দেখা সেরে সামনে এসে দাঁড়ায় চিনু। আমিও একটু পাশ দিয়েছি।

ওকি, তুমি আবার ঘুরছ কেন ? ধম্‌কে ওঠে সে।

না, ঘুরিনি। বড় গরম বোধ হচ্ছে। তোমার দেখা হয়নি এখনও ?

বারে, ভাল ক'রে দেখতে হবে না কোথাও কোন—আটকে যায় কথাটা আমার হাত ধরে টান দিতেই। পুলওভারের ডান হাতখানি বাঁ হাতের চাইতে অন্ততঃ ইঞ্চিদুয়েক ছোট। মুখের হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গিয়েছে কখন। ক্রমেই গুমোট হয়ে আসছে আবহাওয়া। হয় ঝড়, নয়ত' জল। একমাত্র পথ ঝড়ো বাতাসে মেঘটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। দম্‌কা হাসি হেসে উঠি আমি। হাসতেই থাকি আর লক্ষ্য ক'রতে থাকি আকাশের অবস্থা। প্রায় দু'মিনিট ধরে বেদম হাসির চোটে গলা বুক শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে এসেছে, সেই সময় চোখে পড়ে রোদের আভা। এবারে বোঝাতে গিয়ে আর কত কষ্ট পেতে হবে না ভেবে বলতে যাই—বলা হয় না। এক ধমকেই মুখ বন্ধ। কাছে এসে হাতাদুটো টেনে-টুনে দেখে বলে, খুলে দাও। আজই একে ধাতস্থ করব। হবে না! আসলে নিজেরই একটা হাত ছোট, একটা হাত বড়। এখন আমার হ'ল দোষ!

এবারে আর একা নয়। দুটি গলায় একই সুর ওঠে। আর তারই ধমকে নাড়া খেয়ে যায় শালীনতার সুরে বাঁধা তারগুলি। কিম্বা ঘুম ভেঙে যায় সুষুপ্ত আকাঙ্খার। অথবা সুযোগ-সন্ধানী সে দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষায় ছিল কবে মিলবে এই অপূর্ব সুযোগ, যখন বিস্রস্ত-বসন সে এসে লুটিয়ে পড়বে আমার গায়ে। সকল সাবধানতার সীমারেখা অতিক্রম ক'রে হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করি তাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সজাগ-স্নায়ুর

বিপ্রকর্ষণে ছিটকে দূরে সরে যায় সে। থেমে যায় তার মুখের হাসি। তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মাত্র দুটি শব্দের মাধ্যমে মাটির স঳ঙ্গে মিশিয়ে দেয় আমাকে— না, ছি ঃ।

সেদিন যে কি করে বাড়ি ফিরেছিলাম মনেও নেই। তবে তারপর বেশ কয়েকটা দিন আর ওমুখো হ'তে পা.রিনি। নিজের ধিকৃত মন নিয়ে ঘুরেছি রাস্তায় রাস্তায়। কখনও বা বেঁকে বসেছে মন—হয় না, হ'তে পারে না। অন্তরের উদ্দাম চাহিদাকে কয়েদখানায় পুরে এই অবাধ মেলামেশা চলতে পারে না। তার চাইতে যাবনা ওর কাছে আর, যতক্ষণ না এক ক'রে নিতে পারছি নিজেদের। অনুভব ক'রেছিলাম তখনই যে মন অনেকখানি স্নায়ুনির্ভরশীল। চিন্তার গতি ফেরে তারই ওপরে ভর দিয়ে। সবলতা ফিরে পেয়েছি যখন, তখন আবার ভেবেছি—কেন যাবনা? গেলাম মানেই হারিয়ে গেল সব? এতটুকু বিশ্বাস নেই নিজের শক্তির ওপরে? ভেবেচি কত কিছুই, কিন্তু যাইনি। পর পর দু'খানি চিঠি পেয়েছি চিনুর। কতকিই লিখেছে। লিখেছে ভয়ের কথা, ভাবনার কথা, অনাগতকালের কথা। তাইত' তাকে অত সাবধানে সরিয়ে রাখতে হয় নিজেকে। নইলে সে আর আমি কি পৃথক! তবুও যাইনি।

গিয়েছিলাম বিহঙ্গম্ ছাড়বার আগের দিন। বিদায় নিয়ে আসতে। দরজার কড়া নাড়তেই এসে দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল সে—এস। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখতেও পারিনি তার মুখখানি। তবুও মনে হ'য়েছিল দু'দিন পূর্বের সে উদ্দামতা আর নেই। অবাঙ্ময়, শান্ত। ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতেই বলেছিল—বস। কথা আঁছে।

নাঃ। বসবার সময় হবে না। কাল জাহাজ ছাড়বে। অন্যদিকে তাকিয়েই উত্তর দিয়েছিলাম।

পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। বুকের কাছে। জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার কি হয়েছে বলত'? সেদিনকার রাগ?

রাগ নয় চিনু। উত্তর দিয়েছিলাম আমি, যে অসভ্যতা—

মোটেই অসভ্যতা নয়। ঝাঁকি দিয়ে উঠেছিল সে—দেয়া-নেয়ার জীবনে দিলাম না কিছুই, পাওনার কোঠাটিও থাকল শূন্য পড়ে, এ নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।

পরিবর্তনশীল জগৎ। জানি। কিন্তু চিনুর এই হঠাৎ পরিবর্তনে রীতিমত অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম আমি। সন্দেহও জেগেছিল মনে—ওকি আমাকে খুশি করবার জন্যই এই কথাগুলি বলল ?

খুশির কথা নয়, অন্তরের কথাই বলেছিল সে, আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে—সমাজ আমাদের বিয়ে মেনে নেবে কিনা ভাবিনি, ভাববও না। কিন্তু নিজেরাও যে আমরা এখনও দূরে দাঁড়িয়ে আছি।

আর বলবার প্রয়োজন নেই। দু'কথায় আমাদের অবস্থাটি বেশ ভালভাবেই বুঝিয়ে বলেছে চিনু। মনে পড়ে সেই বিখ্যাত ছাত্র রমেশ-চন্দ্রের সম্বন্ধে প্রচলিত কথাটি। তিনি নাকি এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার সময় ইংরাজী রচনার কতকগুলি পয়েণ্ট দিয়ে নীচে লিখে দিয়েছিলেন—এই পয়েণ্টগুলি :বাড়ালেই রচনাটি পাওয়া যাবে। চিনুও তেমনি পয়েণ্টটি ধরিয়ে দিয়েছে আমাদের অবস্থা-রূপ রচনার। যা বাড়াতে গিয়ে ঠিক বেঠিকের হদিস্ পাইনা আর। জিজ্ঞাসা করি—এখন কি করতে চাও ?

বুঝতে পারছি না, চিন্তিতভাবেই উত্তর দিয়েছিল সে—পাড়ার পাঁচজনের কৃপায় বাবার কানে ভালভাবেই উঠেছে কথাটা। রেগে কাঁই হ'য়ে রয়েছেন।

তাহ'লে ?

তুমিই বল।

দেখ চিনু, অবস্থা বুঝেই বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করি, শক্তি থাকে মানুষের অন্তরে।

আর বলতে দেয়নি ও। খপ্ ক'রে চেপে ধরেছিল আমার মুখ। আসন্ন বিপদকালে মানুষ উপদেশামৃত শুনতে চায় না। চায় যুক্তি, বুদ্ধি। জানি। কিন্তু আমার বুদ্ধিতে ত' একমাত্র শক্তি ছাড়া আর কিছুই আসেনা। দু'জনের শক্তি মিলিয়ে যদি কিছু করা সম্ভব হয়। একজনও পিছিয়ে গেলে চলবে না। হাতখানা সস্নেহে আমার মুখের ওপর থেকে

তুলে নিয়ে আবদ্ধ ক'রে রাখি আমার দু'হাতের মুঠোয়। তারপর স্পষ্ট, স্থির-প্রতিজ্ঞের মতই বলি—চিনু, তোমার আমার রাস্তা বাঁধানো নয়। দু'জনকে পথ তৈরী ক'রে নিয়ে চলতে হবে। সে শক্তি যদি থাকে তবেই এগুনো ভাল।

নিজের অন্তরকে বিচার ক'রে কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু চিনু যে অমন নাটকীয়ভাবে নস্যাৎ ক'রে দেবে আমা"ক, ধারণাও করতে পারিনি তা। বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল ও। আমার কথার শেষেও। তারপর হাতটা আস্তে টেনে নিয়ে হঠাৎ উঠে চলে গিয়েছিল সে ঘর ছেড়ে। ভেবেছিলাম বুঝি রাগ করেছে। মান ভাঙাবার জন্যে মনটাকে তালিম দিচ্ছি, ফিরে এসে দাঁড়াল। একদম আমার সামনে। হাতে একটা ছোট্ট কৌটো। সেটা খুলে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে।

মায়ের সিঁদুর। পরিয়ে দাও।

ঠিক এরকম পরিস্থিতির জন্য তৈরী নয় মন। কি করি, কি করা উচিত এ অবস্থায়? সুন্দর অথচ ভীষণ কঠিন এক পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে চিনু আমাকে। দ্বিধা এবং দ্বন্দের দোলায় বিপর্যস্থ অবস্থা আমার। ভয় হচ্ছে হঠকারিতা না হ'য়ে যায়!

চিনু শেষ ক'রে ফেলেছে তার সমস্ত চিন্তার। তাগাদা দেয়—কৈ, পরিয়ে দাও।

তবুও প্রশ্ন করি—এর পরের কথা চিন্তা করেছ?

করব। এর পরে। স্থিরিকৃত মনের পরিচয় পাওয়া যায় ওর প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে—আগে পরিয়ে ত' দাও। অবশ্য যদি তোমার মনে সে জোর থাকে।

এরপর আর কথা বাড়াবার শক্তি বা সাহস জোটেনি আমার। কিছুটা সিঁদুর তুলে নিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছিলাম ওর সুন্দর সিঁথিটি। লগ্ন মানিনি। প্রয়োজন নেই সাক্ষীর। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল হৃদয়াবেগ। মেনেছিলাম তারই কথা। সমাজ থাকুক তার রক্ত-চক্ষু নিয়ে দূরে বসে। আমরা না মানার দল চলব এগিয়ে।

সিঁদুরের কৌটোটা পাশে রেখে প্রণাম সেরে উঠে গিয়েছিল সে কৌটোটা রেখে আসতে। ফিরে এল আর এক মানুষ। চোখের ওপরে এখনও ভাসছে সেই চেহারাখানি। মাথায় ঘোমটা। গলায় গান—'আমরা দু'জনা স্বর্গ রচনা করিব এ ধরণীতে।'

বাঁধ-ভাঙা দুটি মন। সমস্ত অন্তর দিয়ে মিলেছিল সেদিনকার সেই একান্ত বাসরে। জীবন সুন্দর। অনাস্বাদিত জীবনের প্রথম সে মাদকতাময় মুহূর্তটি আজও যেন চোখ বুঁজলে দেখতে পাই।

বিদায়ক্ষণটিতে আবার প্রণাম সেরে উঠেই জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে। চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিল আমার বুক। বলতে পারিনি কোনও কথা। গলা ভিজে। চোখ দুটিও বারে বারেই ঝাপসা হ'য়ে উঠছে। একরকম পালিয়েই এসেছিলাম তার কাছ থেকে।

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলকে দূরে রেখে ছুটে চলেছে বিহঙ্গম। সিংহলকে প্রদক্ষিণ ক'রে সোজা গিয়ে থামবে বোম্বাই। কিছু মাল উঠবে। তারপর সেই যে দম বন্ধ ক'রে ছুটতে আরম্ভ করবে, নিঃশ্বাস ফেলবে এসে এডেনে। আরব সাগরকে সোজা পাড়ি দিয়ে। বেসাতি নেই। রসদের খোঁজে। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে যাদের যেতে হয় বা যারা বিষুবরেখাকে অতিক্রম ক'রে যায় অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা অথবা আফ্রিকার উপকূলে, তাদের একবার আসতেই হবে এডেনে। তেলের খোরাক নিয়ে বসে আছে ইংরাজ কোম্পানী। সুলভ। তাই এডেনের বন্দর জাহাজে জাহাজে ঠাসাঠাসি। বিভিন্ন জাতের লস্করদের গলার সম্মিলিত সুর আর কথাবার্তায় তার বাতাস মুখর। মাদ্রাজকে দূর পাল্লায় রেখে সোজাসুজি সিংহলকে প্রদক্ষিণ করবার চেষ্টা করি আমরা। তেল এবং সময়, উভয়েরই খরচ কমান জাহাজের লক্ষ্য।

আমার আবার দুই গুরু। বড় জাহাজের কানুন আলাদা। তাই চারঘণ্টা হিসাবে দু'বারে আটঘণ্টা ডিউটি দিতে হয় আমাকে দুই গুরুর সহায়ক হ'য়ে। তাতেও ফ্যাঁকড়া। একজন শাক্ত, অপরজন বৈষ্ণব। আমি

সেবকাধম' 'ইব্রাহিম' অর্থাৎ কিছুই না মানার দলে। সিনিয়ার থার্ড বরদা-বালা রক্ত-চক্ষু হ'য়েই আছেন আর ফোর্থ মজুমদার হচ্ছেন 'হরের্ণামৈব কেবলম্'-এর দলে। ইঞ্জিনঘরে ঢোকবার আগে পাটাতনে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে নেন। তারপর সেই যে কণ্ট্রোল প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান আর নড়বার নামটি নেই। অবশ্য প্রয়োজনও বিশেষ হয় না। চার্জ বুঝে নেবার আগে আমিই সবটা ঘুরে দেখে আসি। সব ঠিক আছে জানাতেই চার্জ নিয়ে নেন তিনি। নিশ্চিন্ত মনে কণ্ট্রোল-প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে গান ধরে দেন— A.J 19.12.79

"হরিনাম পরমব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম
অধর্ম কুকর্ম ছাড়রে,
জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে।"

হ'লে হবে কি, দৃষ্টির আঙুল দিয়ে নাড়ী ধরে রয়েছেন জাহাজের। সর্দি, কাশি, বুক ধড়ফড়ানি, জ্বর, সব ধরা পড়ে যাবে ঐ প্যানেলে। দেখেন আর মাঝে মাঝে হাঁক দিয়ে ওঠেন—সরকার, একটিবার জেনারে-টারটা দেখত' হে, কিম্বা সেট্‌লিং ট্যাঙ্কে তেল ভরে দাও। তারপরই আপন মনে বলতে থাকেন—শুধু তেল আর তেল। কি জিনিসেরই সৃষ্টি ক'রেছিলে বাবা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা চলছে ঐ একটি জিনিসের ওপরে।

আদেশানুযায়ী দেখাশোনা সেরে এসে দাঁড়াই। ওধারে ওপর থেকে নেমে আসে টিণ্ডেল খেয়ালীরাম। কি কাজে উঠেছিল ওপরে। ইঞ্জিনঘরে পা দিয়েই বলে ওঠে—হরিনামদা, খুব রেগে গিয়েছে পিল্লাই সাহেব। গালা-গাল দিয়ে ভূত ছাড়াচ্ছে কোম্পানীর। খাসা বাংলা বলে খেয়ালীরাম। জন্মাবধি খাস বাঙালীপাড়া পটুয়াটোলায় থেকে এবং বাঙালীদের সঙ্গে মিশে শুধু ভাষা নয়, কলকাতার নিজস্ব টানটিকেও রপ্ত করেছে।

পিল্লাই-এর খবরটি জানিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল সে তার চার্জে যে ক'জন আছে তাদের কাজের তদারকীতে। পিছন থেকে হাঁক পেড়ে ওঠেন, মজুমদার—এই হতভাগা, কি বললি আমাকে?

হাঁক শুনে দাঁড়িয়ে যায় বটে কিন্তু প্রশ্ন শুনে আর ঘুরে দাঁড়াবার সাহস থাকে না খেয়ালীরামের। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েই থাকে। দারুভূত মূর্তি যেন। এগিয়ে যান মজুমদার নিজেই। ধম্‌কানি দিয়ে বলতে থাকেন—হতভাগা, শিখেছ বুঝি ঐ কেলেটার কাছ থেকে? সে হতভাগাকে একদিন এ্যায়সা তাসানি দেব না—বলতে বলতেই সুর বদলে যায় তাঁর—ওরে বাপু, মরবি যে সব পাপে। তারপরই হুকুমের সুর ফুটে ওঠে স্বরে—ধর, কান ধর। আশ্চর্য হ'য়ে যাই দেখে যে সত্যি সত্যিই দু'হাতে কান চেপে ধরেছে জবরদস্ত টিণ্ডেল খেয়ালীরাম। ব্যাপার দেখে পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠছিল আমার। কিন্তু পাছে আমার ওপরেও কান ধরবার হুকুম হয়, সেই ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে হাসির গ্যাসটাকে পেটের ভেতরেই চেপে রেখেছিলাম।

যাও।

মুক্তি দেন খেয়ালীরামকে। তারপর আপন মনেই আমাকে শুনিয়ে বলতে থাকেন—পাপে মরবে সব। নামখানা জোগাড় করেছে দেখেছ? হরিনামদা! বেটাচ্ছেলের তেঁয়েটে বুদ্ধির জুড়ি নেই। আবার বলা হচ্ছে 'দাদা'! ও আমার লক্ষ্মণ ভাইরে! এই দাদার খবরটি একটিবার সেলুনের কানে গিয়ে পৌঁছুলে আমাকে পাগলা নাচ নাচিয়ে ছাড়বে সকলে মিলে, সে খবর রাখিস?

শুনি সবই, কিন্তু একটি জিনিস ঠিক বুঝতে পারি না। একজন টিণ্ডেলের এতখানি সাহস হয় কি ক'রে?

উত্তর পেয়েছিলাম কয়েকদিন পরে। ভারতীয় সমুদ্রের সীমানা পেরিয়ে যখন এডেনমুখী হয়েছি আমরা। জাহাজ চলাচলের পথে সর্বদেশীয় কতকগুলি আইন আছে। তার ভেতরে একটি হল, যে কোন দেশের স্থলদেশ থেকে সমুদ্রের তিন মাইল পর্যন্ত সেই দেশের অধিকারে। ঐ তিন মাইল অতিক্রম করলেই সার্বজনীন অধিকার। ভারতীয় কানুনে বলে ভারত-ভূমির এলাকাভুক্ত সমুদ্রে নাবিকেরা মদ স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু ঐ জাহাজ যদি বিদেশ অভিমুখে যাত্রা করে তাহ'লে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রান্তে 'পান' দোষ নয়। তাও সে অধিকারের অধিকারী শুধু অফিসার,

ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি। খালাসীরা সে আইনের ভেতর পড়ে না। অর্থাৎ তাদের গলা ভিজবে শুধু জলে।

শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে ছুটে চলেছি আমরা। ঘণ্টায় কুড়ি নট গতি। আর একটি দিন কোনরকমে পার ক'রে দিতে পারলেই পৌঁছে যাব বন্দরে। বারে বারে মনের দরজায় এসে উঁকি দিচ্ছে কবিগুরুর তুইটি লাইন—

জল শুধু জল,
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।

আর ভাল লাগছে না এই জলকে। ছোট ছোট ঢেউ-এর মাথায় খেলা করছে বালারুণের স্নিগ্ধচ্ছটা। ক্ষুদ্র বীচিমালাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ততোধিক বৃহদাকৃতি তরঙ্গের সৃষ্টি ক'রে চলেছে প্রপেলার। কানের কাছে বাতাসের গোঁ গোঁ শব্দ। মুগ্ধ হ'তে গিয়েও পারছি না। মনে হচ্ছে এই সঙ্গে যদি দিগন্তের কোণে দেখা যেত ধরিত্রীর ভ্রূ-ধনু তাহলেই বুঝি পূর্ণতা লাভ করত এই পটখানি। বর্তমানে আমার মনের অবস্থা গৃহিণীর সদ্য পিত্রালয়ে গমনের মত। আছে অথচ হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এক শূন্যতা বোধ। গৃহিণীর ঝংকারহীন নিস্তব্ধ গৃহে মনের আড়োলনও স্তিমিত। তু'জন ডেক-খালাসী তাদের ধোয়া মোছার কাজ ক'রে চলেছে। জাতে মুসলমান। চেহারা বলে। হাতের কাজের সঙ্গে চলেছে মুখের কথা। ওধার থেকে কাজ সারতে সারতে আমার দিকেই এগিয়ে আসতে থাকে তারা। একটু একটু ক'রে স্পষ্ট হচ্ছে তাদের ভাষা। বুঝতে পারি নিজেদের ঘর-সংসার নিয়েই সে আলাপ। আমার কাছটিতে এসেই দাঁড়িয়ে যায় তু'জনে। বয়োবৃদ্ধ থেটার মিঞা সেলাম জানায়। জিজ্ঞাসা করে—ছার, আমরার ঘুইরা যাইতে কয়মাস লাগবো? এ এক কঠিন প্রশ্ন। বাড়ির ঘাট ছাড়বার পূর্ব পর্যন্ত জানত কোম্পানী। এখন সম্পূর্ণ এজেন্টের হাতে। ক্যাপটেনের মতেরও দাম কম নেই। তাঁরা দয়া ক'রে যেদিন দেশে ফিরবার অনুমতি দেবেন সেইদিনই ফেরা। বাজারের মুটে, ব্যবসা বাবুর পিছু পিছু ঘোরা আর একবার ক'রে নীচু হ'য়ে ঝাঁকার ভেতর পণ্য তুলে

নেওয়া। মুক্তি তার বাবুর মর্জির ওপরে। আশ্বাস চেয়েছিল থেটার মিঞা। নিরাশ হওয়াতে খিচ্ খিচ্ করে ওঠে—ইখানে চাকরী নিয়াই হইচে এক আকামের কাম। ছুটি নিলাতো প্যাটে কিল মাইরা ঘরেত্ বইসা থাহ, আর না নিলা তো ব্যাবাক্ তুম্‌রার গেল উইর‍্যা পুইর‍্যা।

বিশেষ দরকার আছে বুঝি বাড়িতে? জিজ্ঞাসা করি আমি।

না, কিছু না ছার। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে মিঞার ছেলে কফিল। ইসারা করে বাপকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। যায় না মিঞা। বাড়ির চিন্তা অস্থির ক'রে তুলেছে তাকে। এমতাবস্থায় সামান্য ইসারার কর্ম নয় তাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনা।

ছার! আবার প্রশ্ন করে থেটার মিঞা, খত্ তো সব এ্যাডেনে আইসা গ্যাছে, না?

আসা ত' উচিত। উত্তর দিই আমি।

তয় আমরারও একখান থাকবো। নিজের মনকে যেন প্রবোধ দেয় থেটার মিঞা। কিন্তু আর দাঁড়াতে পারে না। কফিল এবারে হাত ধরে টানতে আরম্ভ করেছে তার। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি ওদের দিক থেকে। দেখাতে চাই আমার নির্লিপ্ততা। যদিও মনের ভেতরে চলেছে ওদেরই চিন্তা। কি যেন একটা রহস্যের সন্ধান পেয়েও পাচ্ছি না।

চিন্তা ঘুরছে ওদের ঘিরে। শুধু ওদের কেন, মানুষ মাত্রেই হ'য়েছে আমার চিন্তার বস্তু। বৈচিত্রের অন্ত নেই তার। খেয়ালী পটুয়ার খেয়ালে সৃষ্ট জীবগুলি সাজিয়ে রেখেছে থরে থরে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে মনে হয় জগৎব্যাপী এক রহস্যোপন্যাসের ধারা বয়ে চলেছে। তার প্রারম্ভের শত সহস্র পৃষ্ঠা গিয়েছে হারিয়ে আর অলিখিত শেষাংশের নক্সাটিও কেউ জানে না। মন্দ লাগে না ভাবতে। কিন্তু যখনই অনুভব করি আমিও ঐ রহস্য-পুস্তকের পাত্র-পাত্রীদের একজন তখনই তরল হ'য়ে আসে সে রসের গাঢ়ত্ব। ধরা পড়ে স্বাদের পার্থক্য।

পাকে পাকে জড়িয়ে চলেছে চিন্তা। এমন সময় একজন খালাসী ছুটে গিয়ে ওপরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। ছিটকে যায় চিন্তার ঘোর। চেয়ে থাকি তার দিকে। দেহটি দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে ফিরে তাকিয়ে

দেখি থেটার মিঞারা নেই বারান্দার ওপরে। মনের কোনে সন্দেহের ছায়া। নিশ্চয় বিশেষ কিছু ঘটেছে। পায়ে পায়ে এগুতে যাব, পিছন থেকে বাটলার কালু বলে ওঠে—সার, ব্রেকফাস্ট। এতক্ষণে খেয়াল হয় আমার ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ।

সেদিন সেলুনে শুনেছিলাম ঘটনাটার একাংশ। অপর অংশ তখনও ছিল রহস্যের পর্দায় ঢাকা। ব্রেকফাস্ট অন্তে গল্পের ছালা খুলে নিয়ে বসেছিল সকলে। তাহ'লেও একটু রেখে ঢেকে চলে সবাই। শুধু ডেক অফিসার দিনেশ মজুমদার একেবারে মুখখোলা। না মানে বয়স, না মানে পদাধিকার। তবুও থাকে একটু রাশটানা। কিন্তু ফোর্থ ইঞ্জিনীয়ারকে দেখলেই রাশটা কোথায় খুলে পড়ে যায়। সম্বোধনটাই হয় পিত্তি-জ্বালাকর। এই যে ভজহরিদা কিম্বা আমিদা যে—এই ধরণের একটা কিছু। ভজহরিদার অর্থ সহজ। 'আমিদা'টা হয় উভয়েই মজুমদার এই হিস্যায়। গম্ভীর হ'য়ে যান ফোর্থ। আর দিনেশ তেমনি কাকের পিছনে ফিঙে।

ভজহরিদার শরীরটা কি রকম শুকিয়ে গিয়েছে, দেখছ? কতবার বললাম—দাদা! ইঞ্জিনের গরমে শরীরটা যে শুকিয়ে গেল। নিজের ভেতরেও একটু গরম পুরুন—

থাম দেখি। ধম্‌কে ওঠেন ফোর্থ।

আরে বাবা, বিদেশে নিয়ম নাস্তি। চালাতেই থাকে দিনেশ, আমরা কি আর ফিরে গিয়ে বৌদিকে বলে দেব? না, এখনকার মুখের গন্ধ তখন অবধি থাকবে?

যত সব চ্যাংড়া ছোক্‌রা এসে বিষিয়ে তুলেছে—ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ওঠেন ফোর্থ। উঠে দাঁড়ান এই বিষিয়ে তোলা আবহাওয়া ছেড়ে যাওয়ার জন্যে। হয় না যাওয়া। পাসার এসে দাঁড়ায়। এই মানুষটার আগমনের অর্থই হচ্ছে আশার বাণী। সি-গল্‌ পাখীর মত। আশার ভরসা দিতেই যেন আসে তারা। উড়তে থাকে জাহাজের আশে পাশে। নাবিকরা ফেলে দেয় খাবারের টুক্‌রো। ছোঁ মেরে তুলে নেয় তারা সমুদ্রের বুক থেকে। কিন্তু নাবিকরা কখনও মারেনা ওদের। সংস্কার নাবিকদের। উপকূলের

বার্তা নিয়ে আসে যারা তাদের মারা নাকি পাপ। বিপদ ঘটতে পারে। পার্সারও আমাদের কাছে ঐ সি-গল্ পাখীরই মত। আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই তার। কিন্তু যে সব বন্দরে কোম্পানীর এজেন্ট আছে সেই সব বন্দরে পৌঁছবার একদিন আগে ঠিক দেখা দেবে সে। জেনে নেবে কার কত টাকা অগ্রিম নেবার দরকার। ব্যস্, মিটে গেল আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। তারপর মাস্টার, সে আর স্পার্কি অর্থাৎ অয়ারলেস্ অপারেটার। পার্সারের হিসাব এবং মাস্টারের হুকুম মত এজেন্টকে জানিয়ে দেবে স্পার্কি কত টাকা অগ্রিম চাই। কোম্পানীর হ'য়ে সে টাকা দিয়ে দেবে এজেন্ট।

পার্সারকে দেখেই বলে ওঠে দিনেশ—আমাকে বাপু কিছু টাকা বেশি দিও এবারে। আমাদের ভজহরিদাকে রাস্তাঘাটগুলো একটু ভাল করে চিনিয়ে নিয়ে আসব। কি বলেন দাদা? ওঃ, যা ভাল ভাল আছে, বুঝলেন দাদা? বলে একচোখ টিপে ইসারা করে—কোথায় লাগে বৌদি।

এতক্ষণ ধরে কোনরকমে এই দুর্মুখ ছেলেটাকে সহ্য করেছেন ফোর্থ। এবারে আর পারেন না। যাচ্ছি মাস্টারের কাছে, বলে এগুতে যান। বাধা দেয় পার্সার। বলে, ওল্ডম্যানের দেখা পাবেন না এখন। এক ভীষণ মামলা নিয়ে পড়েছেন তিনি। তার চাইতে আপনি কত অগ্রিম নেবেন, তাই বলুন।

কেন? মামলা কিসের? জিজ্ঞাসা করেন ফোর্থ।

আর কিসের! কড়া এক বোতল টেনে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছে খেয়ালীরাম।

অজ্ঞান? বলেই ধপ্ ক'রে বসে পড়েন ফোর্থ। ব্যাপারটা এমন নাটকীয় ভাবেই হয় যে আমরা সকলেই তাঁর দিকে না তাকিয়ে পারি না। দেখি, মুখখানা ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছে। সামান্য রক্তের আভাসটুকুরও অভাব সেখানে। হতবাক্ আমরা সকলেই। খেয়ালীরামের অজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে ফোর্থের এভাবে বসে পড়বার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে, তাই হয় আমাদের চিন্তার বিষয়।

রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন কিন্তু ঠিকই হ'য়ে গেল। খবরটা নিয়ে এল ঐ দিনেশই। শুধু আসা নয়, প্রজাপতির মত উড়তে উড়তেও লাফিয়ে লাফিয়ে এল। চেয়ারখানি একটান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে বসতে বসতে বলে উঠল—কপালে লিখিতং ধাতা—শেষ হয়না তার ভাগ্যবাদের কথা। সেলুনে উপস্থিত মানুষ কয়টিকে এক ঝলক দেখে নিয়েই জিজ্ঞাসা করে—ভজহরিদা আসে নি? প্রয়োজন ছিল না জিজ্ঞাসার। ওর নিজের কথা থেকেই বোঝা যায়—আর এসেছে! যে গাড্ডায় পড়েছেন চাঁদ! 'অধর্ম কুকর্ম ছাড়রে'—হুঁঃ। আরে বাবা, স্বয়ং কেষ্টঠাকুরকেও অধর্ম কুকর্ম করতে হ'য়েছিল। এ বাবা মাটির গুণ! এখন খণ্ডায় কোন্ বেটাচ্ছেলে?

দেখ্ বাপু, ধম্‌কে ওঠেন বরদা বালা, দম বন্ধ করে থাকা যায় না বেশিক্ষণ। যা বলতে চাস্ ঝট্‌পট্ বলে ফেল্।

আর বলে ফেল্, উত্তর দেয় দিনেশ, ঐ যে দূরে বাঙ্কারীং পোর্ট্‌টি দেখা যায়, ঐখানে নেমেই বিচার হবে ভজহরির।

চম্‌কে উঠি আমরা সে কথা শুনে। ইণ্টারন্যাশনাল আইনে বিচার হবে ফোর্থ ইঞ্জিনীয়ারের! সেত' ভীষণ কথা! আর অপরাধও তাহ'লে গুরুতরই বলতে হবে। তাছাড়া আরও একটি কথা আছে। ভারতীয় জাহাজে জাহাজী জগতের ইণ্টারন্যাশনাল আইনে পড়বার মত ঘটনা বড় একটা ঘটে না। এ বিষয়ে বিশেষ একটা সুনাম আছে আমাদের। এমন সুনামের অঙ্গে ফোর্থই কিনা আঘাত ক'রে বসলেন শেষে! পিল্লাই হলে হয়ত' এতটা আশ্চর্য হতাম না। কিম্বা দিনেশ হলেও। ছেলেটার সংস্কার বা বাঁধনের বালাই নেই। বলে, এইত' বাবা চলেছি, যঃর হাজার হাজার ফুট নীচে মাটি। যদি ডুবি তো শিবের বাবাও পারবে না রক্ষা করতে। তবে অত বাঁধাবাঁধি কিসের? তার চাইতে 'হেসে নাও, দু'দিন বৈত' নয়' আইনটি মানাই ভাল। কি বলেন, বালাদা? জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে ভর করে বালার—দাদা, উপাধিটা বদলে ফেলুন। আপনাকে দেখলেই কেমন কর্ণ কর্ণ ভাব এসে যায় আমার। বলতে ইচ্ছে করে—'বালা! কার গলে দিলে তুমি কুসুমের মালা?'

থাম হে ছোকরা! রক্ত-চক্ষু হ'য়ে ওঠেন বালা। কিন্তু ওর বেশি আর এগুবার ক্ষমতা নেই। দিনেশ তাঁর অধীনস্থ নয়।

না পারি গম্ভীর হ'য়ে বসে থাকতে, না পারি হাসতে। হাজার হলেও সিনিয়ার থার্ড তো। তাড়াতাড়ি বলে উঠি—ঘটনাটা কি ঘটল তাই বল্ না বাপু।

আরে, ঘটনার পিছনে অনেক দুর্ঘটনা আছে। এখন আর হ'য়ে উঠবে না। এডেন, আমাদের বাঙ্কারীং পোর্ট এখন হাতের কাছে। তেলের রসদ নিতে হবে বুক ভরে। এরপর মোড় ঘুরলেই তো বোরখার রাজত্ব। ওরে বাবা, 'ওপথে যেও না খোকা, ফটিং-টিংএর ভয়'—বলতে বলতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় দিনেশ।

এই, বললি না ব্যাপারটা? পেছন থেকে তাড়া দিই আমি।

বড় ব্যস্তবাগিশ! ঘুরে আসে সে, রসের গল্পটি শোনাই বড় কাজ, না ভজহরিদাকে বাঁচানোটাই মুখ্য কর্তব্য? চল্, সকলে মিলে যাই মাস্টারের কাছে।

বাস্, থেমে যায়। শুধু থামা নয়, চিন্তার অতলে ডুব দেয় যেন। একটু পরেই আবার ভু-স্ ক'রে ভেসে ওঠে—ছাড়বে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রতিশোধ নেবার এমন একটা সুযোগ—

কি, বলছিস্ কি?

ওর কথার মুড়ো কি ল্যাজা কিছুই বুঝতে না পেরে চম্‌কে উঠি আমি। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে দু'তিনজন—ঠিকই বলেছে।

এরপর আর বেঠিক বলবার রাস্তা নেই। প্রবল ঔৎসুক্য মনের ভেতরে। এমন কি ঘটনা ঘটতে পারে যাতে মিঃ মিচেলের মত লোকও ইণ্টারন্যাশনাল আইনের কবলে ফোর্থকে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে? তাছাড়া দোষই বা সে কি করল? ভাবনা আসে মনে। কিন্তু দানা বাঁধবার সুযোগ পায় না। দিনেশের ঠেলা খেয়ে উঠে পড়তে হয় সকলকে। সারবন্দী হ'য়ে এগিয়ে চলতে থাকি ওপর তলার সিঁড়ির দিকে।

ক্যাপ্টেন কিছুতেই ছাড়বে না। আমরাও নাছোড়বান্দা। দাবী আমাদের—ধম্‌কানি দাও ফোর্থকে যাতে আর এরকম কাজ না করে, না হয় ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট কর কোম্পানীতে। বসে যাবে তু'এক বছরের জন্যে। তাই বলে ইণ্টারন্যাশনাল আইনে ফেলে তাকে দিয়ে যে ঘানি ঘুরোবে, তা বরদাস্ত করব না আমরা। যতই দূরের এডেন কাছে আসতে থাকে ততই চীৎকার বাড়তে থাকে আমাদের। ঘোরাল পরিস্থিতি। অন্ততঃ আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। মানা না মানার পাঞ্জা কষা চলেছে এক সার্বভৌম ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ অধঃস্তনের। ছাতের ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে কৌতূহলী লস্করের দল। অশান্ত তরঙ্গরাশির গর্জন সুর মিলিয়েছে আমাদের দাবীর সঙ্গে। হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে ওঠেন ক্যাপ্টেন—অফিসারস্! তোমরা ভুলে যাচ্ছ আর্টিক্‌ল্‌-এর কথা। আমি জাহাজের মাস্টার। আমি যা বল্‌ব তাই মানতে হবে সকলকে।

আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সাঁ করে দিনেশ গিয়ে দাঁড়ায় জাহ্নবী বাবুর পাশে।

স্যার! আপনি এ কথার উত্তর দিন। মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের সম্মান আপনার হাতে।

শুধু এটুকু বললেও কথা ছিল। সঙ্গে একটু গ্যাসও দিয়ে দেয় সে —আর এত' আমরা জানিই যে আপনার কথা ঠেলবার শক্তি কারও নেই এ জাহাজে।

গ্যাসে ভগবান কাহিল হয়, জাহ্নবীবাবু ত' ছেলেমানুষ। বুকটান করে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ান তিনি ক্যাপ্টেনের সামনে। কিন্তু অত্যন্ত সহজ দৃষ্টি। আর মুখে সেই হাসি হাসি ভাব। অন্তরের একটি কথাও বোঝা যায় না সে দৃষ্টি বা মুখের ভাব দেখে। বুকটান করে এগুনো দেখে যেটুকু আশান্বিত হয়েছিলাম, মিইয়ে যায় সেটা। নিরাশার ছায়া নেমে আসে সমস্ত দলটির মুখের ওপরে। একটু অসন্তুষ্টই হ'য়ে উঠি দিনেশের এই অবিবেচকের মত কাজে। চীফকে এর ভেতরে না টানাই উচিত ছিল তার। এমন সময় আমাদের সকলকে হক্‌চকিয়ে দিয়ে সেই হাসি হাসি মুখেই বলে

ওঠেন চীফ—মিঃ ক্যাপ্টেন! আপনি যেমন এই জাহাজের মাস্টার আমিও তেমনি ইঞ্জিন-রুমের মাস্টার। আমাদের দাবী না মানলে এখুনি বন্ধ হ'য়ে যাবে ইঞ্জিন।

মাস্টারকে যা বলবার বলা শেষ ক'রেই হাঁক দিয়ে ওঠেন তিনি—সিনিয়ার থার্ড! জাহাজ থামিয়ে দিন।

কথাটা শেষ করতেও হয় না তাঁকে, চীৎকার ক'রে ওঠেন ক্যাপ্টেন—না, না, জাহাজ ভেসে যাবে।

যাবেই ত'। এবং আপনি তাই চান। জবাব দেন চীফ।

না না, তা চাই না। বলেই থেমে যান মিঃ মিচেল। কপালে ফুটে উঠেছে চিন্তার রেখা। এতক্ষণে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনি কোন্ অভিমানে আঘাত লাগাতে এই অফিসারেরা আজ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ঘিরে ধরেছে তাঁকে। কিন্তু চোট খেয়েছে তাঁর অভিমান। মাস্টার হ'য়েও তাঁকে মেনে নিতে হবে অধীনস্থ সকলের কথা।

ঠিক আছে, চিন্তার শেষ করেন ক্যাপ্টেন, জাহাজ না ফেরা পর্যন্ত ফোর্থ কাজ করবে ফিফ্‌থ্ ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে এবং ফিফ্‌থ্ কাজ করবে ফোর্থ হ'য়ে। তারপর ভারতে পৌঁছে আমি কোম্পানীকে জানাব সব কথা। যাও, যার যার কাজে যাও।

মিটে গেল দ্বন্দ্ব। সবই হ'ল; হ'ল না শুধু এত ঝামেলার কারণটি জানা। সেই কথাই ভাবতে ভাবতে সিঁড়ির দিকে এগুই। আর মনে মনে তারিফ করি প্রায় আমারই বয়সী ছেলেটার। হাসি ঠাট্টার বহর দেখলে বোঝাই যায় না, এ কর্তব্যে কতখানি কঠোর। এই জাহাজের ভেতরে বোধহয় একমাত্র আমিই জেনেছিলাম তা।

সে আর এক দৃশ্য। এতগুলো মানুষে মিলে যেন ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে পার্সারে বেচারীকে। কি? না, চিঠি। বন্দরে পৌঁছুতেই এজেণ্ট এসেছে টাকা এবং চিঠি নিয়ে। হেড্ অফিসের মারফৎ যত চিঠি গিয়েছিল, আমাদের এডেনে পৌঁছুবার আগেই সেগুলি আকাশপথে এসে গিয়েছে।

এজেণ্টের কাছ থেকে সব বুঝে নিয়েছেন মাস্টার। তারপর চিঠির বাণ্ডিলটি পার্সারকে বিলি করবার জন্যে দিয়েছেন। কিন্তু বিলি করবে কি, তাকে শুদ্ধ খেয়ে ফেলবার জোগাড় ক'রেছে সকলে—চিঠি চাই, চিঠি। এই জাহাজবাসী মানুষ কয়টির প্রাণ যে এমনভাবে আটকে আছে সেই সুদূরের গ্রামে কি সহরে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্টকরই হ'য়ে উঠত আমার পক্ষে। সকলেই ক্ষিপ্ত। কে আগে হাতিয়ে নিতে পারে তার উদ্দিষ্ট চিঠিখানি। চলেছে প্রতিযোগিতা। আমি যেতে পারিনি, নামতে পারিনি ওদের দলে। বেধেছে শালীনতা বোধে। তবে নামব। ক্রমে ক্রমে।

একবার এদিকে, একবার ওদিকে, দু'দিকে সমান তালে চোখ রেখে চলেছি। এদিকে ঘরের টানের কথা, ওদিকে স্বতন্ত্র রাজ্য এডেন। তেলের ওপরে ভাসছে। তারই ওপরে যত ঘর বাড়ি। পরমায়ু-সূত্র বাঁধা রয়েছে তেলের সঙ্গে। দূরে দেখা যায় তার সংশোধনাগারের চিমনীগুলি। ওখান থেকে পাইপ-লাইন টানা হ'য়েছে বন্দরের কাছাকাছি ঘাঁটি পর্যন্ত। সেখান থেকে আবার ফ্লোটিং পাইপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। থরে থরে ভাসমান পিপের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে পাইপ, জাহাজের কাছ পর্যন্ত। তারপর হোস-পাইপের বন্দোবস্ত। বেশির ভাগ তেলই যাচ্ছে ট্যাঙ্কার জাহাজে। ঐ তৈল-বাহী জাহাজের নামটাই তখন আমার শোনা ছিল। পরে জেনেছিলাম কি দুঃসহ জীবন-যাত্রা এসব জাহাজের কর্মীদের।

চীৎকার করছে দিনেশ—এই অশোক, তোর চিঠি।

আমার চিঠি! লাফিয়ে গিয়ে খপ্ করে ধরে নিই। একখানা নয়, দু'খানা। বাবাকে আর চিনুকে বলে এসেছিলাম কি ভাবে চিঠি পাঠাতে হবে। দু' জায়গা থেকেই এসেছে। ঝট্ ক'রে খামের গায়ে লেখা ঠিকানার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়েই সরে গিয়ে দাঁড়াই একটু দূরে। চিনুর চিঠিখানা পকেটস্থ ক'রে বাবার লেখা চিঠিখানিই খুলে নিই। ঐ খুলে নেওয়া পর্যন্তই। পড়া আর হয় না। পিল্লাই-এর গলা পাড়া গরম ক'রে তুলেছে। যা মুখে আসছে তাই বলে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে মাদ্রাজ-বাসিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে। রক্ষা যে ভদ্রমহিলার কানে গিয়ে

পৌঁছুচ্ছে না এই বিশেষণগুলির একটিও। তাহ'লে যে কি করতেন তিনি, ভাবতেও ভয় হয়। একপাল মানুষকে ঠেলে সরিয়ে চীৎকার ক'রতে ক'রতে বেরিয়ে আসে পিল্লাই। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে অনর্গল ইংরিজি বিশেষণ উদ্গার ক'রতে ক'রতে দুপ্ দাপ্ পা ফেলে গিয়ে ঢোকে সেলুনে।

দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মনটাও আটকে পড়েছিল পিল্লাইএর দিকে। খেয়াল হয়নি কখন দিনেশ এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। রেলিঙে ভর দিয়ে অসীম জলধির দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে মুখখানা। থেমে গিয়েছে তার চাঞ্চল্য। অশান্ত সমুদ্র হঠাৎ ধীর স্থির হ'য়ে গেলে যেমনটা হয়।

হ্যাঁরে, তোর চিঠি আসেনি? জিজ্ঞাসা করি আমি।

মাথাটা নীচু ক'রে বার দু'য়েক এদিক ওদিক করে সে। সেই সঙ্গে এক ফোঁটা জল তার চোখের পাতা থেকে খসে রেলিঙের ওধারে গিয়ে পড়ে। দেখে বোবা বনে যাই। দিনেশের চোখে জল! খাও দাও স্ফূর্তি কর, এই যার জীবনের নীতি, তার চোখে আগুন মানালেও মানাতে পারে, জল মানায় না।

জানি বলা বৃথা। তবুও বলি—আর একবার দেখে আয়। ভুলও ত' হ'তে পারে।

তিনখানা ত' চিঠি, তার আবার ভুল কিসের? ঝাঁঝিয়ে ওঠে সে—ও সব কিছু নয়। আসল কথা হচ্ছে, কেন দেবে চিঠি? কে আমি? কি আমার সম্পর্ক তাদের সঙ্গে? সৎ-ছেলে আর সৎ-ভাই ছাড়া ত' আর কিছুই নই।

এসব ইতিহাস আমার জানা ছিল না। তাহ'লেও ওর মনের আঘাতটিকে ভুলিয়ে দেবার জন্যে বলি—চল্, আমার ঘরে চল্।

যায়না। সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। পাশে আমি। সান্ত্বনার কোন ভাষা নেই আমার। যা শুনলাম এইমাত্র তার বেশি আর কিছুই জানিনা ওর সম্বন্ধে।

কেটে যায় কয়টি মুহূর্ত। রেলিঙ ধরা হাত দু'খানির ওপরে মুখ রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দেড়তলা সমান নীচে জলের দিকে চেয়ে। আমি

দাঁড়িয়ে উইঞ্চের পাশের থামে ভর দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে নিজেই বলতে থাকে সে—

জানিস্ অশোক, নিমৃকিকে আমি কি ভীষণ ভালবাসি। আমার ছোট বোন। এইবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে। ছোটকালে প্রত্যেক দিন রাত্রে ওর মাথার কাছে একটা ক'রে নিমৃকি রাখতে হ'ত। ভোররাত্রে উঠে সেটি খেয়ে আবার ঘুমোত। সেই থেকে ঐ নাম ওর।

বলতে বলতেই আরম্ভ হ'য়ে যায় অভিমানের ফোঁস ফোঁসানি—কিন্তু চিঠি কেন দেবেনা? আমি এই যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি, সে কি শুধু দেশ বিদেশ দেখবার সখের জন্যে? দেখা যায় কিছু? নেমে ছিলি ত' বোম্বেতে। দেখেছিস্ কিছু? বলতে পারিস্ কোথায় শিবাজী গুহা, মেরিন ড্রাইভ্, ফিরোজ শা মেহ্তা গার্ডেন? তবে?

প্রশ্নের পালা শেষ করেই আপন মনে বিড় বিড় করতে থাকে সে—সকলে ভাবে কত আরামেই না আছি আমরা। একবার এসে দেখুক। দু'মাস কাটালেই সখ বেরিয়ে যাবে।

বলেই আমার দিকে মুখ ক'রে ঘুরে দাঁড়ায়। সোজা আমার মুখের ওপরে দৃষ্টি ফেলে বলে—তুই বিশ্বাস করবি না অশোক, আমি দেখেছি এই এক সমুদ্র জলের শীতলতা আমাদের মনে কোন প্রশান্তিই আনতে পারে না, যা পারে ছোট্ট একখানি চিঠি।

থেমে যায় সে। কানের কাছে হাহাকার ক'রে চলেছে সাগরের বাতাস। কোন অনাদিকাল থেকে তার বুকে ফেরা কোটি কোটি নাবিকের দীর্ঘশ্বাসে বুঝি তার বুকখানিও বোঝাই হ'য়ে গিয়েছে।

চল্, ঘুরে আসি, বলে তার হাত ধরে টানতে গিয়েই চোখে পড়ে এক অদ্ভুৎ দৃশ্য। সার বেঁধে কতকগুলি নৌকো ছুটে আসছে আমাদের জাহাজের দিকে। মাঝিদের সকলের একই ধরণের পোষাক। গায়ে একটা ক'রে আলখোল্লা। মাথা থেকে ঘাড়ের ওপরে ঝুলে পড়েছে এক টুকরো সাদা কাপড়। তার ওপরে চাপানো বাটির আকারের একটি ক'রে কালো ফেজ। সাদা কাপড়ের টুকরোটিকে মাথার সঙ্গে এঁটে রাখবার জন্যে বোধহয়।

ওরা কারা? জিজ্ঞাসা করি দিনেশকে।

আরবী। উত্তর দেয় সে, নৌকোয় পসরা সাজিয়ে নিয়ে আসছে আমাদের জন্যে।

দেখতে দেখতে নৌকোগুলি এসে ঘিরে ধরে আমাদের বিহঙ্গমকে। ওধারের বারান্দা থেকে হিন্দী আর ইংরিজির খিচুড়ি চীৎকার শোনা যাচ্ছে। জিনিসের দরদাম করা হচ্ছে বোধহয়। আমাদের এখানেও ভিড়েছে তু'তিনটি। নানারকম পন্যে বোঝাই। ঘড়ি, ক্যামেরা, ফাউণ্টেন পেন, খেলনা আরও কত কিছু।

বহুৎ চীপ সার। বঢ়িয়া থিংস্।

ঊর্দ্ধমুখে কথাগুলি ছোঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা ক'রে পাথরও ছুঁড়ে দেয় তারা, আমাদের লক্ষ্য করে। ছিট্‌কে সরে যাই আমি। এ কি ধরণের ব্যাপারীরে বাবা! এদিকে বলে জিনিস কিনতে, ওদিকে পাথর ছুঁড়ে মারে! সরেনি দিনেশ। খপ্ ক'রে লুফে নিয়েছে একটি পাথর। আর তুটি এসে পড়েছে ডেকের ওপরে। ও তুটোর দিকে তাকাতে নজরে পড়ে ওদের গায়ে শক্ত সরু দড়ি বাঁধা। একটি তুলে নিয়ে রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। দিনেশ টেনে তুলছে একটি দড়ি। দড়ির শেষে লট্‌কান রয়েছে একটি ছোট্ট চুপড়ি। তার ভেতরে একটি ক্যামেরা। ছোট্ট ক্যামেরাটি, কিন্তু বেশ শক্তিশালী লেন্স। ক্যামেরাটি ভাল করে দেখতে দেখতে বলে দিনেশ—নিমৃকিটার ভীষণ ফটো তোলার সখ, বুঝিচিস্। কিন্তু আমাদের ওখানে যা দাম—কথাটা বোঝবার মত অবস্থাতেই অসম্পূর্ণ রেখে ঝুঁকে পড়ে সে। চেঁচিয়ে ওঠে—হাউ মাচ্? জলের ওপর থেকে চীৎকার শোনা যায়—থার্টি। তারপর চলে টানা-পোড়েনের পালা। সে এক দর্শনযোগ্য দৃশ্য বটে। প্রথমবার বলেই অতটা ছাপ পড়েছে মনে। পরে আরও কতবার এসে থেমেছি এডেনে। ভ্রূক্ষেপও করিনি। খোঁজ মিলেছে আরও সস্তার বাজারের।

জিনিস কেনা শেষ হ'ল। দিনেশের ক্যামেরা, আমার তিনটি ফাউণ্টেন পেন। ও-ই কিনিয়ে দিল। দাম করবার কায়দা কি! ত্রিশ বলতেই দশ। আর উঠতে চায়না, ওপক্ষকেই নামতে হয়। গরজ বড় বালাই। শেষে যেখানে এসে রফা হয় তাও হাস্যকরই বটে।

তেলের প্রয়োজন ব্যতীত এডেনে থামবার কোনও কারণ নেই। তাই জাহাজ ছাড়বার জন্যে তৈরী হয়েই থাকে এখানে। আমরাও ছাড়লাম কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই। এর পরের যে যাত্রা তাকে সুকুমার রায়কে দিয়ে বোঝান যায়—খাচ্ছে, কিন্তু গিলছে না। সুদান, সুয়েজ, পোর্ট সৈয়দ। বাঁধে কিন্তু থামে না। ট্যাক্সের ব্যাপার। মাল অনুযায়ী ট্যাক্স। হিসাব ওরাই জানে। পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিলেই মিলল গেট-পাস। উঠে এল পাইলট ১০৩ মাইল লম্বা আর প্রায় ১৯৭ ফুট চওড়া খালটি পার করে দিতে। পোর্ট সৈয়দে নেমে যায় পাইলট। তারপর সেই যে ঘোরে প্রপেলার, থামে গিয়ে একবার মালটায়। ঘণ্টা কয়েকের জন্যে। নামিয়ে দেয় শ'খানেক টন চা। এরপর আর থামা নেই, যতক্ষণ না আসছে ত্রিয়েস্তের বন্দর।

এডেনকে তবুও সহ্য করা যায়। মন খারাপ হ'য়ে যায় সুদানের কাছাকাছি এলেই। একদম ন্যাড়াবোঁচা। এতটা ধূসর আর ঊষর ভাব নিতে চায় না চোখ। সবুজের সঙ্গে যেন এদের আড়াআড়ি। যেমন ধূ ধূ করা প্রান্তর তেমনি শষ্পবিহীন পাহাড়। মাঝে মাঝে যা তু'একটা কাঁটাগাছ চোখে পড়ে তাও নাকি অনেক সাধ্যসাধনায়, নর্দমার জল খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে গৃহস্থ। কটকটিয়ে উঠেছিল চোখতুটো। সবুজের রাজ্যের মানুষ আমি, প্রকৃতির এতখানি নির্মমতা সহ্য করতে পারিনি। সোজা গিয়ে উঠি ওপর-তলায় দিনেশের ঘরে। পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতরে একটা পা দিতেই আটকে যায় পা-খানা। 'সেট'র ওপরে একটা পা, কোমর অবধি, আর এক পা এবং দেহটা গড়াচ্ছে মেজেতে। মদ খেয়েচে নাকি? তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা হাত ধরতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে।

দেখছিলাম কি রকম ক'রে পিল্লাই পড়েছিল কাল।

পিল্লাইয়ের ঘটনাটা স্মরণ করে হো হো ক'রে হেসে উঠি তু'জনেই। এক মজার ব্যাপারই ঘটিয়েছিল সে এডেনে। চিঠি না পেয়ে বৌকে উদ্দেশ করে মুখ খিস্তি ক'রতে ক'রতে গিয়ে ঢোকে সেলুনে। হাঁক ডাক ক'রে বন্-ষ্টোর থেকে আনিয়ে নেয় তার হিস্যার সবটুকু মদ। সেলুনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ দিনরাতে চারবার। তাছাড়া অগ্রিম টাকা নেওয়া,

জিনিসপত্র কেনা, আবার কারও কারও ডিউটি, বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম মানুষটার কথা। জানিয়ে দিল বাটলার। কি ক'রে তার নজড়ে পড়ে গিয়েছিল পিল্লাইএর কীর্তি। ছুটে আসে আমাদের কাছে। গিয়ে দেখি চেয়ার এবং মেঝে ভাগাভাগি ক'রে স্থান দিয়েছে ওর দেহটিকে। মনের আঘাতের এমন অদ্ভুত প্রকাশ আর কখনও দেখিনি আমি।

আমরা তখন ব্যস্ত ঐ লাসকে কি করে ওপরে, ওর কেবিনে নিয়ে যাওয়া যায়। চীৎকার ক'রে উঠল দিনেশ—ক্যাসাবিয়াঙ্কা, ক্যাসাবিয়াঙ্কা। হতভাগার যেমন ডাকবার কায়দা, তেমনি নামকরণ। আমাদের প্রধান রসুইকরের নাম আমীর বক্স। আমীর হ'লে হবে কি, ভাত জুটত না ছোটকালে। ওর বাপ তাই বলেছিল—জাহাজের রসুইকর হ'লে প্রচুর খেতে পাবি। তুই তাই হ'স। বাপের কথা রেখেছে আমীর। আর সে কথা কানে ঢুকতেই নামকরণ ক'রে ফেলেছে দিনেশ।

ডাক শুনে আমীর এসে দাঁড়াতেই সে বলে ওঠে—দেখ বাবা ক্যাসাবিয়াঙ্কা, পিল্লাইএর খাবার সব তুলে রাখবে। আমি রাত দশটায় সাঁটাব।

একটা ফালতু অফিসার মার্কা খানা বেহাত হ'য়ে যায় দেখে কেঁউ কেঁউ ক'রে ওঠে আমীর। আর ধমক আসে দিনেশের তরফ থেকে—ওর নাইট ডিউটিটা যখন আমাকে করতে হবে তখন খানাটা কেন বাদ যাবে? তবে হ্যাঁ, তুমি যদি ওর ডিউটিটা সেরে দাও তাহ'লে আর খানা চাই না আমি।

এর পরে আর কথা বলেনি আমীর।

তা এখন করছিস্ কি? জিজ্ঞাসা করি আমি।

ঐত', পিল্লাইএর পড়ে থাকাটা নকল করছিলাম। উত্তর দেয় দিনেশ।

হতভাগা! সে কথা জিজ্ঞাসা করছি না। এখন ডিউটি নেইত' তোর?

আহ্লাদ আর কি! কাল নাইট ডিউটি করেছি না? এখন পিল্লাই আমার হ'য়ে দিচ্ছে।

সুযোগের সন্ধান পেতেই চেপে ধরি—তাহ'লে ওল্ডম্যান কেন ইঞ্জিনীয়ার মজুমদারকে ইণ্টারন্যাশনাল আইনের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিলেন, বল।

হো হো ক'রে হেসে ওঠে সে আমার কথা শুনে। সে হাসি আর সহজে থামতে চায় না। কিসে যে এত হাসি পেল তার, বুঝে পাই না

আমি। হাঁ করে তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে—তোর কৌতূহলটা কার মত জানিস? ঠিক আমার মায়ের মত। একবার এক কাণ্ড হয়েছিল, বুঝলি—বলেই আরম্ভ ক'রেছিল সেই কাণ্ডের কথা বলতে। আর আমি কুইনিন গেলা মুখ ক'রে বসে তাই শুনতে থাকি।

বুঝিছিস্, প্রথম পাকেই ত' কাটিয়ে গেলাম প্রায় দেড় বছর। উঃ, সে যা অবস্থা! হাত মুখ নেড়ে বলে চলে দিনেশ—অনভ্যাসে কপালে ফোটা, কপাল চিড়বিড় করে। পৃথিবীতে এত জলও আছেরে ভাই। খাল কেটে কিছু সাহারায় নিয়ে গিয়ে ফেললেই পারে। যাইহোক, একপাক ঘুরে গিয়ে বেশ কয়েকদিনের ত' ছুটি পাওয়া গেল। নাম-মাত্র ডিউটি। গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ কি এক বদখেয়াল চাপল, ছুটে গেলাম মায়ের কাছে—জান মা, আজ একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ঐ যে মৃগাঙ্কবাবু, খুব বড়লোক, তাঁরই মেয়ে। আর কি দেখতে! লেখাপড়াতেও খুব ভাল। আমাকে যে কি যত্ন করল মা—বুঝলি, আর কি ধৈর্য সয় মার। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন—হ্যাঁরে, মৃগাঙ্কবাবুর মত আছে ত'? তারপরই বায়না—তুই একদিন আমাকে নিয়ে চল্ বাবা, মেয়েটিকে দেখে আসি। সে ভাই পড়ে গেলাম এক ফ্যাঁকড়ায়।

কেন, ফ্যাঁকড়া কেন? মাকে নিয়ে গেলেই পারতিস্। বলি আমি।

তুইও যেমন, ভেঙচে ওঠে দিনেশ, কে মৃগাঙ্কবাবু আর কেই বা তাঁর মেয়ে? সবইতো বানানো।

তবে?

সেইতো হ'ল মুস্কিল। আবার ইদিকে পেছনে লেগেছে নিমৃকি। বৌদি কলেজে পড়ে কিনা, তাকে পড়াতে পারবে কিনা, তারপর গান, সেলাই ইত্যাদি ক'রে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই তার। আমিও চোখ বন্ধ করে মিথ্যার জাল বুনে যেতে থাকি। একটু নড়েচড়ে ঠিক হ'য়ে বসে দিনেশ—আরে ভাই, তখন কি জানতাম, ঐ ঝুড়িভরা মিথ্যে নিমৃকি গিয়ে মায়ের কাছে ঢালছে! শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল, বুঝলি—বলেই থেমে গেল সে। তাকিয়ে দেখি এরই ভেতরে মুখখানা ভার হ'য়ে উঠেছে তার।

আলেকজান্দ্রিয়াকে বাঁয়ে রেখে ধীরে ধীরে উত্তরে মুখ ঘোরাচ্ছে জাহাজ। ভূমধ্যসাগরকে লম্বালম্বি ভাবে কেটে বেরিয়ে গিয়ে থামবে একবার মাল্‌টায়। তারপরই ত্রিয়েস্ত্‌।

গম্ভীরভাবে বলতে থাকে দিনেশ—জানিস্‌ অশোক, মা একেবারে একটানে মামাকে এনে ফেলল এর ভেতরে। আরে, মামা মানে সৎ-মামা নয়, একেবারে নিজের মামা। বলে বুকে আঙ্গুল ঠুকে বুঝিয়ে বলে, আমার নিজের যে মা ছিলেন, তার ভাই। একখানা চীজ। বোন-টোন পাতিয়ে মাকে এমন ভাবে হাত ক'রেছে, এখন মা ঐ দাদাটির কথা ছাড়া আর চলে না। যাইহ'ক, বাজে ভাঁওতা বলে অনেক ক'রে বলা কওয়ার পর সে যাত্রায় রেহাই পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু মামা এসেই পুঁতে দিয়ে গিয়েছিলেন বিষবৃক্ষের চারাটি। আমি জানতাম না এত সব কথা। নিম্‌কি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল আমাকে—দাদা, তুমি নাকি বিয়ে করেই তাড়িয়ে দেবে আমাদের? অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওর কথা শুনে। শিশু-মনে এ বিষ ঢোকালে কে? জিজ্ঞাসা করে জানলাম মামাই নাকি বলে গিয়েছেন মাকে। সেই থেকে মারও মনে একটু একটু ভয়। বলেই ডুক্‌রে ওঠে সে—কিন্তু বল্‌ কি ক'রে বোঝাব মাকে যে এ সন্দেহ একেবারে অমূলক?

আমি নিশ্চুপ বসে থাকি। শুনতে চেয়েছিলাম ওল্ডম্যানের কথা। শুনলাম আর এক ঘটনা। পুনরাচমন্‌ ক'রে আবার ওল্ডম্যানে ফিরে যেতে ইচ্ছা করেনা। নাড়া খেয়ে গিয়েছে মনের তার।

চুপি চুপি বলেছিলাম কথাটা দিনেশের কাছে। কিন্তু ও যে এমনভাবে ঢাকে কাঠি দেবে তা কি আর তখন জানতাম। ফলে আমাকে এখন ঐ গরম খোলের ভেতরে রক্ত-চক্ষু বালার সামনে 'জাড় পা, বুক টান' অর্থাৎ গোরা ভাষায় যাকে বলে '—টেনশান্‌', তাই হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একটু ভুলচুক্‌ হয়েছে কি ধম্‌কানির চোটে ভূত ভাগিয়ে দেন তিনি। চুপ্‌চাপ্‌ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ভূত-ভাগানী মন্ত্র হজম করি আর মনে মনে সপিণ্ডিকরণের ব্যবস্থা করি দিনেশটার। হতভাগা কি গ্যাঁড়াতেই ফেল্‌ল আমাকে!

ঘটনাটা আমাকে নিয়ে নয়, কোলট্রিমার হু'জনকে নিয়ে। বয়লারের ঠোঁট ফাঁক ক'রে ক'ঘণ্টা ধরে কয়লা ঠেলা, এ কাঁহাতক পারে মানুষে ? আর কষ্টটাকে ভুলে থাকবার অন্য কোনও উপায় নেই যেখানে সেখানে কথাবার্তা বলেই অন্যমনস্ক থাকবার চেষ্টা করতে হয়। তা করুক, আপত্তি নেই। কিন্তু মুখের কথার সঙ্গে হাতের কাজও চলুক। সে খেয়াল নেই ওদের। পা মেলে দিয়ে বসে গিয়েছে যার যার স্ত্রীর গুণগান করতে। কার বৌ-এর স্বাস্থ্য কিরকম, দিনে কতগুলো করে ঘুঁটো দেয়, এ পর্যন্ত কয়টি ছেলেমেয়ে উপহার দিয়েছে—ফিরিস্তির আর শেষ নেই। তার ভেতরে আবার বেশি সরেস সয়ারাম কানু। বিহঙ্গম তার নিজ বন্দর ছাড়বার আগে শুনেছিলাম ঐ সয়ারামই রোজ তার বৌকে ধরে পিটোয়। আবার বৌটিও নাকি যেদিনই মরদের পিটুনি বাদ যায় সেইদিনই তাকে খামচে কামড়ে অস্থির ক'রে তোলে। কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবার এক মনস্তত্ত্ববিদ বন্ধুকে। তিনিও কেমন যেন এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে। পরে বলেছিলেন—দুটোকেই রাঁচী পাঠিয়ে দাও। মনে লাগেনি কথাটা। এড়িয়ে গেলেন বলেই বোধ হ'য়েছিল। শেষে জাহাজের 'দাবাই'কে জিজ্ঞাসা করতে উত্তর পেয়েছিলাম—ও এক ধরণের প্রেম নিবেদন। শুনে মনে মনে হেসে আর বাঁচিনা। আমি আর চিনুও ঐরকম মারপিট করব নাকি ?

এদিকে গল্পের ভাঁড়ার যত খালি হচ্ছে ওদিকে বয়লারের আগুনও যে ততই নিবু নিবু হ'য়ে চলেছে, সে খেয়াল নেই কারও। আর কপালের গেরো এমন, ঠিক সময় মতই এসে উপস্থিত বালা। 'ওয়াটার লেভেল' দেখে ত' তাঁর চক্ষুস্থির ! ইয়ার্কি কথা নয়। জাহাজের পানীয় জলে পড়বে টান। হাজার হাজার মাইল যাত্রা পথের পানীয় জল যদি বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হয় তাহ'লে আর বাণিজ্য করতে হয় না। খোলের বুক জলেই ভরতে হয়। তাই সমুদ্রের জলকেই প্রথমে বাষ্প, তারপর জল, তাতে আবার কিছু নুন এবং অন্যান্য পদার্থ মিশিয়ে পানীয় জল তৈরী ক'রে নিতে হয়। আর সেইখানে বসে কিনা বৌ-এর গল্প ! মা বলে—এমনিতে মা মনসা, তার ওপরে ধুপের ধোঁয়া। বালা আর বালা নয়,

যমরাজের চ্যালা হ'য়ে গরম গালা ঢালতে থাকেন দু'জনের কানের ভেতরে। মাঝে মাঝে একহাতা ক'রে টিণ্ডেলের কানে। আর অবশিষ্ট দু'চার ফোটা যা থাকে হাতার ভেতরে, তা আমার।

পদমর্যাদা অনুযায়ী কিল হজম ক'রতে হয়। বড়সাহেবের কিল বেমালুম হজম ক'রে ফেলে ছোটসাহেব। কাকপক্ষীতেও জানতে পারেনা। কিন্তু ছোটসাহেব কিল তুলতেই কুঁই কুঁই ক'রে ওঠে বড়বাবু। আর বড়বাবু কিছু বলতে গেলেই হৈচৈ ক'রে উঠবে কেরাণীর দল। এখানেও সে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয় না। নিঃসাড়ে চুরি করে বসি ছিট্‌কে আসা কিলগুলি। টিণ্ডেলও থেমে যায় দু'একটা কথা বলেই। কিন্তু সয়ারামরা আর থামতে চায় না। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লঙ্কা দহন পালা গেয়ে বসে। তারপরই আরম্ভ হয় কয়লা ঠেলা।

সুখানীরা যেমন দু'জন ক'রে একসঙ্গে ডিউটি দেয়, একঘণ্টা ক'রে পাল্টা পাল্টি, কয়লা ঠেলবার বেলাতেও তাই। সয়ারামরাও তাই-ই করে। কিন্তু তাতেই চোখে অন্ধকার দেখিয়ে দেয় আমাকে। এ্যায়সা কয়লা খাওয়াতে আরম্ভ করল বয়লারকে যে মুহূর্তে মুহূর্তে বাষ্প ছেড়ে দিতে হচ্ছে টিণ্ডেলকে। আর সাক্‌সান আমার হাতে। সমানে বয়লারের গলায় জল ঢেলে চলেছি। এদিকে মুস্কিলে পড়ে গিয়েছেন বালা। আমি আট্‌কা। তিনি একবার ক'রে কণ্ট্রোল প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান আর একবার ক'রে ছোটেন কার মেজাজ বিগড়োল তাই দেখতে। ইঞ্জিনঘরের নাড়িভুঁড়ির ত' অন্ত নেই। শেষে রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হ'য়ে হাতের কাছের টুলটাই তুলে নিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠেন—এই উল্লুক, কয়লা ঠেলা কমাও। বাস্, হুকুম হ'তেই কমে গেল কয়লা খাওয়ান। আর আধঘণ্টা যেতে না যেতেই দেখা গেল চুল্লী আবার নিবু নিবু। ভয়ে ত' আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। এবারে যে কি কাণ্ড ক'রে বসবেন বালা—ঐ টুলটাই না সয়ারামের মাথায় ভেঙ্গে বসেন। একবার ক'রে চাপা স্বরে ধমকাচ্ছি ওদের—ঠিকভাবে কাজ করনা বাপু। আর একবার তাকাচ্ছি বালার মুখের দিকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। মাথার ভেতরকার চুল্লিটা জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। বুঝতে পারছি।

বুঝতে পারছিনা শুধু তাপমাত্রাটা। হঠাৎ—এ আবার কি ব্যাপার! বালার মুখে হাসির রেখা! এঁ্যা! কাজকর্ম ভুলে ঠায় তাকিয়ে আছি তাঁর মুখের দিকে। ক্রমে বিড় বিড় ক'রতে থাকে সেই হাসিমুখ। তারপর সেই কাঁপা ঠোঁটে ভাষা ফুটে ওঠে। না, না, শুধু ভাষা নয়, গান। গানের কলি ফুটে উঠল বালার গলায়—এবার আমি পাগোল হব। পাগলই বটে। বালা নয়, আমি হব। হয় এখুনি ছুটে যেতে হবে ওপরে, নয়ত',পাগল হয়ে কয়লার বদলে আমিই ঢুকে পড়ব বয়লারের খোলের ভেতরে। কিন্তু শেষ হয়নি বালার গান। আমার মাথাটিকে পুরোপুরি বিগড়োতে হবেত'। প্রথম লাইনের পর দ্বিতীয় লাইন ধরেন—পাগোল হ'য়ে মুণ্ডু তোদের কাঁচা কাঁচা চিবিয়ে খাব।

এরপর সেখানে থাকা একেবারেই অসম্ভব। ছুটে গিয়ে উঠতে থাকি ওপরে। ক'ধাপ উঠতেই দেখি আমার মুখের কাছে কার পা। পা বেয়ে বেয়ে চোখ দুটো ওপরে উঠতেই থতমত খেয়ে যাই—ময়লা-সাফ। ইঞ্জিন-ঘর রাউণ্ড দিতে চলেছেন।

কি হ'ল? উপরে উঠছ কেন? জিজ্ঞাসা করেন ময়লা-সাফ অর্থাৎ সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ার। রাউণ্ডের অন্ত নেই তাঁর। তাই ওভার-অল আর তেলকালি, দুটোর একটাও গা-ছাড়া হয় না তাঁর। নাবিকদের কাছে তাই তিনি ময়লা-সাফ।

জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—না সার।

না সার কি? উঠছ ত' ওপরে।

হঁ্যা সার। আপনার কাছে—

খারাপ হ'য়েছে কিছু? চলত' দেখি। তড়িঘড়ি নামতে থাকেন তিনি।

আমিও নামতে নামতে বলি—সিনিয়র থার্ডের মাথাটা—

কি? জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে আটকে যায় তাঁর পা। কড়া দুটো চোখ বিঁধিয়ে রেখেছেন আমার ওপরে।

আজ্ঞে, বালা সার কি রকম যেন করছেন। কোনরকমে কথা কয়টি গলা থেকে খসাই।

দাবাইকে ডাক দাও। বলেই হন্ হন্ ক'রে ইঞ্জিনঘরের ভেতরে গিয়ে ঢোকেন তিনি।

দোষটা ষোল আনার ওপর আঠারো আনা এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। অন্ততঃ বালার ধারণা তাই। কেননা তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছুটে ওপরে গিয়েছিলাম। তারপরই এসে পড়েন সেকেণ্ড এবং পরে পরেই দাবাই। কার্য কারণ সব যখন মিলে যাচ্ছে তখন দোষী না হ'য়ে যাই কোথায়? কড়া ওষুধের সঙ্গে সিরাপ মিশিয়ে ময়লা-সাফ ত' মিটিয়ে গেলেন সব। তারপরই বালা পড়লেন আমাকে নিয়ে।

দেখ ছোকরা, নতুন এসেছ এই চাকরীতে। এখনও জানতে শুনতে অনেক বাকী। এটা ঠিক যেন ফোর্থ তোমার যত গুণগানই গাক না কেন, আমি ভাল না বললে সিকস্থ্ থেকে ফিফ্থ্ হ'তে হবে না।

ভাবলাম বুঝি শেষ হ'ল। না, শেষ নয়, সুরু। এক ধমকানি মার্কা প্রশ্ন এল—কেন ডেকেছিলে দাবাইকে?

আজ্ঞে ময়লা-সাফ বল্লেন।

বল্লেন বলেই ডাকতে হবে? এখানে কারও অসুখ করেছে?

নাত'। তবে ঐ যে গান গাইলেন—

বেশ করেছি, বলেই আরও জোরে কি একটা কথা বলতে যান তিনি। এমন সময় ফোন আসে ওপর থেকে। ঐ যন্ত্রটিই যন্ত্রণার লাঘব করল আমার। ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখে এসেছি ত্রিয়েস্ত্ দেখব। জাহাজ থেকে এই প্রথম অবতরণ হবে আমার বিদেশের মাটিতে। আলাপ হবে সেখানকার মানুষের সঙ্গে। জানব তাদের রীতিনীতি, পরিচয় পাব তাদের চিন্তাধারার। সেরকম সুযোগ যদি মেলে তাহ'লে জিজ্ঞাসা করাও যেতে পারে' কেন শুধুশুধু যুদ্ধে মেতেছিল তারা। কেউ ত' তাদের গায়ে হাত দেয়নি। তবে মানুষের প্রতি এ জীঘাংসা তারা কেন দেখাল?

মানুষে কত কিছু তার কল্পনার রাজ্যে গড়ে তোলে। ঐ গড়ে

তোলাটাই তার জীবন-যন্ত্রের রস। যে কয়টি পা এগিয়ে যায় তার পিছনে কল্পনার অবদান কিছু কম নয়। আমাদের কল্পনার রাজ্য যদি বিদেশের মাটি পর্যন্ত গিয়ে না পৌঁছুত তাহ'লে বলতে পারি না, কয়টি বৎসর ধরে ঐ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কয়জন ইঞ্জিনীয়ার এসে উঠত জাহাজে।

আমিও তেমনি মনের পর্দায় ত্রিয়েস্তের একটা মূর্ত্তি এঁকেছিলাম। আর পোঁচের ওপর পোঁচ রং চড়িয়ে চলেছিলাম তার গায়ে, যতই এগুচ্ছিলাম সেই বন্দরটির দিকে। কিন্তু তখন কি আর জানতাম যে আমার লাভের গুড়টুকু পিঁপড়েতেই খেয়ে যাবে।

ইটালীকে যদি পেঙ্গুইন বলা যায় তা'হলে ত্রিয়েস্ত্ হচ্ছে তার ঠোঁট। সেই ঠোঁটটির গা ঘেঁষে আরম্ভ হয়েছে যুগোশ্লাভিয়া রাজ্য। খুব বড় নয় ত্রিয়েস্ত্ সহরটি। এক ঘণ্টার ভেতরে অনেকখানিই তার দেখে এসেছি। যত না দেখেছি তার চাইতে বেশি অনুভব করেছি কতখানি একা আমরা। জন-সমুদ্রের বুকে সামান্য কাষ্ঠখণ্ডের মত ভাসতে ভাসতে চলেছি। প্রয়োজন নেই কারও তার দিকে ফিরে চাইবার। বিদেশী মানুষ দেখে উৎসুক হ'য়ে উঠবার বা গায়ে পড়ে আলাপ করবার মত যথেষ্ট সময়ও কারও হাতে নেই। যতই ঘুরছি ততই অন্তরের ক্ষুব্ধ ভাবটি বেড়ে যাচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে এ অভিজ্ঞতাটুকু লাভ না করলেই যেন ভাল হ'ত।

জানিস দিনেশ, আমি যেন আর সহ্য করতে পারছি না, বলে তার দিকে তাকাতে দেখি একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে একটা গলির মোড়ের পেয়াবাসের দিকে।

কিরে, কি দেখছিস্? জিজ্ঞাসা করি তাকে।

আমাদের খেয়ালীরাম আর কলিন্ ঢুকেছে ওখানে। বেটাদের আজ কাঁধে ক'রে না জাহাজে নিয়ে যেতে হয়। বলতে বলতেই চুক্ চুক্ ক'রে ওঠে সে।

আবার কি হ'ল? ওর মুহূর্তে মুহূর্তে ভাব বদলের সঙ্গে তাল রেখে চলা কষ্টকরই হ'য়ে ওঠে আমার পক্ষে।

তুই যাই বলিস্, ঐ জন্যেই এই সব দেশে এসে লটকে যায় অনেকে

আর ফিরে যায় না। বলেই কনুই দিয়ে ঠেলা দেয় আমাকে, দেখেছিস্ মাল দু'খানা ?

নজর ফেরাই। দুটি মেয়ে চলেছে। হ্যাঁ, দেখবার মত বটে। শুধু দেহ নয়, চলন বলন সব কিছুর ভেতরেই একটা আঁট ভাব। 'ধর, সখি ধর' ভাব এদের কুষ্ঠিতেও লেখেনি। যদিও আদৌ কুষ্ঠি লেখা হয় কিনা এদের, তাও আমার জানা নেই। তবুও প্রতিবাদ করি—মাল কি ? ভদ্রতা শিখবি কবে ?

রাখ্ তোর ভদ্রতা। ইদিকে মগজের সব কিছু উল্টে পাল্টে পয়মাল ক'রে দিয়ে গেল—যা তুই জাহাজে ফিরে। আমি থেকে গেলাম এদেশে।

কি বাজে বকছিস্ ? বলে এক ঝাঁকি মেরে ওর দিকে তাকাতেই দেখি ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে। আবার কি একটা বা নজরে পড়েছে ভেবে এদিক ওদিক চোখ চালিয়ে দেখি হাসবার মত কিছুই নেই কোথাও। তবে হাসে কেন ? মাথার কব্জা কোথাও ঢিল হয়ে গেল নাকি ? এখনই ওকে নিয়ে ফিরে যাওয়া উচিত কি না ভাবছি, এমন সময় বলে উঠল সে—এই, ভজহরির কি ব্যাপার হয়েছিল জানিস্ না ?

যা বাবা, কোথা থেকে কোথায় ! আমি কোথায় ভাবছি মেয়ে দুটিকে দেখে টাল খেয়েছে সে, আর সেই জায়গায় ও কি না একলাফে গিয়ে উঠেছে জাহাজে !

চল্, ঐ চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসি। বলে ও।

দু'জনে গিয়ে বসি একটি রেষ্টুরেন্টে।

দিউ টাজা টে।

হোঁচট খেয়ে খেয়ে কোনরকমে দু'কাপ চায়ের হুকুম জানিয়েই আমার দিকে ফিরে বেশ জুৎ হ'য়ে বসে দিনেশ।

ব্যাপারটা কি হচ্ছে জানিস ? ভজহরিদা আমাদের বৌদিকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

সেত' পিল্লাইও পারে না। তাতে কি এল গেল ? উত্তর দিই আমি।

তুই একটা বুদ্ধু নয়ত' এক নম্বরের ঘোড়েল। বলে রেষ্টুরেণ্টটার ভেতরটা একবার ভাল করে দেখে নেয় সে। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে

নিয়ে বলতে থাকে—বেটা ভক্ত-বিট্‌কেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। জলের ভেতরে আর নতুন একটা বৌদিকে পায় কোথায়? দিশে মিশে না পেয়ে একদিন ঠেসে মদ গিলেছে। একদম বেহেড অবস্থা। এদিকে ইন্ধন পেয়ে মনের আগুনও গিয়েছে বেড়ে। আর হতভাগা খেয়ালীরামেরও কপাল এমন, ঠিক সেই সময়ে কি একটা কথা বলতে গিয়ে ঢুকেছে ওর ঘরে। আর যায় কোথায় সেরে!

স্থান, কাল, পাত্র বিলকুল ভুল হ'য়ে যায় সব। আকাশ ফাটানো হাসি হাসতে থাকি হু'জনে। কি ভাববে মানুষে আমাদের এই অসভ্যতা দেখে সে কথা চিন্তা করবারও শক্তি নেই। লাফিং গ্যাসে আক্রান্ত মানুষের মত ধমকে ধমকে শুধু হাসির উদ্‌গার তুলতে থাকি। একবার শুধু নজরে পড়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দোকানের 'বয়'টি, হাতে ট্রের ওপরে হু'কাপ চা। কিন্তু আমাদের চারটি হাতের আক্ষেপে বেচারি কাপগুলো টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখবার সুযোগ পাচ্ছে না। এদিকে আমাদের দমও এসেছে ফুরিয়ে, আর পেটেও ধরেছে ব্যথা। থামতে চেষ্টা করছি যত ততই চোখের ওপরে ভেসে উঠছে সেই দৃশ্যটি। আর পারি না আমি। ভয় হচ্ছে এখুনি হয়ত' পড়ে যাব চেয়ারের ওপর থেকে। কিন্তু পড়া হয় না। পিছন থেকে একটা ভারি গলার ধমক আসে—নাবিকেরা, আমরা আশা করি না যে তোমরা ভদ্রতা ভুলে যাবে।

গমকের মুখেই ধমক্। কটাৎ ক'রে সুরটা কেটে যায়। প্যাটপেটিয়ে চেয়ে থাকি বক্তার মুখের দিকে। বিরাটকায় চেহারা। এক একটা থাবায় আমাদের এক একজনের মুণ্ড বৃন্তচ্যুত ক'রে নিতে পারে অনায়াসেই। মুখের ওপরে ঘনায়মান মেঘ সেই ইচ্ছাটিই যেন প্রকাশ করছে। একে হাসির ধমকেই গলা বুক শুকিয়ে কাঠ তার ওপরে এই রাবণ রাজা! আমি আর আমিতে নেই। একবার চোখ হুটো গিয়ে পড়েছিল চায়ের কাপের ওপরে। কিন্তু তখুনি জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল সে আশায়। কে জানে, কাপের দিকে হাত বাড়াতে গেলে যদি ওর স্কন্ধদেশ থেকে ঝুলন্ত জন্মায়ুধ হুটির একটি নেমে আসে আমার ওপরে! কি করি, কি করা উচিত, ভাবছি। লাফিয়ে ওঠে

দিনেশ—বসুন,বসুন সার। বলেই 'বয়'কে হুকুম করে একটি চেয়ার এগিয়ে দিতে।

না, আমি বসব না। সেই কণ্ঠোচ্চারিত ইংরিজিতে বলেন ভদ্রলোক, তোমরা জান না, আমাদের মুখ থেকে হাসি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে ঐ মিত্রশক্তি।

আরে, সেই কথাইত' বলছি। ইংরেজদের একটা জাহাজে কি ঘটনা ঘটেছিল, সেই কথাই আলোচনা করছিলাম আমরা।

বয়! চেয়ার।

হুকুমের ওয়াস্তা শুধু। এসে যায় চেয়ার। ইংরেজের কেচ্ছা, রসিয়ে শুনতে চায় ইটালী। জমিয়ে বসলেন ভদ্রলোক। আমিও সুযোগ-সন্ধানী। তাড়াতাড়ি আর এক কাপ চায়ের হুকুম জানিয়ে বসি ভদ্রলোকের জন্যে। এদিকে আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে দিনেশের মিথ্যের জাল বোনা। ভজহরির জায়গায় দাঁড় করিয়েছে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ারকে, আর খেয়ালীরামের বদলে এক ইংরেজ খালাসী। বিহঙ্গম-এর বদলে কাল্পনিক জাহাজটির নাম হয়েছে এম, ভি, গ্যালিভার। এগিয়ে চলতে থাকে ইংলণ্ডীয় জাহাজের কেচ্ছা। খেপ, জাল নয়, একবারে বেড়-জাল। লক্ষ্য ঐ একটি রাঘব বোয়ালকে টেনে তোলা।

চলেছে দিনেশের স্বদেশী ইংরিজি। উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলা স্রোতস্বিনীর মত। কোথাও সাবলীল গতি। কোথাও বা ঠেক্ খাওয়া। সংস্কৃতের মত এই বিষয়টিতেও ও বিশেষ রপ্ত বলেই মনে হয়। যাইহোক, আমার তখন আর খেয়াল নেই সেদিকে। নিশ্চিন্ততার বাতাস লেগেছে গায়ে। ফুরফুরিয়ে উঠেছে মন। সহর ছেড়ে বাইরের কিছুটা দেখে আসতে পারলে হ'ত। অন্ততঃ একবার মিলিয়ে নেওয়া যেত এদেশ ওদেশ। এরা রণ-ক্লান্ত, আমাদের ক্লান্তি অন্তরের নিঃস্বতায়। আপন বলতে যা কিছু ছিল, নিংড়ে নিয়েছে তা নিঃশেষে। যা আছে তা সবই চাপানো, কিছুই নিজের নয়। পিঠে বোঝা নিয়ে এগিয়ে চলেছি ভারবাহী বলীবর্দের মত। কবে এ বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার মানুষের মূর্তি ফিরে পাব, কে জানে।

বুম্— বোমা ফাটল বুঝি আমার পাশে। চম্‌কে চেয়ার থেকে পড়ে যেতে যেতে কোনরকমে সামলে নিই। না, বোমা নয়। গ্যাসের চাপে হাসির বোতলের ছিপিটা উড়ে গিয়েছে। তারপরই কট্ কট্ কট্ কট্ ক'রে হাসির মেশিন গানের গিটকিরি চলতে থাকে। অতবড় বপুটা ছেলেমানুষের মত নাচানাচি করতে থাকে চেয়ারের ওপরে। হাত পায়ের স্থিরতা নেই। এদিক ওদিকে যে ভাবে ছুটোছুটি করছে কখন বা একখানা ছিট্‌কে এসে পড়বে আমার ওপরে! ভয়ে ভয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে যাই নিরাপদজনক দূরত্বে। তাও কি রক্ষা আছে? উঠে দাঁড়ান ভদ্রলোক। দু'হাতে পেট থাবড়াতে থাবড়াতে গিয়ে দাঁড়ান কাউণ্টারের সামনে। তারপর—তারপর যাহা ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোন কালে—এই কথাই বলতে হয়। আমাদের অবোধ্য আর তাঁদের বোধ্য ভাষায় কি কতকগুলি কথা বলে যান ভদ্রলোক। বলেন আর হাসেন, হাসেন আর বলেন। আর বলা শেষ হ'তে না হ'তেই এক উন্মাদ নৃত্য আরম্ভ হয় সেই ঘরের মাঝখানে। শুধু নৃত্য বললে ভুল হবে, সঙ্গে সঙ্গীতের রূপ নিয়েছে হাসি। আমরা দু'জনে ততক্ষণে দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি। শুধু চায়ের দামটাই আটকে রেখেছে। ক্রমেই চাপ বাড়ছে আমাদের পিছনে। উৎসুক জনতার সমাবেশ ঘটছে। বুঝতে পারি। কিন্তু সে ঔৎসুক্য মেটাবার আর সাহস নেই আমাদের।

চল পালিয়ে যাই, ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলি দিনেশকে, পরে এসে দাম দিয়ে যাব।

দাঁড়া। 'বয়'টাকে যদি ধরা যায়, সে বলে, ঐ দেখ্, চিংড়িমাছের মত লাফাচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি সত্যিই তাই। পেট থাবড়ে, মাথা থাবড়ে ছেলেটা নিজেকেই অস্থির করে তুলেছে। ছেঁচা-জালে আটকে পড়া চিংড়ির মত অবিরত লাফিয়েই চলেছে।

এক একটা দিন আসে, বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে পার হ'য়ে যায়। সেদিনের কোনও ইতিহাস নেই। ইতিহাস গড়ে তোলে সেই দিনটি যেদিন

গেরোর ওপর গেরো লেগে অস্থির ক'রে তোলে প্রাণ। ত্রিয়েস্তের সেই প্রথম দিনটিও আমাদের ইতিহাসের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছিল। অপেক্ষা করছি 'বয়'টাকে চায়ের দাম দেব বলে। অনন্যদৃষ্টি হ'য়ে লক্ষ্য ক'রে চলেছি কখন ওদের হাসির ধমক একটু কমবে বা বয়টি আসবে হাতের নাগালের ভেতরে। এমন সময় কানের কাছে ইংরিজি। ভারতীয় নয়, ইটালীয়ও নয়, খাস ইংলণ্ডের। পিলেটা চম্‌কে উঠে হাটের সঙ্গে প্রায় আট্‌কে গিয়েছিল আরকি! এক ধাক্কায় নামিয়ে দিল দিনেশ। ওর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বাহবা দাবী করতে পারে। চম্‌কে ফিরে চেহারা দুটি দেখেই জিজ্ঞাসা করে—তোমরা কি বৃটিশ জাহাজ থেকে এসেছ?

উত্তরে একটা ঢেকুর তুলল, না 'ইয়েস' বলল, ঠিক বোঝা গেল না। শুধু 'ইয়া' বলে একটা শব্দ উঠল একজনের গলায়। বাস, আর কথা নেই। রাস্তা পেয়ে গিয়েছে দিনেশ। বলে ওঠে—আমার সঙ্গে এস। আমি জানি ওরা কেন হাসছে। তারপরই গলার স্বর নামিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে—একটা আমেরিকান জাহাজের কাণ্ড শুনে—

আর বলতে হয় না তাকে। হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগুতে থাকে তারা। আমি অনুগামী। যেতে যেতেই প্যাঁচটি বুঝিয়ে বলে দিনেশ—বুঝলি অশোক, উদিকে যমজ ভাই হ'লে কি হয়, এদিকে এ ওর কেচ্ছা শোনবার জন্যে উদগ্রীব। দেখ্‌না এরা আবার কি রকম নাচে। এবারে ভজহরি আর খেয়ালীরামের জায়গায় দাঁড় করাব আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ার আর লস্করকে।

আশ্চর্য! নাচলও ঠিক। আর সে নাচা বলে নাচা! আমার প্রাণ ত' খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়। বোতলের পর বোতল আসছে, খালি হচ্ছে আর শব্দ উঠছে হা হা হো হো। যতবার উঠতে যাই ততবারই হাত চেপে ধরে ওরা। ওদের সঙ্গে আমাদেরও গিলতে হবে। কিন্তু ঐ বলা পর্যন্তই। কাজ হ'ল কিনা তা আর দেখছে কে? শেষে এক সময়ে হাত চেপে ধরবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে তারা। আমরাও সুযোগ বুঝে যঃ পলায়তি স জীবতি নীতি অনুসরণ করি।

এ হেন দিনেশকে পরে দেখেছিলাম জাহাজ ঘাটের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতে। উস্কো খুস্কো চুল। পরণে ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড়। তালি দেবার অবস্থাও পার হ'য়ে গিয়েছে জুতো জোড়ার। ঘোরে আর বিড় বিড় ক'রে কি যেন বলে। আমার চোখে পড়লেই নেমে গিয়ে টেনে এনে জাহাজে তুলেছি তাকে। এসেছে কিন্তু আমাকে চিনতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারিনি। কি যেন ভাবে সর্বদাই। যতই চেষ্টা করি তাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনতে, আরও দূরে সরে যায় সে। হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠে—আমি বিশ্বাস করি না ওদের। ওরা সব পারে। শেষ ক'রে ফেল, খতম্ কর। লাফিয়ে গিয়ে আমার ঘরে ঝোলান রেঞ্চটা তুলে নেয় হাতে। ছুটে গিয়ে সেটা কেড়ে নিই। ধরে ঝাঁকানি দিই ওকে—দিনেশ! এই দিনেশ! ঝাঁকি খেয়েই বুঝি সম্বিৎ ফিরে আসে ওর। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকায় আমার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে তার চোখ ছুটিতে সহজ দৃষ্টি ফুটে ওঠে। আশা পাই আমি। হয়ত' এখনও চেষ্টা করলে ওকে সুস্থ ক'রে তোলা যেতে পারে। বলি, দিনেশ, তুই আবার ফিরে আয় কাজে। কিছুক্ষণ কোনই উত্তর দেয় না সে কথার। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। কি যেন খোঁজে, কি যেন সে চায় মানুষের ভেতরে। ধরতে চেষ্টা করি ওর সেই চাওয়াটাকে, পারি না। হঠাৎ বলে ওঠে সে—কাজ? পরমুহূর্তেই হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে—আমি শেষ হয়ে গেলামরে অশোক। আমাকে শেষ ক'রে দিল। বলতে বলতেই ছুটে বেরিয়ে যায় আমার ঘর থেকে। সোজা সিঁড়ি বেয়ে গিয়ে নামে জলের মাথায়, হাঁক দেয়—বোট।

তুঃখ হয় ওর জন্যে। মুখ-ফাজিল ছিল সে যথেষ্ট, কিন্তু প্রাণ ছিল। আপন প্রাণোচ্ছলতার পরশ দিয়ে সজীব ক'রে রাখত এতগুলো মানুষকে। আমার প্রথম জাহাজ-যাত্রা আন্দামান যাওয়া আসার কয়টি দিন যতখানি একঘেয়ে মনে হ'য়েছিল, বিহঙ্গম-এ তুটি বৎসর একটানা কাজ ক'রেও ততখানি কষ্ট বোধ করিনি। তার কারণ ঐ দিনেশ। ছেলেটাকে যদি কোনও মানসিক হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করান যেত তাহ'লে আবার হয়ত' সুস্থ হ'য়ে উঠতে পারত। কিন্তু করবে কে? যারা

করবার তাদের স্বার্থপরতার আঘাতেই তো আজ ওর এই অবস্থা। সেই কথাই বলছি—

আমরা সেবার চলেছি তিলবেড়িতে। সেটা বোধহয় ছিল ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মাস। মাসটা ঠিক মনে না থাকলেও ঋতুটা যে শীত ছিল বেশ স্পষ্ট মনে আছে তা। যেমন চির অশান্ত বে-অফ্-বিস্কে তেমনি তার শিষ্য ইংলিশ চ্যানেল। সোনায় সোহাগা জুটেছে শীতের কুয়াশা। কয়েক গজ দূরেও চোখ চলে না। চীৎকার ক'রতে ক'রতে গলা ভেঙ্গে এসেছে জাহাজের। গতি শ্লথ হ'তে হ'তে এমন জায়গায় এসে ঠেকেছে যে তার চাইতে ধীর গতি করতে হ'লে থেমে যাবে জাহাজ। এর ভেতরে আবার আমি বমি ক'রতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। এত ঝাঁকি খাইনি ত' কোনদিন। মনে হচ্ছে অন্নপ্রাশনের ভাত শুদ্ধ উঠে যাবে এবারে। খবর পেয়েই দিনেশ ছুটে এল। এক পলক দেখেই আবার ছুটল দাবাই-এর কাছে। দাবাই মানে ডাক্তার নয়, এমন কি কম্পাউণ্ডারও নয়। যদিও ঐ বলেই সম্মান দিই আমরা তাকে। আসলে সে ফোর্থ ডেক-অফিসার। পাশ করা ডাক্তার থাকে যাত্রীবাহী জাহাজে। ৮০ জনের বেশি নাবিক আছে যে কার্গো-জাহাজে সেখানেও ডাক্তার রাখবার আইন আছে। কিন্তু সাত মণ তেলও পোড়ে না, রাধাও নাচে না। চল্লিশই পোজেনা, আশি হবে কোথা থেকে? তাই কতকগুলো বাঁধা ধরা ওষুধ দেওয়া থাকে। আর থাকে নাবিকদের ভাগ্য। বাঁচলে ওতেই বাঁচল, গেলে ওতেই গেল। সেই বাঁধা ধরা ওষুধই রপ্ত করেছে ফোর্থ ডেক-অফিসার। তাই সে আমাদের দাবাই। দিনেশ গেল আর এল। সঙ্গে দাবাই। এসেই হাঁ হ'য়ে যায়। এরই ভেতরে বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন আমার ঘরে। সরবে দোষারোপ ক'রে চলেছেন আমাদের মত দুগ্ধপোষ্যদের। যখন সামান্য একটু দোলানি সহ্য করতে পারি না তখন কেন আসি জাহাজের কাজে! কেরাণীগিরির কাজ খুঁজে নেওয়াই নাকি আমার উচিত ছিল। বুঝি তাঁর অসহায় অবস্থাটা। ভদ্রলোক কণ্ট্রোল প্যানেলটি নাকের ডগায় রেখে ঠায় বসে থাকেন টুলের ওপরে। আর ইঁদুরের মত এ সুড়ঙ্গ ও সুড়ঙ্গ করতে হয় আমাকে। কিন্তু যা

শারীরিক অবস্থা আমার তাতে পুরো দুটো দিন তাঁকে একাই কাজ করতে হ'তে পারে। কাঁধে ভর করবার আর কেউ নেই।

সত্যিইত', নিজেকে চেপে রাখতে পারে না দিনেশ, বালার পিছন থেকে বলে ওঠে, তুই কি ধরণের বে-আক্কেলে মানুষ, বল্ দিকি অশোক? দাদার আমার চিরকাল পরের কাঁধে বন্দুক রেখে শীকার করা অভ্যাস। এখন সেই কাঁধটি সরে গেলে শীকার করবেন কি ক'রে?

তুমি থামহে ছোকরা। ধমকে ওঠেন বালা।

মি'লর্ড! থামা যে আমার অভ্যাস নয়। হয় আপনি থামবেন নয়ত' আমি ওল্ডম্যানকে ডেকে নিয়ে আসতে বাধ্য হব। অসুস্থ মানুষকে গালাগালি করবার অধিকার আর্টিক্‌লএ দেওয়া আছে কিনা তা একবার জেনে নেব।

এরপর আর থাকা চলে না। রাগে গোঙরাতে গোঙরাতে বেরিয়ে যান বালা।

ঘরে ত্রি-মূর্তি আমরা। দিনেশ, দাবাই আর আমি। নোংড়া হ'য়ে গিয়েছে ঘরের মেঝে। একজন ডেক খালাসীকে ডেকে নিয়ে এসে প্রথমেই তার ব্যবস্থা করায় দিনেশ। তারপর আমার ইলাজ। দাবাই তার নিজের জন্যে আনা ট্যাবলেট দেয় আমাকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দিনেশকে দেখি আর ভাবি কোন গুণে সকলের ওপরে এমন একটা কর্তৃত্ব ক'রে চলে সে। মনটাত' মাখনের মত নরম। তার খোঁজ পেয়েছি আমি আমার প্রথম বিদেশ যাত্রায়, এডেনে। আবার সেই মাখনই যে প্রয়োজনকালে রূপ বদলে ইস্পাতের ফলা হ'য়ে দাঁড়ায় তাও প্রত্যক্ষ ক'রেছি, একবার নয়, কয়েকবারই। সাধনায় সব হয় না, ধার হ'তে পারে। তবুও কথা হচ্ছে, আসল বস্তুটি থাকা চাই। পরিচর্যায় চারা-গাছটিও হ'য়ে উঠতে পারে বিরাটবপু এক বৃক্ষ। কিন্তু চারাটিকে ত' থাকতে হবে। নইলে চারাহীন ভূমি শত পরিচর্যাতেও দেবে না কোন সাড়া। দিনেশের ভেতরেও তেমনই নিজস্ব পদার্থ কিছু ছিল, শান পড়েছে তাতে বিভিন্ন ঘটনার মাঝে পড়ে এবং বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সংস্পর্শে এসে।

আমার ইলাজের ব্যবস্থা হ'য়ে যেতেই দাবাইকে বলে—বোস, গল্প করি।

কথা নয়ত' যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ফাঁসির হুকুম শুনছে এমনই হয় দাবাইএর মুখের অবস্থা। শুধু মুখ-চোরা আর লাজুক প্রকৃতিরই নয়, একটু সন্ত্রস্তও বটে। পড়েছে এক স্বনাম-ধন্য ঠোঁট-কাটার পাল্লায়। প্রথমেই প্রশ্ন ক'রে বসে, দাবাই বিয়ে করেছে কিনা। উত্তর দেবে কি, মাথাটা যেটুকুও বা খাড়া ছিল ঘাড়ের ওপরে, এবারে সম্পূর্ণভাবেই ঝুলে পড়ে। আমি ধমকাই দিনেশকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! নাচাবার নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে। বিয়ের প্রশ্নের জবাব পেল, কি না পেল, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না তার। পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসে, ছেলেমেয়ে কয়টি। দাবাইএর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' গোছের অবস্থা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে আমার, এই দাবাই ত' আমাকে বলেছিল সয়ারাম আর তার বৌ-এর পেটাপিটি করা হচ্ছে এক ধরণের প্রেম নিবেদন। ও কথা যে বলতে পারে সে কেন এত মুখচোরা হবে? নাকি, দিনেশের সামনে এসেই এ অবস্থা হ'য়েছে তার? আক্রমণকে প্রতিহত করবার যথেষ্ট শক্তি নেই। তাই যতই এড়িয়ে যেতে চায় ততই জড়িয়ে যায় ওর ভাষা। অদ্ভুত মনে হয় আমার। একজন মানুষ অপর একজন মানুষের সামনে এলেই তার সহজ ভাব হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কেন? শুধুই কি এ একপ্রকার স্নায়বিক দুর্বলতা? না, সপ্রতিভ যুক্তিযুক্ত উত্তর দেবার ক্ষমতার অভাব? মস্তিষ্ক, না স্নায়ু, কে দায়ী ওদের এই অক্ষমতার জন্যে?

চিন্তা চলেছে একটি বিশেষ ধারা নিয়ে। একরকম ভুলেই গিয়েছি এই ঘরেরই অপর দুইটি মানুষের কথা। দিনেশের ধাক্কায় বাস্তবে ফিরে আসি।

কিরে, ঘুমুচ্ছিস্ নাকি?

নাত'। কেন?

আমি কি বলছি, শুনেছিস্?

বলছিস্ নাকি? আমি ভাবলাম দাবাইএর সঙ্গে কথা কইছিস্।

সে ত' কখন চলে গিয়েছে। ধ্যেৎ, মুখ গোমড়া ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে কথা বলতে ভাল লাগে? থেমে গেল দিনেশ। একটু পরে আপনা থেকেই আবার বলে উঠল, আমিও ভাবছি এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিয়ে করব। বয়স ত' অনেক হল, কি বলিস্?

আমি হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। এতদিনে ঘর টেনেছে ওকে। ভার হ'য়ে উঠেছে এই একাকীত্বের জীবন। অংশীদার চায়, চায় দরদী হাতের পরশ। আর সব চাইতে বেশি ক'রে যা চায়, সে হচ্ছে চিঠি। যে সব বন্দরে কোম্পানীর এজেন্ট আছে সে সব জায়গায় পৌঁছুতেই দেখেছি, ও যেন পাগলের মত হ'য়ে যায়। ক্ষুধার্ত হায়নার লোলুপতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জাহাজে উঠবার সিঁড়ির কাছে। এজেন্ট এলে ছায়ার মত অনুসরণ করে তাকে। মাস্টার তাঁর ঘরে বসে ডাক নেন, টাকা নেন। ও থাকে ঘরের বাইরে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। তারপর পার্সারের হাতে চিঠি পৌঁছে গেলেই ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ে। এই পৃথিবীতে যেন ঐ একটিই মাত্র তার চাহিদা—চিঠি চাই, চিঠি। বুঝতে পারি ওর অন্তরকে। বাপ মা কেউ নেই। আপনার জন বলতে সৎ-মা আর সৎ-বোন। বুভুক্ষিত অন্তর তাদের দু'জনকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে চায়। সমস্ত ভার তাদের সানন্দে তুলে নিয়েছে মাথায়। দিয়ে চলেছে হৃদয় উজাড় ক'রে। প্রত্যাশা শুধু তাদের একটুখানি ভালবাসার। দূর বিদেশী বন্দরে তাদের একখানা চিঠির।

ভালবাসার যে এমন একটা রূপ আছে, স্বার্থগন্ধহীন ধূপের মত নিজেকে এই জ্বালিয়ে দেওয়া, দিনেশকে না দেখলে মানুষের জীবনের এই বিরাট দিকটিই আমার কাছে থাকত অপরিচিত।

কলকাতা ছাড়বার আগে জেনারেল সার্ভেতে আটকে পড়েছিল জাহাজ। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে মেরামতের কাজ চলছিল। এ কাজটা প্রতি চার বৎসর অন্তর প্রত্যেক ব্যবসায়ী জাহাজকেই করতে হয়। আমাদেরও প্রায় ছুটির সামিল। পালিয়ে বেড়াচ্ছি বাড়ির তাগাদার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। মা বাবা দু'জনেই উঠে পড়ে লেগেছেন— আমার বিয়ে দেবেন। 'না' বলেও মুক্তি নেই। কেন 'না', তা বুঝিয়ে

বলতে হবে। বোঝাতেই যদি পারতাম তাহ'লে আর ব্যথাটা কোথায়? চিনুর অবস্থা আরও খারাপ। প্রথম দিনেই মাথায় সিঁদুর দেখেই বাবা খাপ্পা। তারপরই এল চাপ। বাধ্য হ'য়েই স্বীকার করতে হ'য়েছিল সব কথা। শুনে গুম্ হ'য়ে গিয়েছিলেন চিনুর বাবা। কয়েকটা দিন তিনি বাড়ীর কারও সঙ্গে কোন কথাই বলেননি। তারপরই ব্লাড-প্রেসারে শয্যাগত। সেই অবস্থাতেই মেয়েকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে তিনি বেঁচে থাকতে কন্যা তাঁর আর বেশিদূর এগুবে না। স্বীকার ক'রেছিল চিনু। অসুস্থ পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বাধ্য হ'য়েছিল স্বীকার করতে। বুঝেছিল সে, নিঃসঙ্গ জীবন তার ভাগ্য-লেখা। অভিযোগ, অনুযোগ কিছুই চলবে না। খেয়াল যুক্তি মানে না। তাই নিঃসঙ্গ জীবনের অবলম্বন হিসাবে জোগাড় ক'রে নিয়েছে একটি শিক্ষিকার কাজ। প্রথম বিদেশ যাত্রার পালা শেষ ক'রে ফিরবার মুখে এডেনে পেয়েছিলাম এই বিশদ বিবরণ দেওয়া চিঠি। স্কুলের ঠিকানাও ছিল তাতে। সেইখানেই আমার হাজিরা খাতা। উপস্থিত হওয়ার সময় ছুটির মুখোমুখি। স্কুলের সামনেই আলু-কাব্‌লী, চিনেবাদাম, আইসক্রীমের ভিড়। চিনু বেরিয়ে আসতেই বলি—চল, আলু-কাবলী খাই।

দু'চোখে কৃত্রিম ক্রোধ, ও বলে—হ্যাঁ, তাই আর কি! মেয়েরা কি ভাববে?

আমি হাসি। বলি—বাবা দাদা কি ভাববে তাই ভাবলে না। এখন এদের ভাবা নিয়েই অস্থির?

পরিহাস ছলেই বলি কথাটা। ও তা নেয় না। বেশ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি চাও তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের রাস্তাটাও আমার বন্ধ হ'য়ে যাক্?

চিন্তার এ রাস্তাটি মাড়াইনি আমি। ওদের সংসারে আমি অনভিপ্রেত। তাছাড়া চিন্ময়ের স্ত্রী আসায় ওখানে আর যাওয়া চলে না। তাই বাধ্য হ'য়েই চিনু বেছে নিয়েছে এই রাস্তা। অর্থোপার্জন যার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আপনাকে ভুলিয়ে রাখা আর আমি এলে দেখা শোনার সুযোগ পাওয়া, এই ছিল তার প্রধান কারণ। তবুও ছাড়ি না

আমি। আলু-কাবলী না হ'ক, চিনেবাদাম খেতেই হবে। এক ঠোঙা বাদাম কিনে নিয়ে একটি একটি ক'রে সংখ্যা কমাতে কমাতে এগুতে থাকি ছ'জনে। হঠাৎ বলে ওঠে চিনু—আমার জন্যে তোমার জীবনটাও ভেসে গেল। বুঝি কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ। যে ব্যথা পাষাণের মত চেপে বসেছে ওর বুকে, সেটাকে একটু হাল্কা ব রবার জন্যে বলি—ভেসে বেড়াবার জন্যে ছ'জায়গায় সাত বৎসর ট্রেনিং নিেছি।

একটু গম্ভীর হবে ? বলে ও।

গম্ভীর হ'লেই ফেটে পড়ব। উত্তর দিই আমি—সহ্য করতে পারব না এই অসহনীয় চাপ।

তা বটে। বলেই থেমে যায় সে। কি যেন চিন্তা করতে থাকে। একটু পরে বলে—কিন্তু আমি যে কিছুতেই পারি না নিজেকে লঘু করতে।

এ কথার আর উত্তর নেই। বয়স চলে তার ধর্মকে সঙ্গে নিয়ে। সে অবস্থায় কেউ যদি যৌবনে যোগিনী না হ'তে পারে তাহ'লে তাকে স্খলিতা বলব, এ মত আমার নয়। তবুও বলি—চিনু, এ এক চরম পরীক্ষা। পাশ ফেল নির্ভর করে মানসিক শক্তির ওপরে।

থাম গো, আর বক্তৃতা দিতে হবে না। মুখের বলার সঙ্গে খপ্ ক'রে তুলে নেয় কতকগুলো বাদাম আমার হাতে ধরা ঠোঙার ভেতর থেকে। একটিকে টিপে ফাটাতে ফাটাতে বলে—আমরাও বাদাম। শুধু ওপরের খোসাটা কবে ফাটবে সেই অপেক্ষায় বসে আছি।

কথার শেষ নেই। কিন্তু পথ একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে শেষ হবেই। এসে দাঁড়াই ছ'জনে মোমিনপুরের মোড়ে। এবারে ছ'জনে ছ'মুখো হব। তাকাই ওর মুখের দিকে। প্রথম যৌবনের উচ্ছলতা স্বল্প-গভীরা স্রোতস্বিনীর মত। হাস্যে লাস্যে চলে কলকলিয়ে। তা নয় এখন আর চিনু। স্থির, শান্ত, গভীর। একটু চিন্তিতই হ'য়ে পড়ি ওর জন্যে। দোষ দিই নিজেকে। কেন আমি পূর্বাহ্নেই সাবধান হ'য়ে গেলাম না। তাহ'লে হয়ত' এভাবে নষ্ট হ'য়ে যেত না ওর জীবনটা।

চিনু !

স্বরে আমার কি ছিল জানি না। ধমক্ দেয় চিনু—আজে বাজে চিন্তা করবে ত' ঠিক আড়ি হ'য়ে যাবে।

না, আর চিন্তা করব না। এগিয়ে যখন গিয়েছি তখন পিছোতে যে আর পারব না, এ ত' জানা কথাই, বলি আমি, চলি তাহ'লে আজকের মত ?

ওকে ট্রামে তুলে দিয়ে হারবারের পথ ধরি আমি। বাড়ি ফিরবার আগে আর একবার হাজিরা দিয়ে যেতে হবে জাহাজে।

জাহাজে ফিরতেই দেখি দিনেশ বসে আছে আমার অপেক্ষায়। একেবারে হৈ হৈ ক'রে ওঠে সে। ওর আবেগ অনুপাতে সাড়া দিতে পারি না আমি। মনের ভেতরটা তখনও সম্পূর্ণভাবে অধিকার ক'রে বসে আছে চিনু। বিক্ষুব্ধ অন্তর। মেনে নিতে পারছি না পুরাতনী সমাজ ব্যবস্থাকে। আবার এগিয়ে যেতেও পারছি না। প্রতিজ্ঞার পাঁচিল নিজের হাতেই গেঁথে তুলেছে সে। কিন্তু কেন সে মানবে এই প্রতিজ্ঞা, তাই বুঝে উঠতে পারি না। একজন তার ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অহঙ্কারকে বজায় রাখতে চায় বলে আর একজনকে সেই খেয়ালের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে হবে, এ কোন ধরণের যুক্তি ?

ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই মন। ভাল লাগছে না. কোনরকম হৈ চৈ। তবুও ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে বলি—আয়।

সুখানীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে ঘর খুলে দিতেই দিনেশ ঘরে ঢুকে একদম টান টান হ'য়ে শুয়ে পড়ে আমার বিছানাটার ওপরে। পরমুহূর্তেই আবার লাফিয়ে উঠে বসে বলে—বাস্, মিটিয়ে ফেললাম সব।

আমি 'সেটি'র ওপরে দেয়াল হেলান দিয়ে বসেছি। একটু চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকবারই ইচ্ছা ছিল। সে পথ আগেই মেরে রেখে দিয়েছে ও। উঠে আসতে বলা যায় না। সেইভাবেই বসেই জিজ্ঞাসা করি—কিসের ?

কিসের আবার! বাড়ীর। বলেই নিজের খবর ঢালতে আরম্ভ

করে সে। প্রবৃত্তি নেই শোনবার। নাড়া খেয়ে গিয়েছে মনের সব কয়টি তার। মিশ্রিত বিশৃঙ্খল ঝংকার। সময়ের প্রয়োজন তাকে আবার সুরেলা করে তুলতে। সেই সময়টুকুও হাতে পাচ্ছিনা।

আরে ভাই, নিম্‌কিকে নিয়ে হয়েছিল এক ঝামেলা। পাড়ার এক বখাটে ছোক্‌রা হ'য়েছে তার আদর্শ-পুরুষ। কতদিন থেকে ভাবটি হয়েছে, জানি না। এইবার এসেই চোখে পড়ল। আমার ত' জানিস্ মেজাজ। নিম্‌কিকে ডেকে ঘরের ভেতরে এনে আচ্ছা ক'রে দিলাম ধম্‌কে—বাড়ির সম্মান একটি ছেলেতে যতখানি না ক্ষুণ্ণ করতে পারে, একটি মেয়ে পারে তার চতুর্গুণ। বড় হয়েছ তুমি, লেখাপড়া শিখেছ। এখন কি এমন কাজ করা উচিত যাতে আমাদের সকলের মাথা হেঁট হয়? বুঝলি অশোক, আমার কথা শুনে না, মেয়ের চোখ ছল্ ছল্। খায়নি ত' এমন ধমকানি কোনদিন।

ধম্‌কানি যে কতদূর হ'ল তা বেশ বুঝতে পারলাম। আর নিমকি যে এরপর কি করবে সেটা বুঝতেও খুব কষ্ট হ'ল না। কষ্ট হ'ল এই ছেলেটির কথা ভেবে। ভালবাসা দিয়ে তৈরী এই বুকখানি কি পারবে সে আঘাত সহ্য করতে?

বুঝলি অশোক, এক কাণ্ড করে ফেলেছি। একেবারে এক ঢিলে দুই পাখী। বলেই তিড়িং ক'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে দিনেশ। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার করে—ও লখারাম, আমার আর সরকারের টিফিনটা দিয়ে যাও। হুকুম জানিয়ে ফিরে এসে বিছানায় বসেই বলতে আরম্ভ করে—ঐ মান্ধাতা আমলের বাড়ি নিয়েই ত' যত গোলমাল। বাবা উইল ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। আর বলেছিলেন—তোর মা বোন রইল। আমি বলেছিলাম—যা থাকল, তা আমারই থাকল।

একটু থামে সে। বোধহয় বাপের সঙ্গে শেষ কথার সেই দৃশ্যটিই একবার মনে করবার চেষ্টা করে। তাকিয়ে আছি ছেলেটার মুখের দিকে। দৃঢ়ব্রত। কর্তব্যের সাধনায় ভালবাসাই তার একমাত্র জপমন্ত্র। ভয় হয় ওর জন্যে। কঠোরতার গাঁথুনি নেই। সামান্য অঘাতেই হয়ত' চুরমার ক'রে দেবে তার স্বপ্ন-সৌধটিকে।

শুনছিস্? হঠাৎ ধ্যান ভেঙে ওঠে দিনেশ।

বলতে থাক্।

কি যেন বলছিলাম? হ্যাঁ, গোলমাল বেধেছে ঐ বাড়িটি নিয়ে। মামা বীজমন্ত্র দিয়েছে। মাও যেন তাই ভয় পেয়ে গিয়েছে। আগের মত আর সহজভাবে কথাও বলতে পারে না আমার সঙ্গে। প্রতিটি কাজেই মনে হয়, আমার মা নয়, কোনও একজন দুঃস্থা ভদ্রমহিলাকে যেন বাড়িতে দয়া করে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। আমি বলি—দাঁড়াও, তোমার পাওয়াচ্ছি ভয়। বাস্, বিক্রী করে ফেললাম বাড়িটা।

বিক্রী করে ফেললি? চম্‌কে উঠি আমি।

ফেলব না! ঐ বাড়ি আমাদের ভেতরে ফাটল ধরাবে আর তাই সহ্য করব আমি? বাড়ি বিক্রী করেই মায়ের নামে জমি কিনেছি টালার কাছে। দলিলখানা মিলে যেতেই নিয়ে গিয়ে দিলাম মার হাতে। বললাম—মা! ও বাড়ি ছিল আমার নামে। কিন্তু এ বাড়ি হবে তোমার নামে। এটাকে বিক্রী করবার ক্ষমতা আমার কোনদিনই হবে না। বোঝ এখন!

শিশুর মত সরল একমুখ হাসি নিয়ে ধীরে ধীরে মাথাটাকে দোলাতে থাকে ও। আঁত্‌কে উঠি ওর মুখের ঐ অনাবিল হাসিখানি দেখে। প্রায় চীৎকার করে উঠি—তুই বিয়ে কর দিনেশ।

হাসে ও আমার কথা শুনে। বলে—করব রে, করব। আগে বোনটার ব্যবস্থা করি, তারপর সব হবে। হে হে, এবারে বোনটি আমার তার আদর্শ-পুরুষটির সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ করতে পারছে না।

সাগর দেখেছি। শুনেছি তার বুকে আছে নাকি প্রচুর রত্ন। আমি ভাবতে পারি না, সে সমস্ত রত্ন একত্রিত করলেও এমন একটির সমান হবে কি না। মানব-সাগরের বুকে এমন কত রত্ন ছিটোন আছে, কে তার খোঁজ রাখে?

জেনারেল সার্ভের আড়াই মাসে বাড়ি তৈরী করে ফেলল দিনেশ। আর আমি পড়লাম বাড়ি চাপা। একরকম বিনা নোটিশেই আমাদের

ছেড়ে চলে গেলেন বাবা। সুস্থ মানুষ। ঘুমুচ্ছিলেন রাত্রিবেলা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে চীৎকার করে উঠলেন—আমার শরীর অস্থির করছে। তারপরই নেতিয়ে পড়লেন বিছানায়। বাড়ির সকলেই ব্যস্ত। কি যে হ'ল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মা এসে ধাক্কা দিলেন আমার ঘরের দরজায়—শিগ্গীর ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। ওঁর শরীর অস্থির করছে। ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। বেশ খানিকটা পথ। বিপদের সময় আরও দীর্ঘ বলে মনে হয়। ডাকাডাকি ক'রে আরও দু'চার বাড়ির মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে তবে জাগাতে পারলাম ডাক্তারবাবুকে। তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে বাড়ির দরজায় দাঁড়াতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম মায়ের কান্নার শব্দ। ধ্বক্ করে উঠেছে বুকের ভেতরে—তবে কি—আর ভাবতে পারি না। ভয় করে। দাঁড়িয়ে গেলেন ডাক্তারবাবুও। তারপরই দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। আমার আর পা চলে না। কোন রকমে নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালাম বারান্দাটার কাছে। তারপর আর এগিয়ে যাওয়ার শক্তি নেই। জীবনে প্রথম আঘাত। তাও মনকে তৈরী হ'তে না দিয়েই। অকস্মাৎ। প্রতিটি মুহূর্ত যেন চেপে বসছে বুকের ওপরে। কি হবে এর পরে? এরই ভেতরে ভাবনা ঢুকেছে মনে। যে পাহাড়ের আড়ালে নিশ্চিন্তে কাল কাটাচ্ছিলাম, হঠাৎ যদি সেইটি সরে যায় আজ তাহ'লে আমার অবস্থাটি কি রকম দাঁড়াবে? একটানা কেঁদেই চলেছেন মা। ডাক্তারবাবু আসায় স্বরটা একটু নেমেছে শুধু। কাঁধের ওপরে একখানা হাতের স্পর্শ। মুখ তুলে দেখি পাশের বাড়ির ভবতোষবাবু। যিনি আমার মনে মনে গান গাইবার কথা বলেছিলেন। তাকাতেই বললেন, একদম কাঁদবে না। নিজে শক্ত থেকে মায়ের বুকে শক্তি এনে দিতে হবে। তোমার ওপরেই এখন এই সংসারটি নির্ভর করছে, মনে থাকে যেন। আরও এসেছিলেন কয়েকজন। সেদিন বুঝেছিলাম বিপদের দিনে মানুষ কতখানি আপনার হয়।

শ্রাদ্ধশান্তির পর মা বলেছিলেন—হ্যাঁরে, গুরুদশার পর একটি বৎসর যে নিয়ম পালন করতে হয়। একাদশীই বা করবি কি করে?

আমি বলেছিলাম—মা, আমাকে এখানে থেকে যদি নিয়ম পালন

করতে হয় তাহ'লে সবাইকে একাদশী করিয়ে ছাড়বে। আমাকে ছেড়ে দাও। আমার হ'য়ে মনুই করবে ওসব। তবে প্রথম বাৎসরিকের সময়ে যদি ফিরে আসতে না পারি তাহ'লে সেই দিনটি ফলমূল খেয়েই কাটাব।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়েছিলাম চিনুর স্কুলে। যাত্রার নোটিশ পেয়ে গিয়েছি। ভাসমান জীবনে দু'দিনের জন্যে পেয়েছিলাম কূলের আশ্রয়। সেখানেও যে এমনভাবে পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাবে তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? এখনকার অবস্থা আমার দিনেশের সমপর্যায়ে ফেলা যায়। যতদূরেই থাকি, মন পড়ে থাকবে এখানে। প্রধান প্রধান বন্দরে পৌঁছেই ঝাঁপিয়ে পড়ব পার্সারের ওপরে, একখানি চিঠির আশায়। কি অদ্ভুৎভাবেই হয় মানুষের পরিবর্তন। এ পরিবর্তনে কোনও হাত নেই তার। কিন্তু ফলভোগ তাকেই করতে হয়। তাইত' মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। যে তা করে না, সে আত্মীয় হ'য়েও অনাত্মীয়। আত্মার যোগচিহ্ন থেকে বিযুক্ত।

সে যোগচিহ্ন রেখেছিল চিনু। ধন্য মেনেছিলাম তার কৃচ্ছ্রসাধনকে। বাবার ধমকানি আর বৌদির কটূক্তি তাকে টলাতে পারেনি। পুরো একটি মাস ধরে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল তার শরীর, মনের ওপর দিয়ে। প্রতিদিনই যেতাম দেখা করতে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম তার সেই রুক্ষ বিশুষ্ক চেহারাখানি। শেষে আর সহ্য করতে পারিনি। ছুটে এসে মাকে বলে ফেলেছিলাম সব কথা। মৌনব্রতীর মত শান্ত গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনেছিলেন মা। আমার সব বলা শেষ হয়ে গেলে সেই মৌনভাব ভাঙল মায়ের। সখেদে বলে উঠেছিলেন—এ তুই কি করলি বাবা?

আমি কিছুই করিনি মা। যে করেছে তাকে বলগে'। উত্তর দিয়েছিলাম আমি।

তাকে আর কি বলব? সেও ত' এখন প্রতিজ্ঞায় জড়িয়ে রয়েছে। বলে একটা টানা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আফশোষ করেছিলেন—তুই দু'টো জীবন—

বলেছিলাম সে কথা চিনুকে। শুনে হেসেছিল সে। বলেছিল, মা

মায়েয় প্রাণ নিয়েই বলেছেন। তারপরই জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার জাহাজ ছাড়ছে কবে ?

দিন কয়েকের ভেতরেই।

মাসখানেক ছুটি নিতে পারলে ভালো হ'ত। যে ধকল গেল শরীরের ওপর দিয়ে।

হ্যাঁ, শুধু আমারই গেল। তোমার যায়নি মাটেই !

ও আমাদের সহ্য হয়ে যায়। চল, আমাকে একটু এগিয়ে দাও।

ট্যাক্সি নিই ?

কি যে ছেলেমানুষি কর ! ফিরে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল—সে টাকা দিয়ে কিছু ফল কিনে নিয়ে যেও মনু বিভার জন্যে। বলো, তাদের বৌদি পাঠিয়ে দিয়েছে।

সে কথা অমান্য করবার ক্ষমতা হয়নি আমার। ওকে বেহালার ট্রামে তুলে দিয়ে ফল কিনে নিয়ে তবে বাড়ি ফিরেছিলাম। আর মনে মনে যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলাম ওর বাবার বিরুদ্ধে। ভদ্রলোক চট্ ক'রে একটা অসুখ বাধিয়ে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন মেয়েকে দিয়ে। তারপর বেশ সেরেসুরে উঠে অফিস যাতায়াত সুরু ক'রে দিলেন। ভুলেও ভাবলেন না একবার মেয়েটার কথা। জাত্যাভিমানটাই বড় হ'ল তাঁর কাছে। মানুষটা কিছুই নয়। কিন্তু কাদের নিয়ে জাত ? মানুষের নয় কি ? আর জাতই বা কিসের ? কোথায় ছিল এই জাত ? যখন নগ্নদেহী সামান্য কয়টি মানুষ প্রস্তর-ফলা নিয়ে বের হ'তে শিকার সন্ধানে ? তখন কে ছিল দ্বিজ আর কে ছিল ব্রাহ্মণেতর ? কে ছিল আর্য, কে ছিল অনার্য ? এ ভেদাভেদ ত' আসুরিক শক্তির ফল। শক্তির দাপটে সৃষ্ট। মানতে বাধ্য হয়েছে দুর্বলের দল। এ রকম আইন ত' শক্তিমান গুণ্ডাতেও করে বলে শুনেছি। কেশব সেন স্ট্রিটের ওপরে ছিল টিকটিকি বাজার। ঐ বাজারেরই এক কোণের একটি ঘরে থাকত কাল্লু। ও এলাকার গুণ্ডাদের সর্দার। বাজারের লোকেরা তার ঘরে বয়ে এসে দিয়ে যেত মাসিক নজরাণা। এ ছিল তার আইন। দিতে হবে। না দিলেই বিপদ।

সে ছিল তখন। এখন আর সে আইন চলে না। দিন বদলায়। বদলাচ্ছে। আরও বদলাবে। শুধু এই পরিবর্তনের মুখে শহীদ হ'য়ে যেতে হয় কতকগুলি প্রাণকে। আমিও হতে চলেছি তাদেরই একজন।

একেইত' ডঙ্কা মেরে চলে। তার ওপরে মা বোনকে নিয়ে গিয়েছে নতুন বাড়িতে। ও যেন আর ওতে নেই। দিনেশের কথা বলছি। অন্তর পূর্ণ থাক্‌লে সব কিছুই তুচ্ছ বলে মনে হয়। সামান্য কথা, সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি, যা নিয়ে মনুষ পাগলের মত আচরণ করে বসে অনেক সময়ে, অন্তরের পূর্ণতায় তারা পায় ক্ষমা-দৃষ্টি। দিনেশকেও দেখি তাই। হেসেই উড়িয়ে দেয় সব। এই কিছুদিন আগের ঘটনা। জাহাজ থেমেছে এক জায়গায়। হারবার নয়। স্রেফ এ্যাঙ্করেজ। নাবিকদের রসদে পড়েছে টান। তারই ব্যবস্থা করতে হবে। মেস-সেক্রেটারী জুনিয়ার থার্ডের সঙ্গে দিনেশও চলল জিনিস কিনতে। ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আর হাসতে থাকি। এ যাওয়া সে যাওয়া নয়। ইউনিয়ন জ্যাক আজও ওড়ে বটে বৃটিশ রাজত্বের অধীন কোনও বন্দরে নোঙর ফেললে। কিন্তু আর নেই তার সেই বক্ষের বিস্ফার। অশোক-চক্র-লাঞ্ছিত পতাকার পিছনে দম নিয়ে নিয়ে উড়তে থাকে হাঁপানী রুগীর মত। আনত মস্তক পরাধীন দেশের এক সামান্য নাগরিক নয় আর দিনেশ। উন্নত গ্রীবা, উদ্ধত পদক্ষেপ তার জানিয়ে চলে স্বাধীন সত্বার কথা। পাশে এসে কখন দাঁড়িয়েছিলেন বালা। মন্তব্য করলেন, অকাল কুষ্মাণ্ড। বড় কানে বাজে কথাটা। ঝট্ করে ফিরে তাকাই বালার দিকে। এতদিনে একটি কঠিন কথা না বলে থাকতে পারি না আমি—ঐ কুষ্মাণ্ডটি ছিল বলেই ভারতবর্ষের সম্মান বেঁচেছে একদিন, যা পাকা মাথাদের সাধ্যেও কুলোয়নি।

দাঁড়াইনি আর সেখানে। সহ্য হয়নি বালার নৈকট্য।

খেতে বসে দেখা গেল একটি পা মিলছে না। কয়েকবারই গোণা হ'ল, কিন্তু ঠিকই থেকে যাচ্ছে একটি পা-এর অনুপস্থিতি। কি ব্যাপার!

সস্তায় মিলে গিয়েছিল বলে লোভ সংবরণ করতে পারেনি দুই ক্রেতা। কিনে এনেছে অতিরিক্ত দশটি মোরগ। লস্করদের পাঁচটি, অফিসারদের পাঁচটি। দাবী বিশষ কিছু নয়। দুই বাজার সরকারের দুটি ঠ্যাং অন্ততঃ চাই। সেই ঠ্যাং-এই পড়েছে টান। আর সেটা কিনা দিনেশেরই ভাগ্যে! হাঁক দিয়ে উঠল সে—ও বাবা ক্যাসাবিয়াঙ্কা! একটিবার আসতে হচ্ছে যে।

ডাকটি জোর কিন্তু সুরটি নরম। ওতে কাজ হয় না। কয়েকবার ডেকে শেষে 'যাক্ গে' যাক্' বলে থেমে যায় দিনেশ। তেতে ওঠেন ময়লা-সাফ, যাক্ গে যাক্ মানে? এ কি ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি? দিনরাত গিলেই চলেছে, পেটে কি ফিতে-কৃমি আছে নাকি ওর? বলেই হাঁক দিয়ে ওঠেন—এই আমীর আলি!

এ কণ্ঠস্বরকে অমান্য করবার সাহস হয় না আমীর আলির। সাড়ে চার হাত লম্বা কোল-কুঁজো মানুষটা ধীর পায়ে এসে দাঁড়ায়।

আউর একঠো পায়ের কিধার গিয়া? গাঁক্ গাঁক্ ক'রে ওঠেন ময়লা-সাফ।

জী? কথাটা বুঝতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে আমীর আলির।

একঠো পায়ের কমৃতি হায় কেঁউ?

ক'ঠো হায়?

ন'ঠো।

জী, ন'ঠোই থা।

হা হা ক'রে হেসে ওঠে দিনেশ। সেলুন কাঁপান হাসি হাসতে হাসতে বলে—তালি বাজাও। বাবা ক্যাসাবিয়াঙ্কা, জোরসে তালি বাজাও। তবেই না আর একটি 'পায়ের' ফুটে বেরুবে।

গল্পের ইসারা পেয়ে গিয়েছি আমরা। চেপে ধরি ওকে, বলতেই হবে গল্পটা। বলতে পারেও বটে। এ জিনিস সকলের আসে না। কারও অতি তুচ্ছ কথাও মন দিয়ে শোনে লোকে আবার কারও গুরুতর কথাও শুনতে চায় না। শোনানটা নির্ভর করে বাচনভঙ্গীর ওপরে। সে ভঙ্গী ওর বিশেষ ভাবেই রপ্ত আছে। চেপে ধরতেই আরম্ভ হ'য়ে যায় গল্প বলা।

এক ট্যাঙ্কার জাহাজের ক্যাপ্টেনের ছিল মাত্র সাতটি বৌ। এক রাজ্যে নয়। সাত রাজ্যে। তার ভেতরে একটি ছিল আবার বার্মিজ। বেচারীর একা একা দিন কাটে। প্রতি সপ্তাহেই চিঠি লেখে তার ক্যাপ্টেন স্বামীকে—একবার ভুল ক'রেও অন্ততঃ তোমার জাহাজটি ইরাবতীর ঘাটে এনে ভেড়াও। সাহেব উত্তর দেয় 'আসছি' 'আসব' ক'রে। এইভাবে প্রায় বছর তিনেক কাটবার পর সত্যিই একদিন ক্যাপ্টেন এসে পৌঁছুল বর্মায়। স্বামীর দেখা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা বর্মা-দুহিতা। এ আনন্দের দিনকে আরও ভাল ক'রে উপভোগ করবার জন্যে ক্যাপ্টেনকে বলল—চল, কাল আমরা যৌগন যাই শিকার করতে। সাহেব এক কথাতেই রাজী। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়—শিকার না হয় করা গেল, কিন্তু রাঁধবে কে? বার্মিজ হাতে বিলিতি স্বাদ কি আসবে? স্ত্রী বলে—কুছ্ পরোয়া নেই। তখুনি খবর গেল তার এক পরিচিত বাবুর্চির কাছে।

ব্যবস্থা সব ঠিক। পরদিন সকালেই বেরিয়ে গেল দু'জনে। হাতে বন্দুক। ফিরল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি মুখে মাখিয়ে দুটি মাত্র বক হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে। শিকার দুটি বাবুর্চির দিকে ছুঁড়ে দিয়েই হুকুম জানিয়ে দিল ক্যাপ্টেন—একটিতে বাবুর্চির পছন্দমত রান্না হবে, আর একটি হবে রোষ্ট। হুকুম জানিয়েই বসে গেল বোতল খুলে নিয়ে, ক্লান্তি অপনোদনে।

রাত তখন প্রায় দশটা। টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে বাবুর্চি। স্বামী স্ত্রী দু'জনে গিয়ে বসেছে সামনা সামনি দুই চেয়ারে। চলেছে গল্প আর খাওয়া। খোস মেজাজ্ ক্যাপ্‌টেনের। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসা, এত' বড় একটা জোঁটেনা কপালে। সুপ হ'ল, মাখন রুটির সঙ্গে ফ্রাইও শেষ। এবারে রোষ্ট্। কিন্তু একি? রেকাবীটার দিকে নজর পড়তেই মেজাজে আগুণ ধরে যায় সাহেবের। বাজখাঁই গলায় হাঁক দিয়ে ওঠে,'—বুর্চি!' হাঁক শুনে ছুটে এসে দাঁড়ায় বাবুর্চি। আর সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের হুঙ্কার—আউর দোঠো পায়ের কিদার গিয়া?

জী, দোঠো পায়ের থা। উত্তর দেয় বাবুর্চি।

দাঁত খিঁচিয়ে গালাগালি দিয়ে ওঠে সাহেব। কিন্তু বাবুর্চি মানবে না

সে কথা। ভদ্রলোকের এক কথায় আটকে থাকে—দুটো বকের দুটো পা-ই ছিল। শুধু তাই নয়, সাহেবকে বুঝোতে চেষ্টা করতেও কসুর করে না যে বকের একটা ক'রেই পা হয়। তার একটা আছে তরকারীতে আর একটা হ'য়েছে রোষ্ট।

রাগে সাহেবের তখন প্রায় বেসামাল অবস্থা। হয়ত' মেরেই বসত বাবুর্চিকে। শুধু স্ত্রীর অনুরোধকে সম্মান দেখাবার জন্যেই সামলে নিল নিজেকে। বাবুর্চিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল—যাক্ বাবা, এ যাত্রার মত ফাঁড়া কাটল তার। কিন্তু তখন কি আর জানত সে যে ফাঁড়ার ডিমটিকে সমস্ত রাত ধরে তা দিয়ে আরও পুষ্ট ক'রে তুলেছে সাহেব। তাহ'লে হয়ত' পরদিন সকালে আর শ্রীমুখ দেখাতে আসত না সে।

বাড়িতে ঢুকতেই সাহেবের হুকুম—আও হামারা সাথ্।

বেচারীত' অবাক। জেলে দেবে নাকি সাহেব? ভারি ত' মুলো চুরি, তাতেও ফাঁসির হুকুম? জিজ্ঞাসা করে—কাঁহা?

পিছে বোলেগা।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। আবার সেই যোগনের রাস্তা। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে বাবুর্চি যে বড় কঠিন পাল্লায় পড়েছে সে আজ। এখন কিল খেয়ে কিল হজম করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই তার। চুপচাপ মুখ বুজে বসে থাকে। ঝিকি ঝিকি করে এগিয়ে যেতে থাকে ট্রেণ।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছুতেই দেখা যায় জলা জায়গাটার ধারে ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কত বক। কৃচ্ছ্রসাধক ঋষির মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে। ধ্যান গম্ভীর মূর্তি। অনেকটা কাছে ছিল যেগুলি তাদের দেখিয়ে বলে ওঠে বাবুর্চি—দেখিয়ে সাহাব, উ সব চিড়িয়াকো একঠো করকে পায়ের হায়। সাহেব লোকটার দিকে একবার কটমট্ করে তাকিয়েই ছুটে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে। বকের ঝাঁকও নিমেষের ভেতরে ডানা মেলে উড়ে চলে নিরাপদ স্থানের দিকে। পিছনে তাদের দেহ-সংলগ্ন দুটি ক'রে প্রসারিত পা দেখা যায়।

উ দেখ্ উল্লু। উ দোঠো কেয়া হায়? সাহেব এতক্ষণে নিজের কলে ফেলেছে বাবুর্চিকে।

বাবুর্চিও কিছু কম যায় না। মুখ কাচুমাচু ক'রে বলে ওঠে—খানেকো বখৎ আপ্ তালি নেহি বাজায়া।

গল্প শুনে সেলুন সুদ্ধ মানুষ ফেটে পড়ে হাসিতে। বদ্ধ ঘরের ভেতরে বাতাসের তরঙ্গ এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরতে থাকে। বহুদিন এমনভাবে গলা মিলিয়ে হাসিনি আমরা। হাসতে পারিনি একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায়। তার প্রায় এক বৎসর পরে এমনভাবে হাসতে পেরে যেন বেঁচে যাই আমরা। ভুলে গিয়েছি কাকে নিয়ে আরম্ভ হ'য়েছিল এই ঘটনা। নিখোঁজ পায়ের কি হিসাব সে এবারে দেবে। শুধু হেসেই চলেছি। থেকে থেকে উদ্‌গীরণ করে চলেছি বিকট শব্দ। হঠাৎ সেই শব্দকেও ছাপিয়ে দিয়ে চীৎকার করে ওঠে আমীর আলি—হাঁ, খায়া। তো কেয়া হোগা? মারেগা? কাটেগা হাম্‌কো?

না বাবা, না। বলে ওঠে দিনেশ, খেয়েছ, বেশ করেছ। তবে বলে খেলেই পারতে। যাও।

সেই ক্ষমা। হৃদয়ের পরিপূর্ণতার নিদর্শন। শুধু একটা মোরগের পা কেন, ও এখন অনেক কিছুই ত্যাগ করতে পারে হৃদয়ের এই ভাবকে অক্ষুণ্ন রাখবার জন্যে।

তবুও মাঝে মাঝে গুম্‌রে ওঠে। বাড়ি থেকে যে চিঠি আসে তার নামে, তাকে ঠিক চিঠি বলা যায় না। একটি চিরকুট মাত্র। প্রাণভরা তৃষ্ণার মুখে একবিন্দু বারি। কি হয় ওতে! উপরন্তু চিত্ত-বিক্ষেপ বাড়িয়ে তোলে। কয়েকটা দিন কাটে তার বিশেষ এক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে। তারপর আপনিই আবার শান্ত হ'য়ে যায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি আমি।

জাহাজ ফিরে যাওয়ার কথা ছিল ছ'মাসের ভেতরেই। কিন্তু এঁড়ে গরু কিনেই কাল করল তাঁতি। আমাদের ওল্ডম্যানটি। নগদা মুটের কারবার আরম্ভ ক'রে দিলেন তিনি এজেন্টের কথায় রাজী হ'য়ে। এ বন্দর থেকে মাল তোল, ও বন্দরে নামাও। আবার ও বন্দর থেকে ঝুড়ি বোঝাই ক'রে আর এক জায়গায় গিয়ে ঢেলে দাও। কি যে ব্যবসা ওদের বুঝিনা। ভারতবর্ষ থেকে যে সার নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছি ইংলণ্ডে, সেই সারই

আবার অপর এক বন্দর থেকে তুলে এনে ঢেলেছি ভারতবর্ষে। অবশ্য বলা যেতে পারে, বোঝা বইবার কথা, তাতে তুলো আছে কি লোহা আছে, তা দেখবার কথা নয়। কিন্তু পিঠে যে ব্যথা লাগে! ছ'মাসের আর্টিকল্ শেষ হ'তে এক বন্দরে সই করানো হল নূতন আর্টিকিল্‌এ। অর্থাৎ চাকরীর মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়ল। তারপর আবার, আবার। বিক্ষুব্ধ অন্তর সাগর-বেদেদের। লস্করেরা মু িয়ে আছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের মুখের দিকে। সামান্য ইসারার অপেক্ষা। তাহ'লেই গহ্বর-বাসী কোল-ট্রিমার থেকে আরম্ভ ক'রে শিখরাধিপতী সুখানী পর্যন্ত কাছ ছেড়ে এসে দাঁড়িয়ে যেতে পারে মোহম্মদ বিন্-তোগলক ক্যাপ্টেনের রাজপ্রাসাদ ঘিরে। দাবী তাদের একটাই—জাহাজের মুখ ফেরাতে হবে ভারতবর্ষের দিকে।

জাহাজীদের হরিসভা সেলুনও হ'য়ে উঠেছে সরগরম। চেঁচাতে থাকে পিল্লাই—বেটা কাঞ্জিভাঙা শেয়াল, যে বন্দরে নামে সেখানেই কোন গৃহস্থ-বাড়ীতে ঢুকে বৌ জোগাড় ক'রে ফেলে একটা। বেটার নামে খোর-পোষের দাবী জানিয়ে নালিশও করেনা কেউ! তাহ'লেই রসের হাঁড়ি উপুড় হ'ত ওর!

উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি আমাদের ওল্ডম্যান।

ময়লা-সাফ ঠিক এই ধরণের আলোচনার ভেতরে বড় একটা থাকেন না। বয়স হ'য়েছে তাঁর। চল্লিশের কিছু ওপরেই হবে। জৈব চাহিদার চাইতে দায়ীত্ব-বোধটাই তাঁকে চিন্তিত করে বেশী। তিনি বলেন—রসের হাঁড়িটাই বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে, আমাদের বিশ্রাম কোথায়? সব কাজেই সপ্তাহে একদিন ক'রে ছুটি পাওয়া যায়। আমাদের সে ছুটি কেন মিলবে না? জাহাজ ছাড়লে কাজ আরম্ভ হ'ল আর ক'দিনের বিশ্রাম মিলবে সেই ক'লকাতায় ফিরে গিয়ে। সেখানেও যদি এভাবে বাগড়া দেয় ওল্ডম্যান আর এজেণ্ট তাহলে ত' বাড়ী ফেরাই মুস্কিল আমাদের।

বুঝলাম তাঁর কথা। স্পষ্ট ক'রে কিছুই বল্লেন না, রাস্তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন শুধু। জাহাজকে ফেরি নৌকোর মত ট্র্যান্‌সীপ তৈরী ক'রে এই যে বিরাট অঙ্কটি পিটে নিচ্ছে কোম্পানী তার পিছনে আমাদের

বুকের রক্ত কিছু কম যাচ্ছে না। তার হিসাব কোথায়? এই রকমই বোধহয় একটা কিছু বলতে চেয়েছিলেন তিনি। বলতে পারলেন না শুধু পদমর্যাদার বাধায়।

পিল্লাইএর কথা হচ্ছে শ্রীরাধিকা না থাকলে জমতে পারে না পালা-গান। বলে ওঠে—দু'বছরের পালা শেষ হবে গিয়ে লণ্ডনে। লস্কররা ছুটি পাবে। ওল্ডম্যানের ত' একটা ধুম্‌সি আছেই সেখানে। আর আমরা কি একপাল বিধবা? বেলপাতা মুখে দিয়ে বসে আছি?

কি বারে বারে বৌ বৌ করছ? ইচ্ছে করলে তুমিও চলে যেতে পার লস্করদের সঙ্গে। রেগে ওঠেন বালা।

ঠিক আছে, তোমরা থাক তাহ'লে। আমি বাড়ী চলে যাব। স্থির-প্রতিজ্ঞের মত কথাটি বলে আমাদের দিকে তাকায় পিল্লাই। বোধহয় সমর্থনের আশায়। আমি আর দিনেশ তাড়াতাড়ি মুখের ওপর থেকে হাসির ভাবটি মুছে ফেলে মাথা ঝাঁকাই ওর কথায়। জানতে দিইনা, এ্যাঙ্কোনাতে যে ও-ও একটা ঘর বেঁধেছে সেকথা আমাদের অজানা নেই।

কিন্তু ঐ বলা পর্যন্তই। যাওয়া আর তার হয়না। তিলবেরিতে গিয়েই নাড়া খেয়ে গেল জাহাজটা। অশুভ যাত্রা এবারকার। আসবার মুখেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ডেক-খালাসী একজন, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ভূমধ্যসাগরের জল কেটে তখন এগিয়ে চলেছে জাহাজ। রাত্রের খাওয়ার পালা শেষ হ'য়ে যায় সাড়ে আটটার ভেতরে। সেলুন থেকে বেরিয়ে অফিসাররা আর দাঁড়ায় না বড় একটা। যার যার পাওনা ঘুমটুকু আদায় করে নিতে কেবিনে গিয়ে ঢোকে। ইঞ্জিনঘরের জন্যে মার্কা করা লস্করাও পড়ে গড়িয়ে। শুধু ডেক-খালাসীরাই আরও কিছুক্ষণ বাসর জাগিয়ে রাখে তাস নিয়ে বসে। ক্রমে তাদের চোখও ঝিমিয়ে আসে। নিস্তব্ধ হ'য়ে যায় জাহাজ। জেগে থাকে শুধু মাথার ওপরের সুখানী আর ডেক-অফিসার এবং পেটের খোলের ভেতরে ইঞ্জিনীয়ার, লস্কর আর সারেঙ।

রাত তখন প্রায় এগারটা। নীতন্দ্র প্রহরীর মত কণ্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি আর ময়লা-সাফ। নির্বাক মুহূর্তগুলি কেমন ভার মনে হয়। নিস্তব্ধ রাত্রির অসারতা মনের ভেতরটাকেও স্পর্শ করেছে। মনে হচ্ছে কোন এক নিতল লোকের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। মুক্তি নেই সেখান থেকে। মানুষের গলার স্বর শোনবার জন্যে আকুল হ'য়ে উঠেছে প্রাণ। পাশের মানুষটিও হারিয়ে ফেলেছে তার বাক্‌শক্তিকে। শুধু চোখদুটি জেগে আছে। পাঠ ক'রে চলেছে প্যানেলের ইসারা। আমিও পাঠ করতে শিখেছি। বলতে হয়না কিছুই। কাজ ক'রে যাই তার চাহিদা অনুযায়ী। কখন কখন এক ঝলক বাড়ীর কথা মনে পড়ে যায়। বিভাটা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠে। মা উঠে বসেই চুলের মুঠি চেপে ধরে আচ্ছা ক'রে ঝাঁকিয়ে ভাঙিয়ে দেন ওর ঘুমের ঘোর। বেচারী জেগে গিয়ে মাথার যন্ত্রণায় মুখ কাঁচুমাচু ক'রে চেয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে। কখনও বা ঝাঁকি মেরে ওঠে—মারলে কেন? মা ধম্‌কে ওঠেন—ভাল হ'য়ে পাশ ফিরে শো। তারপরই কোথায় হারিয়ে যায় সেই অতি পরিচিত মুখগুলি। দাঁড়িয়ে থাকি এক বিরাট নিষ্ক্রীয় মন নিয়ে। মিনিটের পর মিনিট কাটতে থাকে। এই নিশ্ছিদ্র নৈঃশব্দের বিরুদ্ধে একটানা বিদ্রোহ প্রকাশ করে চলেছে প্রপেলারটি।

ভেবেছিলাম ছেলেটাকে এবার ভাল স্কুলে দেব। তা আর হ'ল না।

একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন ময়লা-সাফ।

আর কেউ নেই? জিজ্ঞাসা করি আমি। অর্থাৎ ওঁর স্ত্রী ছাড়া বাড়ীতে সাহায্য করবার মত আর কোনও পুরুষ ব্যক্তি আছে কিনা তাই ছিল আমার জিজ্ঞাস্য।

না।

থেমে গেলেন তিনি। তবুও বাঁচিয়ে দিলেন আমাকে। এই অসীম নীরবতার চাপ আর যেন সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। এমনিই বুঝি হয়। মানুষ শব্দের পূজারী। ধ্যান-মার্গেও সেই শব্দারাধনা। দৃষ্টি যেখানে পঙ্গু, শব্দই সেখানে অনুভূতি। আমাদের দৃষ্টি গিয়েছে থম্‌কে, এক নিঃসীম নিস্তব্ধতার পাষাণ প্রাচীরে আঘাত খেয়ে। নির্জন 'সেলে'

আবদ্ধ কয়েদীর অস্থিরতা অনুভব করি নিজের বুকে। মনে হয় বুঝি পাগল হয়ে যাব। আর সহ্য করতে পারব না এই অদৃশ্য অব্যক্ত পাষাণ চাপকে। তা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন ময়লা-সাফ। শব্দের তরঙ্গের আঘাতে চিড় খেয়ে গেল নৈঃশব্দের সেই কালো চাপটি। ভাবতে সুরু করলাম। প্রথমেই মনে এল ওঁর ছেলের কথা। চিনুকে দিয়ে ওঁর ছেলের ভর্তি হওয়া সম্বন্ধে কোনরকম সাহায্য করা যায় কিনা ভাবছি, এমন সময় তীক্ষ্ণ এক প্রাণফাটা চীৎকারের শব্দ ভেসে আসে ওপরের দিক থেকে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে এদিক পানে ছুঁড়ে না দিলে ওপরের শব্দ সহজে শোনা যায়না এখান থেকে। কিন্তু সেই তীব্র হাহাকার নিস্তব্ধ রাত্রির সহায়তায় এসে পৌঁছয় এই গহ্বরের ভেতরেও।

যাও, দেখত' কি হ'ল। ময়লা-সাফ বলে ওঠেন।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই ছুটে গিয়ে ওপরে উঠতে থাকে সারেঙ। অপেক্ষা করছি আমরা কি বার্তা নিয়ে আসে সে, তারই জন্যে। ফোন আসে মাস্টারের ঘর থেকে—জাহাজ থামাও।

এ আর এক সমস্যা। থামাও বললেই থামোনো যায়না জাহাজ। এক যন্ত্রের দুই সুর। নদীতে এক, সাগরে আর। সেই সুর উল্টে পাল্টে নিয়ে থামাতে গেলেও লেগে যায় কম সে কম পনের বিশ মিনিট সময়। যাইহ'ক্, হুকুম হ'তেই ডাঙ্কি বয়লারে নিষ্কাষণ আর এক রাস্তা ধরিয়ে অয়েল ফুয়েল বার্ণিং সিস্টেম করতে হয়। ধীরে ধীরে কমে আসে জাহাজের গতি।

একদম থামিও না, সেকেণ্ড বললেন, জাহাজ ঘুরছে।

কেন?

এই ছোট্ট কথাটি জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বুঝতে পারি গলা বুক শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছে আমার। দিনেশ! দিনেশের কিছু হয়নি ত'? এক ঝট্‌কায় সমস্ত কর্তব্য অবহেলা ক'রে ছুটে ওপরে উঠতে যাই। বাধা দেন সেকেণ্ড।

কর্তব্য আগে। দিনেশ নয়, একটি লস্কর ঝাঁপ দিয়েছে জলে।

একট নিশ্চিন্ত হ'তে গিয়েই আবার মনের ওপরে চেপে বসে এক

পাষাণ ভার। জলে ঝাঁপ দিয়েছে? কেন? কি তার ব্যথা? কেন শেষ ক'রে দিল নিজেকে এমন ভাবে? এ কি ধরণের হেরে যাওয়া? প্রশ্ন আর প্রশ্ন। হাজারো প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করছে মনের ভেতরে। ওদিকে ধীরে ধীরে ঘুরে চলেছে জাহাজ। ক্ষিপ্রগতি মৃগের দিক পরিবর্ত্তন নয় এ। স্থূলদেহী গজের পশ্চাৎমুখী হওয়া। ঘুরতেই এক ফার্লং স্থান নিয়ে নেয়।

একটু বাড়িয়ে দাও।

নির্দেশ আসে মাস্টারের কাছ থেকে।

বাড়ে গতি। প্রায় মাইল খানেক এগিয়ে যেতেই ময়লা-সাফ বলেন — এবারে কমাও।

যেমন নির্দেশ তেমনি কাজ। মনের ভেতরে আছাড়ি পিছাড়ি করছে একটিই মাত্র প্রশ্ন। ব্রীজের ওপরকার সিগ্‌ন্যালিং ল্যাম্পের আলোয় তাকে দেখা যাচ্ছে কি? লাইফ-বোট দুটি নামাবার ব্যবস্থা কি করেছে ওরা?

জানবার কোনও উপায় নেই। আর্টিক্‌ল্‌-এর চেনে হাত পা বাঁধা আমি এক সহস্র বৎসর পূর্বের ক্রীতদাস। হুকুম মাফিক দাঁড় টেনে চলেছি। চোখের চাবুক নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে ময়লা-সাফ। সামান্য অবহেলায় রিপোর্টের গায়ে সেই চাবুকের দাগ কেটে বসবে 'অমনযোগী ইঞ্জিনীয়ার' বলে। সমস্ত অস্থিরতাকে প্রাণপণে চেপে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকি পরবর্তী নির্দেশের জন্যে।

এক সময়ে আসে সে নির্দেশ। কর্তব্যের নয়, মুক্তির।

যাও, দেখে এস। বলেন ময়লা-সাফ।

প্রথম শব্দটির পর আরও দুটি শব্দ যখন কানে আসে তখন আমি সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে।

কিন্তু এ হুকুম না পাওয়াই ছিল ভাল।

দু'খানা লাইফ-বোটই ভেসেছে জলে। সিগ্‌ন্যালিং ল্যাম্পের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বোট দু'খানির ওপরের অন্বেষণকারী লস্করদের চেহারা। এখানে ওখানে কতকগুলো লাইফ-বেল্ট ভাসছে। জ্বলছে তাদের

ইন্‌ডিকেটার ল্যাম্পগুলি। জাহাজের রেলিঙ ধরেও ঝুঁকে পড়েছে অনেকগুলি উৎকণ্ঠিত মানুষ। এধারে হ্যাচের পাশের সরু গলিপথটুকুর ওপরে সমানে বুক চাপড়ে চলেছে খেটার মিঞা। তাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে দিনেশ, বালা এবং চীফ ডেক অফিসার নায়েক। ধীরে ধীরে জাহাজ ঘুরছে। এধারে ওধারে। সঙ্গে আলোর রেখাও ঘোরে। অনেকটা দূরে এগিয়ে গিয়েছে বোট দুটি। সাড়া জাগিয়ে চলেছে অবিরত। আর বিস্তৃত আলোর রেখার বাইরেও চোখ চালিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে ঐ কালোর ভেতরেও একটি কালো মাথা দেখা যায় কিনা।

হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি বারোটা বাজতে পাঁচ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াই বালার পাশে।

সার!

কে? ওপরদিকে মুখ তুলে তাকান বালা।

বারটা বাজতে পাঁচ। সময়টা মনে করিয়ে দিই আমি।

ও। দিনেশ, মিঞা থাকল। দেখ। আমার ডিউটির সময় হ'য়ে গিয়েছে।

চলে যান বালা। আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে খেটার মিঞার পাশে বসি আমি। হাত বুলিয়ে দিতে থাকি সদ্য পুত্র শোকাতুর বৃদ্ধের গায়ে। এতক্ষণ ধরে দাপিয়ে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। ধারা বয়ে চলেছে তার চোখের কোল বেয়ে। আমারাও একটু নিশ্চিন্ত। যাক্, শোকের প্রথম ধাক্কাটা সহ্য ক'রে নিতে পেরেছে মানুষটা। এমন সময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় মিঞা—আঁই যাইয়াম্, আঁই যাইয়াম্। লাফিয়ে উঠতে যায় রেলিঙের ওপরে। দু'জনে মিলে কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখি তাকে। দিনেশকে বলি—চল্, ওকে ঘরে নিয়ে যাই। বাইরে রাখাটা যুক্তি সঙ্গত হবে না।

এইভাবে ওকে পাহারাই বা দেবে কতদিন? প্রশ্ন করেন নায়েক।

তাই বলে ওকেও ওর ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে নাকি? ওপরওয়ালা বলে খাতির ক'রে কথা বলা দিনেশের কুষ্ঠিতে লেখা নেই।

কেঁদে চলেছে খেটার মিঞা—আমরার আর ভাস্তি নাই। আমারে

ছারি দ্যান, আমারে ছারি দ্যান। বলতে বলতেই হঠাৎ এক ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটে গিয়ে ঠেলে উঠতে থাকে লস্করদের ঘরের মাথার ওপরে। মুখে তার এক চীৎকার—আঁই যাইয়ামরে কফিল, খাড়াইয়া যা—

এত জোরে যে ছুটতে পারি আমি তা এব পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জানা ছিল না। তীর বেগে ছুটে গিয়ে ঠেলে উঠেছিলাম লস্করদের ঘরের মাথায়। তারপরই বিরাট এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যা চেপে ধরতে পেরেছিলাম তা হচ্ছে থেটার মিঞার দু'খানি পা। উল্লম্ফিত দেহখানি তার পিছনের টানে আর এগিয়ে গিয়ে সলিল সমাধি লাভ করতে পারেনি। পরিবর্তে আছড়ে পড়েছে ছাতের ওপরেই। আর তারই আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে থেটার মিঞা।

আরও কয়েকজন উঠে এসেছে ওপরে। তাদের ভেতর থেকেই কে একজন বলে ওঠে—এ বরঞ্চ হ'ল ভাল।

তারপর কয়টি দিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি থেটার মিঞা। ডেক খালাশীরাই পালা করে সেরে দিত তার কর্তব্য কাজটুকু। আমরাও মাঝে মাঝে যেতাম তাকে দেখতে। নির্বাক দুটি চোখে সে তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে। সেই সব-হারাণো দৃষ্টির উপমা আমার অভিজ্ঞতার মাল-খানায় নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারতাম না তার সেই চেয়ে থাকাকে। মনে হ'ত ছুটে পালিয়ে যাই সেখান থেকে। পারতাম না। দু'খানা দুর্বল হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরত আমার হাত। বুঝি বুঝতে পারত আমার মনের কথাকে, তাই। কিন্তু ভুলেও বলত না কখন এই দুর্ঘটনার কারণটি কি। হয়ত' পুত্রের কথা ভেবেই বুকের আগুন পুষে রেখে নিজেকে ধিকি ধিকি জ্বালিয়ে যাচ্ছিল সে। ছেলে চাইত না তার কথাকে পাঁচকান করতে। তার অবর্তমানে তারই কথা কেমন ক'রে বলবে তার বাপ!

আর এক ধাক্কা খেলাম তিলবেরিতে এসে। থামবে এখানে জাহাজ।

বেশ কয়েকদিনের জন্যে। শুধু জড় পদার্থ নয়, সজীব পদার্থগুলিরও একটি ব্যবস্থা হবে। দু'বৎসরের যাত্রা শেষ হ'তে আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকী। সেটুকুও চলে যাবে মাল নামানো ওঠানোতেই। তারপরই আসবে হিসাবের পালা। আইন অনুযায়ী লস্করদের আর রাখা যাবে না জাহাজে। ছুটির ওয়ক্ত এসে গিয়েছে তাদের। প্লেনে চড়ে ফিরে যাবে বাড়ী। খরচ কোম্পানীর। বদলী দলও এসে পৌঁছুবে ইতিমধ্যেই। তারাই হবে আমাদের নতুন সঙ্গী। আপন ইচ্ছাধীন শুধু আমরা—অফিসার ও ইঞ্জিনীয়ারের দল। থাকা এবং যাওয়া কোনটাতেই আপত্তি নেই কোম্পানীর। শুধু আগে থেকে একটু খবর চাই। একজন দুইজন একটু গাঁই গুঁই করেছিল ইংলিশ চ্যানেলে পড়বার মুখে। আর সকলের ধম্‌কানি খেয়ে চুপ মেরে গিয়েছে। তাছাড়া মাস্টারের সঙ্গে একবার কথা হ'য়ে গিয়েছে এ বিষয়ে। তিনি বলেছেন—দু'মাসের ভেতরেই আমরা ভারতবর্ষে ফিরে যাব। তাই যদি হয়, তাহ'লে শুধু শুধু এ কয়টি দিনের জন্যে লোক হাসান কেন? চুপ মেরে গিয়েছে গাঁই গুঁইএর দল।

মনটা যেন প্রজাপতি। রঙীন ফুল দেখলেই নেচে ওঠে। শরীরে যত একটু করে বল পাচ্ছি ততই সেই প্রজাপতিটার কল্পনার পাখা হচ্ছে দীর্ঘতর। আমি আর যাই না, দিনেশই আসে আমার কাছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করি তাকে, দেখবার কি কি আছে। শুনে হো হো ক'রে হাসে সে। বলে—কিচ্ছু নেইরে, কিচ্ছু নেই। বলেই গম্ভীর হ'য়ে যায়। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা ব্যক্ত করবার মত গম্ভীর হ'য়ে বলে—তবে হ্যাঁ, দেখবার আছে বৈকি। হাইড পার্ক। নামে বড় গরমিল। একদম উদ্‌লো কিন্তু নামে হাইড! যাও সেখানে। দেখবে সব আছে। বেঞ্চে বেঞ্চে কপোত কপোতী। তাদের পাশেই বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে কোনও বিরহী যক্ষ। ওধারে সংসার সুখের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে কোনও গৃহকর্তা এসে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে পড়েছে একটি বেঞ্চ জুড়ে।

একবার আরম্ভ হ'ল তো আর থামবার নাম নেই। বক্‌ বক্‌ ক'রে যেতে থাকে সে। পাশ ফিরে শুই আমি। মনের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে গোটা লণ্ডন সহরটা। দর্শণ-যোগ্য স্থান সব সহরে একটা দুটো থাকেই।

পুরানো সহর হ'লে ঐতিহাসিক নিদর্শনও কিছু মেলে। সে দেখায় চোখ ভরতে পারে, মন ভরে না। টিউব লাইন লণ্ডনে আছে, রাশিয়াতেও আছে। কি আসে যায় তাতে? এ নিয়ে মাথা ঘামে না আমার। আমি দেখতে চাই আরও কিছু। কোন শক্তিতে একমুঠো দেশের মানুষ গিয়ে এতদিন ধরে রাজত্ব ক'রে এল এতবড় একটা দেশের ওপরে। সে শক্তি স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরেরও ছিল না। তিনি যদি যুদ্ধং দেহী বলে তাঁর নৌবহর পাঠাতেন ভারত অভিযানে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে নৌবহরের একটিও আর ফিরে যেত না ভগ্নদূত হ'য়ে। এত' তা নয়। এ যে আমাদেরই মত সাধারণ মানুষের কীর্তি। সৎ এবং অসতের এক অদ্ভুত যোগসাজস। সৎ তৈরী ক'রে গিয়েছে পথ। অসৎ সেই পথ ধরে গিয়েছে এগিয়ে। কিন্তু আমরা? এই গজবপুর ঈষীকা কি ছিল এতই ক্ষুদ্র যে সে বিপদের চিহ্নটুকুও তার চোখে ধরা পড়েনি? অথবা অহমিকার ভেষজগুণে শুভাশুভ জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটেছিল তার?

কিরে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? ধাক্কা দেয় দিনেশ।

না।

এপাশ ফিরি আবার। সমানে দুলে চলেছে জাহাজ। বেঁচে যাই থেমস্-এর ভেতরে ঢুকতে পেলে।

মার কাছে একখানা চিঠি লিখলাম, তোর নামে দোষ দিয়ে।

না পড়েও বুঝতে পারি কি সে লিখেছে। হেসে ফেলি ওর দোষা-রোপের কথায়। বলি—পাপ করবি তুই, দোষ চাপাবি আমার ঘাড়ে?

ওটা লজ্জা ঢাকবার একটা ছল মাত্র। শোন—

পকেট থেকে চিঠিখানা বের ক'রে পড়তে থাকে ও।

শ্রীচরণকমলেষু,

মা!

সাগর বেদে আমি। কূলের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে সেটুকুও না থাকারই সামিল। কোথাও মাটিতে পা পড়ে, কোথাও বা তাও পড়ে না। অসহায় এক নিরস নিরুদ্দেশ যাত্রা। এ জীবনকে মুখে বলে বোঝান যায় না মা। স্বপ্ন-ভাঙা চোখ নিয়ে যখন

তাকাই নিজের দিকে তখন বিষাদ আর বিস্বাদে ভরে যায় মনখানা। শুধু মনে হয়, এর চাইতে ট্রামে বাসে বাদুর-ঝোলা হ'য়ে কেরানীগিরি করাও বরং ছিল ভাল। তবুও ত' কর্মক্লান্ত দিবসান্তে মার কাছে গিয়ে একটু বসতে পারতাম। পারতাম নিমকির খোঁপাটা ধরে একটু নেড়ে দিতে। কিন্তু তোমার চিঠি ক্রমেই ছোট হচ্ছে মা। নাকি, আমিই ছোট হ'য়ে যাচ্ছি তোমার কাছে? ভয় হয় মা, বড় ভয় করে। সমস্ত খবর দিয়ে বড় ক'রে চিঠি দেবে।

কত বড়রে? বাধা দিই আমি ওর চিঠির পৃষ্ঠা কয়টির দিকে তাকিয়ে।

ধ্যেৎ, বড় কোথায়? মোটে ত' তিন পাতা।

ঐ জন্যেই তোর মা এক লাইন লেখেন। তুই এক কথায় সেরে দে। দেখবি তোর চিঠি আসছে এক একটি রামপট। বলায় পেয়েছে আমাকেও। উঠে বসি বলবার উত্তেজনায়—দেখ্, 'না হলেও চলে' এ ভাব না দেখালে মা মাসী বৌ বোন কারও টানই পাওয়া যায় না। যত এড়িয়ে যাবি, ওরা তত টানবে। এটা ওদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট।

আরও খানিকটা বক্তৃতা হয়ত' দিয়ে ফেলতাম। ওর হাঁ করা মুখখানির দিকে নজর পড়তেই থেমে যায় বলা। নিজেরই কেমন লজ্জা লজ্জা করে। ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে বলি—যা তা বলে ফেললাম।

ও কিন্তু আল্‌তো ভাবে নেয়নি আমার কথাটা। গম্ভীরভাবে বলে—না রে, তোর কথাই বোধহয় ঠিক। বলেই উঠে দাঁড়ায়। চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে বলে—রাখ্ এখানা। কেটে কুটে ঠিক করে দিবি। আমি ভাল ক'রে লিখে পাঠাব।

চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বেরিয়ে যায় দিনেশ। একলা ঘরে লজ্জাটা ক্রমে আফসোসে পরিণত হ'তে থাকে আমার। ছি ছি, ছেলেটার এতখানি উচ্ছ্বাসের একেবারে মুড়ো মেরে দিলাম আমি। অথচ কোনই দরকার ছিল না এর। সে যদি তার মাকে তিনপাতা চিঠি লেখে, তাতে আমার কি? শুনতে ভাল না লাগে অন্য কথা পাড়লেই হতো। অনুতপ্ত মন নিয়ে চিঠিটা খুলে বসি প্রায়শ্চিত্ত করতে। মনস্থির ক'রে নিই, ওর লেখার যতখানি সম্ভব রেখে দেব।

লাইনের পর লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে চোখ। কিছু নয়, শুধু মনকে মেলে ধরা। যে দিনেশকে দেখেছি জাহাজী আবহাওয়ায়, দিগন্ত বিস্তৃত জলধির বুকে সামান্য পত্রের অবলম্বন নিয়ে ভাসমান পিপীলিকার ন্যায় জীবনে, এ সে দিনেশ নয়। এর প্রতি ছত্রে কাঙালীপনা। আবার তার মাঝে মাঝে আমিও ঢুকে গিয়েছি, দেখছি। প্রয়োজন নেই। সোজা কলমের আঁচড় টেনে দিই আমার ওপর দিয়ে। তারপর আবার এগুতে থাকে চোখ। দুটি পৃষ্ঠা এইভাবে শেষ করবার পর তৃতীয় পৃষ্ঠায় গিয়ে ঝপ্ ক'রে লিখে বসেছে—

মা! অশোক বারে বারেই বলছে বিয়ে করতে। বলছে, এখন বিয়ে না করলে বুড়ো বয়সে কে আর মেয়ে দিতে আসবে? বোধহয় আমার বয়সের দিকে তাকিয়েই বলছে কথাটা। তাহ'লেও তোমার যা ইচ্ছা তাইতো করব আমি। ওরা যা ইচ্ছা তা বলুক গিয়ে। তোমার চিঠির আশায় রইলাম। সহস্র কোটি প্রণাম নিও।

ইতি

তোমারই চরণাশ্রিত

দিনেশ

চিঠি পড়ে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। যৌবন পার ক'রে দিতে বসেছে যে, আমার আড়ালে থেকে সে তার মাকে জানাচ্ছে বিয়ের কথাটা। আজকের দিনে একটা তের কি চোদ্দ বছরের মেয়েও বোধহয় এতটা লজ্জা পায় না। আর দুঃখ হয় এইজন্যে যে নিখাদ ভালবাসা বড় দুর্বল। সামান্য আঘাতও সহ্য হয় না তার গায়ে। সে আঘাত যদি কোনদিন সত্যিই আসে? যাই হ'ক, ঐ সামান্য দু'এক লাইন কেটে যত্ন ক'রে তুলে রাখি চিঠিখানা। সে এলে ফেরত দেব তাকে।

ফেরত দেওয়া কিন্তু আর হয়নি। ডিউটি পড়ে যাওয়ায় আসতে পারেনি দিনেশ। ছুটি পেল থেমস্-এর মুখে পাইলট এসে জাহাজে উঠতে। ঘুমে দু'চোখের পাতা এঁটে আসছে তখন তার। তবুও

আমার ঘরে এসেছিল। কি একটা কথা বলতে বলতেই সেটির ওপরে পড়েছিল গড়িয়ে। তারপরই তার নাক ডাকতে আরম্ভ করেছিল। আমিও জাগাইনি তাকে। কয়টি দিন ধরে যে দুলুনি সহ্য করেছে তারই শ্রান্তিতে এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার জেগে ওঠবার অপেক্ষায় বসে থাকি।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসে আমার দিকে তাকিয়েই বলে ওঠে—হাসছিস্ যে ?

তিলবেরি পৌঁছে গিয়েছি আমরা।

কথা শুনে একবার আমার আপাদমস্তক দেহের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নেয় ও। পুরোদস্তুর ইংরিজি পোষাক। মায় গলার টাইটা পর্যন্ত।

আমাকে জাগাস্‌নি কেন ? ধম্‌কে ওঠে সে।

ঘুমটার প্রয়োজন ছিল তোর। উত্তর দিই আমি।

ধেত্তেরি তোর ঘুম। চিঠি আসবে আমার—বলেই ঘর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যায় সে।

চিঠি আসবে এবং এলে পাবই সেটা। তাই ও নিয়ে লাফাঝাঁপি করিনা আমি। সে কথা ওকে কতবার বলেছি। শুনেছে, বুঝেছে, তবুও পারেনি নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে। হয় এ রকম। এও এক ধরণের স্নায়বিক দুর্বলতা। একবার এক বন্দরে জোর করে আটকে রেখেছিলাম ওকে। যেতে দেব না পার্সারের কাছে। তাতে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল ও। সেই থেকে আর আটকাই না। সামান্য একখানা চিঠির ব্যাপার। আট্‌কে আর কি হবে ?

অপেক্ষা করছি দিনেশের জন্যে। বাইরে থেকে একবার ঘুরেও এসেছি। বন্দরের মাথার ওপর দিয়ে বিহঙ্গ-চক্ষুতে লণ্ডন সহরটিকে কেমন দেখা যায় তাই জানবার চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। ইমারতের বাধা, দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল। নগরীর ঐ বড় দোষ। চোখের ওপর পর্দা টেনে রাখে। ঘুরে এসে আবার বসেছি ঘরে। ও না এলে বেরুতে পারছি না। অবশ্য যাব না বেশীদূর কোথাও। শুধু পায়ের গিঁট ভেঙ্গে

আসা। একটানা একশ’ গজও হাঁটিনি বহুদিন। থেকে থেকে বিরক্তি ধরে উঠছে। ছেলেটা কি আবার ঘুমোতে আরম্ভ করল নাকি? উঠতে যাচ্ছি ওর ঘরের দিকে যাব বলে, এমন সময় পার্সারের আবির্ভাব। চিঠি দিতে এসেছে ভেবে হাত বাড়াতেই সে বলে—চিঠি নেই আপনার। একবার দিনেশবাবুর কাছে যান।

কেন, কি হ’ল তার আবার? উৎকণ্ঠিত হ’য়ে উঠি আমি।

একখানা চিঠি এসেছে। সেটা পড়বাব পর থেকেই কি রকম হ’য়ে উঠেছে। যত আক্রোশ—

আর শোনবার মত ধৈর্য থাকে না আমার। একরকম ধাক্কা মেরেই তাকে সরিয়ে দিয়ে ছুটে চলতে থাকি ওপরের সিঁড়ির দিকে।

স্থির শান্ত ঘরখানি থম্ থম্ করছে এক অনাকাঙ্খিত নিস্তব্ধতায়। বিছানার ওপরে বসে রয়েছে দিনেশ। স্ফীত চোখদুটিতে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অভাব। তাকিয়েই আছে শুধু, দেখছে না কিছুই। তার পাশে বসে রয়েছে পিল্লাই। আর একপাশে দাঁড়িয়ে ডেক খালাশী কানাই। আমার পিছন পিছন আরও কয়েকজন এসে ঘরে ঢোকে। পার্সার বোধহয় সব কয়টি কেবিনই ঘুরে এসেছে এর ভেতরে। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াই দিনেশের সামনে।

মাথায় যন্ত্রণা বোধ হচ্ছেরে?

উত্তর নেই কোন। এমন কি একবার তাকায়ও না আমার দিকে। এ ধরণের অন্যমনস্কতা শুভ লক্ষণ নয়। ভয় পেয়ে ওর গা ধরে ঝাঁকি দিতে থাকি— দিনেশ, এই দিনেশ—

সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে ওঠে সে—মেরে ফেল। কেটে ফেল ওদের।

ছুটে বেরুতে যায়। দু’হাতে বুকের ভেতরে জাপটে ধরি ওকে। জোর করে বসিয়ে দিই বিছানায়। তাও কি সহজে পারি। পিল্লাই এবং কানাই সাহায্য করাতেই সম্ভব হয়। বসিয়ে দিয়ে ভাবতে থাকি এখন কি করব আমি একে নিয়ে। যে রকম অবস্থা, তাতে কখন কি

ক'রে বসে তার ঠিক নেই কিছু। কড়া পাহারায় রাখা ছাড়া উপায় নেই। কে দেবে সেই পাহারা? ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে মাথার ভেতরে। তাকাই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির মুখের দিকে। যদি কোনরকম সাহায্যের কথা বলেন তাঁরা। দেখি ভিড় ঠেলে টুক্ টুক্ ক'রে এগিয়ে আসছে থেটার মিঞা। যাঁরা দাঁড়িয়ে, তাঁদের প্রায় সকলেই অফিসার। তাঁদের ভেতর দিয়ে এমনভাবে এগিয়ে যাবে একজন লস্কর, হয়ত' এটা পছন্দ হ'ল না কারও কারও। তুমি আবার কোথায় যাচ্চ?—বলে উঠলেন একজন। একটু দাঁড়াল মিঞা। বলল—যাই না বাবা, এট্টু দেইখাম্। আবার এগুতে থাকে থেটার মিঞা। এগিয়ে এসে দাঁড়ায় আমার পাশে, দিনেশের সামনে। নিজের তুর্বল হাত তু'খানির ভেতরে ওর হাত তুটো তুলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে—বা-জান্, আমরার জন্যি তুঃখুই শুধু লিখ্ছে খুদা। লড়াই করি তাক্ জানাই দিয়াম্—তুমি খুদা, আঁরাও মানুষ! খ্যাল্না না, ফ্যাল্নাও না। কি কও, বা-জান্? একটু থামে মিঞা। তারপর আবার বলে—তুমি বলো ওইয়া ওঠোত্ তো আঁরা একলগত্ কইলকাত্তা যাইয়াম্। এ্যাঁ বাবা, বালো ওইবাতো?

থেমে যায় থেটার মিঞা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দিনেশের মুখের দিকে। আমরা নির্বাক নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছি ঐ বৃদ্ধটির মুখের দিকে। তিয়-ওক্ত নমাজ পড়া এক পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ সান্ত্বনার ভেতর দিয়ে একি এক বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে গেল তার খোদাতাল্লার বিরুদ্ধে! একা নয়, তুঃখবাহী সমস্ত মানুষের সঙ্গে সে কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াতে চায় ঐ আসমানের দিকে আঙ্গুল তুলে—সাবধান্! তুমি একা, আমরা সহস্রকোটি।

একটা টানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে মিঞা—খুদা রহম করে। তারপর ধীরে ধীরে দিনেশের হাত তু'খানি নামিয়ে দিতে গিয়েই চম্কে ওঠে। একখানা হাত আমার সামনে মেলে ধরে বলে—ইটা কি বাবা? খৎ? তাকিয়ে দেখি কাগজ এক তা। দলা পাকানো। দিনেশের হাতের ভেতরেই ছিল বোধহয় এতক্ষণ। লক্ষ্য করিনি। বৃদ্ধের হাতের

সঙ্গে বেধে এসেছে। নিয়ে নিই কাগজখানা। ভাল করে মেলে ধরতেই দেখি একখানা চিঠি। লিখেছে ওর মামা। এই মামার কীর্তির কথা একদিন বলেছিল দিনেশ। আজও আবার সেই! তাহ'লে এটাই কি ওর এই দুর্দশার কারণ? তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে যাই চিঠিখানার ওপর দিয়ে।

একি কথা লিখেছে ওর মামা! সত্যি হ'লেও এ ধরণের খবর কখন দূর-প্রবাসী কাউকে দিতে হয়! বাড়ীতে ফিরে গেলেই ত' জানতে পারত সব। তাতে হয়ত' এ অবস্থাও হ'ত না তার। ওর মাও কি এতই স্বার্থপর! যাকে পেটে ধরল সেই সব? আর যে হেদিয়ে মরল সারাটা জীবন ওদের জন্যে, সে কিছুই নয়? এই জন্যেই কি মায়ের নামে বাড়ীটা করিয়েছিল ও? আর এই মেয়েটিকেই কিনা বোন বলে এতখানি ভালবেসেছিল ছেলেটা! কামনার আগুনের এতই দপ্‌দপানী যে দাদার কথাটা একবার ভুলেও ভাবল না। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল পাড়ার পাপ সেই ছোঁড়াটিকেই! আশ্চর্য! ওর শালীনতা বোধেও বাধল না একটু! আর মা-ই বা কেমন ধরণের মানুষ! ঐ মেয়ে-জামাইকেই কিনা সেধে সেধে ঘরে এনে তুলল! তাতেও কর্তব্যের শেষ হ'ল না তার? শেষে মেয়ের নামে উইল করে দিল বাড়ীটা! যার বুকের রক্ত দিয়ে গাঁথা হ'ল ঐ বাড়ীটার প্রতিটি ইঁট, তার মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও পর্যন্ত রাখল না! বলবার কিছু আর নেই আমার। আইনেরও নেই। এখন কথা হচ্ছে একে নিয়ে কি করি?

কি আছে হে চিঠিতে? দরজা-গোড়ায় দাঁড়ানো চীফ জিজ্ঞাসা করেন।

সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলি ঘটনাটা। সামনেই দাঁড়িয়েছিল থেটার মিঞা। হাঁ ক'রে প্রতিটি কথা যেন গলধঃকরণ করতে থাকে। আমি থামতেই বলে ওঠে—মাইয়া মাইন্‌ষেরে বিশ্বাস না কইরো রে বাপ। আঁর কফিলেরে খাইছে। এক্কেরে গিল্যা খাইছে।

হাঁফরের মত বুকটা একবার ফুলে উঠেই দীর্ঘশ্বাসের বোঝাটা নামিয়ে দিয়ে খালি হয়ে যায়। খুদা মেহেরবান্, বলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে মিঞা দরজার দিকে।

লণ্ডন সহর দেখা উঠল মাথায়। ক্যাপ্টেনের পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের চীফকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম এক মানসিক রোগের হাসপাতালে। ডাক্তার বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনলেন সমস্ত ইতিহাস। তারপর মন্তব্য করলেন—আঘাত খেয়েছে যাদের কাছ থেকে তাদের ভালবাসাতেই আবার সেরে উঠতে পারে রোগী। এখানে ওকে রেখে দেখা যেতে পারে কিছুদিন, কিন্তু খরচ বহন করবে কে? এ প্রশ্নের আর জবাব নেই। বাধ্য হয়েই ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। নতুন লস্করের দল এসে পৌঁছুবার পর যেদিন পুরানো দল বিদায় নিয়ে চলে বিমান বন্দরের দিকে, সেদিন আমরাও কয়েকজন যাই দিনেশকে সঙ্গে নিয়ে। কয়েকজন খালাশীর ওপরে ভার দিয়েছি আমরা, যত্ন ক'রে নিয়ে গিয়ে ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবে। বার বার ক'রে বলে দিয়েছি সাবধানে নিয়ে যাওয়ার কথা। তবুও মন মানে না। এয়ার হোষ্টেসকেও অনুরোধ জানাই ওর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে। একে একে সকলে বিদায় নিয়ে উঠতে থাকে প্লেনে। সারেঙ ধরে নিয়ে যায় ওকে। কলের পুতুলের মত অভিব্যক্তিহীন মুখে সিঁড়ির ধাপের পর ধাপ উঠতে থাকে ও। একবার ফিরেও তাকায় না আমার দিকে। নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়ে প্লেন। লস্কররা হাত নাড়িয়ে বিদায় জানায় আমাদের। আর তাদেরই একজন অফিসার নিশ্চপ বসে থাকে একটি জড়মূর্তির মত। সুস্থ চেতনা হারা।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। তার পূর্বে পৃথিবীর বুকে আরও বার দুই তিন জাহাজ যাত্রা হ'য়ে গিয়েছে আমার।

ত্রিয়েস্তের পালা শেষ হ'তেই নেমে আসি আমরা এ্যাঙ্কোনায়। গ্রীক শব্দ এ্যাঙ্কোন থেকে এই সহরের নামের উৎপত্তি। যার অর্থ হচ্ছে কনুই। ছোট্ট সহর। কিন্তু এমন সুন্দর ভাবে সাজান, দূর থেকে দেখলে মনে হয় বাড়ীগুলি সমুদ্রের বুকে ঝুঁকে পড়া এক একটি ঝুল-বারান্দা। সহর ছোট হলেও মোটরযান ও ট্রেণ-এর যোগসূত্র টেনে নিয়ে গিয়েছে রোম, মিলান, ভেনিস, উত্তর ও মধ্য ইটালীর আরও অনেক

সহর পর্যন্ত। দেখে বেড়ান যায় চোখ জুড়োন দৃশ্যগুলি। ইটালীতে বৎসরের সব সময়েই দেখবার মত কিছু না কিছু থাকেই। এটা নাকি ও দেশের অহঙ্কার।

জাহাজ থামবে এখানে বেশ কয়েকটা দিন। মাল নামবে জাহাজ খালি ক'রে, তারপর আবার উদরস্থ করবে কিছু। তবে ঘুরবে প্রপেলার।

গায়ে বাতাস লাগাবার মত মন নিয়েই একদল বেরিয়ে পড়েছি রাস্তায়। আসেনি শুধু তিনজন ইঞ্জিনীয়ার। চীফ, ময়লা-সাফ অবনী মিত্র আর মজুমদার। খেয়ালীরামের ঘটনার পর থেকে মজুমদার বড় একটা মেশেন না আমাদের সঙ্গে। চলেছি সহরের ভেতর দিয়ে। দেখতে দেখতে। বোরখাও নয়, ঘোমটাও নয়, নিটোল স্বাস্থ্যের প্রদর্শনী ক'রে পথ বেয়ে চলেছে মেয়েরা। ছেলেরা চলেছে তাদের সর্বাঙ্গ কোট-প্যাণ্টে ঢেকে। রাস্তার দু'ধারে দোকানের সারি। কপালে নামের লেবেল আঁটা। অর্থ বুঝি না তার। পণ্যদ্রব্য দেখে বুঝে নিতে হয় কিসের দোকান। আমাদের ক'লকাতার নিউমার্কেট নয়। পদার্পণ করবার জন্যে চারপাশ থেকে অনুরোধের ঝড় বয়ে যায় না। সবই কেমন শান্ত গম্ভীর। ঠিক ধরতে পারছি না নাড়ীটিকে। ত্রিয়স্ত্‌কে তবুও কিছুটা বোঝা গিয়েছিল। এরা আরও চাপা। বুকের জ্বালা মুখে প্রকাশ হ'তে দেবে না কিছুতেই। হঠাৎ জুনিয়ার থার্ড ইঞ্জিনীয়ার বাক্ বলে ওঠে—পিল্লাই পালিয়েছে।

ঘুরে দেখি সত্যিই তাই। কখন নিঃসাড়ে টুপ্‌ ক'রে খসে পড়েছে আমাদের এই গুচ্ছএর ভেতর থেকে।

শেয়াল বুঝি ছাগল ছানার খোঁজ পেয়েছে—একজন বলে।

কথাটায় রসের গন্ধ পেয়ে দু'একজন খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে হেসে ওঠে বটে কিন্তু সকলে যোগ দেয় না সে হাসিতে।

শুধু শুধু ঘুরে কি হবে? বাক্ বলে ওঠে, তার চাইতে চল মেরিন্ ক্লাবে বসে গলা ভিজোন যাক্।

বাস্, ভাগাভাগি হ'য়ে গেল দল। বিশেষ কথাও উঠল না এ নিয়ে। ওঠবার কিই বা আছে? সকলেই জানে পালিয়ে গেল ওরা। সহ্য

করতে পারছিল না আর এ্যাঙ্কোনার রাস্তায় চলা ফুটন্ত, আধ-ফুটন্ত তরুণীদের। পঞ্চশরের আঘাতে জর্জরিত ওরা খালি ক'রে চলবে বোতলের পর বোতল। যতক্ষণ না ঝিমিয়ে আনে সমস্ত উত্তেজনা। ওদের বুঝি, বুঝতে পারি না বালা আর নায়েককে। পঞ্চগুপ্তির মত এক কঠিন আবরণে ঢেকে রেখেছেন আপন মনটিকে। কখন কি সুরে বাজছে, বাইরে থেকে তিলমাত্র অনুমান করবার উপায় নেই। বড় সহজ কাজ নয় এই আত্মগুপ্তি। স্বভাবগতভাবেই মানুষে খোঁজে মনের মিল। যার কাছে নিশ্চিন্তে মেলে ধরা যায় আপন মনের পাতাখানি। সহানুভূতি এবং সমর্থনের আশায় চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে। বালারা অন্য ধাতের মানুষ। বাহ্য জগতের কাজ কারবার দেখেই ওদের বিচার করতে হয়। মনের দিকে হাত বাড়াতে গেলেই ফোঁস ক'রে উঠবে তার সজাগ প্রহরীরা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন বালা। বলেন, তোমরা যাও, আমরা কয়েকটা দোকান ঘুরব।

বিদায় নিলেন বালা এবং নায়েক। হারাধনের দশটি ছেলের ভেতরে ঠেকেছি দুটিতে এসে। এখন এ দুটি আবার ভেক মারতে গিয়ে এক না হ'য়ে যায়, সেই হচ্ছে ভয়। ওরা চলে যেতেই দিনেশ বলে, চল্, পাসেটোতে যাব।

বুঝতে পারি না কথাটা। ও বুঝিয়ে বলে, সুন্দর একটি স্নানের জায়গা। সহরের শেষ সীমানায়। চল্ যাই।

রাজী হ'য়ে গেলাম ওর কথায়। জানতাম না তখন যে হারাধনের দুই ছেলে একরকম ভেক মারতেই চলেছে এবারে।

পায়ে পায়ে শেষ ক'রে নিয়ে আসতে থাকি এ্যাঙ্কোনা সহরকে। হঠাৎ মনে পড়ে আবার ভজহরির কথা। মুছতে পারছেন না সেই কালো দাগটিকে। মোছা সম্ভবও নয়। অন্ততঃ যাদের আছে একটু স্পর্শ-কাতর মন। যাদের ওটুকু নেই তাদের চক্ষুলজ্জারও বালাই নেই। নিজের দুষ্কর্মের কথা শুনে নিজেই হয়ত' হ্যা হ্যা ক'রে হেসে উঠত, তারপর আবার চেষ্টা করত সকলের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে। মজুমদার তা পারেন নি। নিজের

লজ্জা ঢাকতে খেয়ালীরামের দাবীও মিটিয়েছিলেন। নিজের পারমিটে হুইস্কির বোতল আনিয়ে চুপি চুপি দিয়েছিলেন ওকে। তবুও মুখ রক্ষা হয়নি তাঁর। জীবনের জমা খরচের খাতায় এটা একটা বড় রকমের কালির আঁচড় হ'য়েই থাকবে। কৃচ্ছ্র-সাধনরূপ প্রায়শ্চিত্তের ইরেজার দিয়ে ঘষেও তোলা যাবে না তা।

মজুমদারের কথা মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার একটি কথাও স্মৃতি-বল্‌কানের ভেতর থেকে হুস্ ক'রে জেগে ওঠে। এডেন বন্দরে পৌঁছবার আগে ক্যাপ্টেনকে কেন ঘেরাও করেছিলাম আমরা, সেই কথা। এখনও অশ্রুতই রয়ে গিয়েছে সেই বিশেষ কারণটি। চেপে ধরি দিনেশকে, এখুনি বলতে হবে সে কথা। মন বড় চোর। বিশ্বাস নেই তাকে। নিয়তই চলেছে সেখানে স্মৃতি-বিস্মৃতির লুকোচুরি খেলা। কত মুখ, কত না ঘটনা গিয়েছে অতলে তলিয়ে ; চেষ্টা ক'রেও জাগিয়ে তুলতে পারি না অনেক সময়ে। আবার তুচ্ছ একটি কথা হয়ত' যুগাতীত সময় ধরে ভেসেই চলেছে মনের উপকূল ধরে ধরে। চোখ চাইলেই দেখতে পাই।

কি হ'ল ? বললি না ?

একবার নয়, পরপর কয়েকবার কড়া তাগাদার পর মুখ খোলে সে—

মিঃ মিচেল তখন ইংলণ্ডীয় কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন। অর্থাৎ তখনও তিনি তাঁর কলিকাতা-বাসিনী স্ত্রীরত্নটির দেখা পান নি। সেই সময়ে তাঁরই জাহাজে একটি ঘটনা ঘটে যায়। জাহাজটি আসছিল ভারতবর্ষের দিকে। বাজবজই তার লক্ষ্য।

যুদ্ধের মরশুম। সুয়েজ পেরুলেই ভীতির রাজত্ব। বিশেষ ক'রে ট্যাঙ্কার জাহাজের। এই তৈল-বাহী জাহাজ দেখলেই ফেউএর মত পিছনে লাগে সাব-মেরিন আর ইউ-বোট। ফলে মিচেল গিয়েছেন আট্‌কে। আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরই এখন হ'য়েছে তাঁর প্রধান ভ্রমণ রাজ্য। কখন কখন মুখ বদলে আসেন পার্সিয়ান গাল্‌ফে ঢুকে।

দিন যায় একঘেয়ে জীবন-যাত্রায়। যদি বা কোথাও থামে, ঠিক নেই সে থামার মেয়াদের। জাহাজ নোঙর তোলবার জন্যে তৈরী থাকে।

ফল ভোগ করে নাবিকের দল। না ঘর, না ঘরণী। আকণ্ঠ পিপাসা। কিন্তু উপায় নেই ঐ ওখানে যাওয়ার যেখানে নেমে যেতে পারলে অন্ততঃ হু'ঘণ্টার জন্যেও তাদের নর্মসহচরীকে খুঁজে নিতে পারত।

দিন যায়, অসন্তোষ বাড়ে। বিক্ষুব্ধ অন্তর। ভাল কথাটিও সহ্য হয় না কারও গায়ে। নোংড়া গালাগালি দিয়ে পুরিয়ে নিতে চায় তাদের জৈব-কামনা। ওদিকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে খিটিমিটি বেধেই রয়েছে লস্করদের। তারাও অফিসারদের মত মদ চায়। আইন দেখান মিচেল। ওরা চেঁচিয়ে ওঠে—ফাঁসীতে লট্‌কে দাও তোমার আইনকে। অবসর সময়ে মদ না পেলে আমরা কাজ করতে পারব না। নতুন লস্করের দল নিয়ে এস। আমাদের বাড়ী ফেরবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

রোগই যদি না ধরতে পারলেন তাহলে আর কাপ্তেনী কিসের? আশ্বাস দেন মিচেল—ঠিক আছে। এবার কোথাও থামলে আট ঘণ্টা অপেক্ষা করা হবে সেখানে। আর তোমাদের এক এক দলকে হু'ঘণ্টার ছুটি দেওয়া হবে।

অশান্ত জলের বুকে যেন পিপে খালি করে তেল ঢেলে দিলেন ক্যাপ্টেন। শান্ত লস্করেরা। এইত' চাইছিল তারা। এ না হ'লে আর ক্যাপ্টেন! আনন্দের আতিশয্যে একজন ত' বলেই ফেলল—আমাদের বুড়ো মানুষটি খুব ভাল জারজ।

তারপর শুধু অপেক্ষা। কবে থামবে জাহাজ। সুখানী থেকে আরম্ভ ক'রে কোলট্রিমার, ক্যাসাব সবাই উন্মুখ। অশান্ত রক্তের কম্পন অনুভব করে তারা তাদের প্রতিটি কাজে। গান ধরে দেয় যখন তখন—

When I came to u'
U' were at the door,
I pat u' an' chat u'
U' my da'ling whore.

অফিসাররা গায় মনে মনে—

U' offered me your lips
I touched with mine,
Your white two prides
I very much adore.

এক সময়ে ধীরে ধীরে মুখ ঘোরে জাহাজের। চীৎকার ক'রে ওঠে লস্করের দল—কুয়েৎ, কুয়েৎ।

সত্যিই কুয়েৎ। এধারে আরব, ওধারে পারস্য। মাঝখানে পার্সিয়ান গাল্‌ফ্‌। স্থলভূমির যুক্তাংশটুকু বিভক্ত ক'রে চলে গিয়েছে টাইগ্রিস নদী। মিশরের রুক্ষতা এর অন্তরে। মুখখানি শষ্পের শ্যামলীমায় সুন্দর। ভারতীয় অর্থনীতিই সচল এখানে। অর্থও এক। প্রভেদ শুধু নোটের রংএ। খুচরোতে কোন প্রভেদ নেই। তাহ'ক, মুল্য ত' এক। তাহ'লেই আর কোন ঝামেলা নেই। বদলে নিতে কষ্ট পেতে হবে না।

নেমে যায় নাবিকের দল। চোখে বুভুক্ষিতের অনুসন্ধানী দৃষ্টি। যেতে হয় না বেশীদূর। দৃষ্টি থাকলেই দেখা যায় জাহাজ ঘাটার আশে পাশে দেহ-পসারিণীদের সংখ্যা কিছু কম নয়। রাজত্ব যারা চালায়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চাইতে মুখের কসরৎকেই তারা দাম দেয় বেশী। তাই জানতে পারে না, জানতে চায়ও না কি ভাবে চলছে সাধারণের সংসার। সামান্য তু'মুঠো অন্নের জন্যে কি মুল্যই বা দিতে হচ্ছে তাদের। পথ যেখানে নেই বিপথই সেখানে একমাত্র আশ্রয়।

তু'ঘণ্টার সংসার। নির্দিষ্ট সময়েই তার মায়া কাটিয়ে ফিরে আসতে হয় সকলকে। তারও আগে ফিরে এসেছে সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ার। ফেরেনি শুধু চীফ। তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে সকলে। এক সময়ে ফিরে আসে সেও। প্রমত্ত অবস্থা। ক্ষমতা নেই স্থিরভাবে কোথাও দাঁড়াবার। আপন মনে কি সব বকে চলেছে। তু'জন লস্কর নেমে গিয়ে তুলে নিয়ে আসে তাকে জাহাজর ওপরে। টলতে টলতে সোজা সেকেণ্ডের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় চীফ। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে আপন দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে বলে—আমাকে ক্ষমা কর

সেকেণ্ড। আমি জানতাম না, ও তোমার খুঁটে তোলা ফুল। তারপর আবার এলোমেলো পা ফেলে চলতে থাকে নিজের ঘরের দিকে।

জাহাজ মুখ ঘুরিয়েছে আরব সাগরের দিকে। লক্ষ্য এবার তার বোম্বাই। আনন্দের উত্তেজনার উপশমে ক্লান্তি নেমেছে জাহাজের সর্বাঙ্গে। উত্তেজিত খিস্তি শোনা যায় না আর কারও মুখ থেকে। নিঃশব্দে সেরে চলেছে আপন আপন কাজটুকু। এমন সময় ইঞ্জিনঘরের ভেতরে কি একটা গোলমাল হওয়ায় ছুটে বেরিয়ে এল সারেঙ। সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ারকে দরকার। কিন্তু তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। এধার ওধার খুঁজতে খুঁজতে শেষে চীফের ঘরে গিয়ে ঢুকেই চীৎকার করে ওঠে সে। সাড়া পড়ে যায় সমস্ত জাহাজে। একে একে ছুটে আসে অনেকেই। আহত মানুষ দুইটি পড়ে রয়েছে মেঝের ওপরে। সেকেণ্ডের তখনও কিছুটা জ্ঞান আছে। চীফ সম্পূর্ণভাবেই অজ্ঞান।

ডাকাডাকিতে মাস্টারকেও নেমে আসতে হয় নীচে। আহতদের সম্বন্ধে যেটুকু যা করবার ক'রে চীফকে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সেকেণ্ডকে তার নিজের কেবিনে নিয়ে যেতে বলে।

ইতিকর্তব্য শেষ করে চলে যায় মাস্টার। ঢেউ-জাগা বাতাসের বুকে আবার কিছুটা প্রশান্তির ভাব দেখা দেয়। দিন এগোয়। জাহাজও এগিয়ে চলে। পার্সিয়ান গাল্‌ফের সীমানা অতিক্রম ক'রে আরব সাগরে এসে পড়েছে জাহাজ। নিশানার লাল এবং সবুজ আলো দুইটিই নেভানো। আলোর খবর পেলেই কালোর পর্দা চিরে নেমে আসতে পারে বোমারু-বিমানের বুক থেকে খসে পড়া বোমার বহর। নিঃশব্দে এগিয়ে চলে জলযান ঘণ্টায় বাইশ নট্ গতিতে। পশ্চিমের দেশগুলি থেকে যতশীঘ্র যতটা সরে যেতে পারে পূবের দিকে ততই নিশ্চিন্ত সে।

জাহাজস্থ সকলেরই মনে এক দুশ্চিন্তা আহত মানুষ দুইটিকে নিয়ে। সকাল হতেই এসে ঢোকে সেকেণ্ডের ঘরে। অঘোর ঘুমে অচেতন সে। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে চলে তারা চীফের ঘরের দিকে। এই মানুষটিই আহত হয়েছে বেশি। চীফের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোন যোগাযোগ নেই কোনও ইঞ্জিনীয়ার অথবা লস্করের। ইঞ্জিনঘর বলতেই সেকেণ্ড, চীফ ত'

কাগজে কলমে। তবুও চীফত'। তা যদি নাও হয়, একজন আহত মানুষ ত' বটে। এই নির্বান্ধব জলযানের বুকে তারাই ত' একমাত্র বন্ধু এবং আত্মীয়।

চীফের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় তারা। কোন রকম শব্দ আসছে না ঘরের ভেতর থেকে। তা হ'লে কি অজ্ঞান হ'য়ে রয়েছে এখনও? চিন্তিত মনে ঘরের ভেতরে পা দিয়েই চমকে ওঠে। কি রকম হ'ল? অজ্ঞান মানুষটার বিছানা খালি কেন? ছুটে যায় একজন বাথরুমের দিকে। সেখানেও নেই। এরপর ক্যাপ্টেনের দৃষ্টিতে আনতেই হয় ব্যাপারটি। মিনিট কয়েকের ভেতরেই সমস্ত জাহাজ তোল-পাড় ক'রে খোঁজা আরম্ভ হয়। ক্যাপ্টেন নিজে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন সমস্ত সম্ভাব্য স্থানগুলি দেখা হ'ল কি না। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না আহত অজ্ঞান চীফকে।

মিচেল বুঝেছিল ব্যাপারটা, বুঝেচিস? বলতে থাকে দিনেশ—এ সেকেণ্ডেরই কীর্তি। আসলে নিজে আহত হয়েছিল কম। অজ্ঞান হওয়াটা পুরোদস্তুর ভাঁওতা। ঐ সুযোগটুকু নিয়েই সে সলিল-সমাধি ঘটিয়েছে চীফের। অথচ প্রমাণ নেই কোন। মাঝরাত্রের জাহাজের খবরত' জানিস্? তাছাড়া সেকেণ্ড নিজেও আহত। বিশ্বাসই করতে চাইবে না কেউ যে এ তারই কীর্তি।

এত' ঘটল তাদের জাহাজে। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কি? পুরোটা মিলিয়ে নিতে চাই আমি।

আমরাই ত' আসলরে। বুঝিয়ে বলতে থাকে সে, জাহাজ আসছে বোম্বাই। খবর এসে গিয়েছে আগেই। ফেঁরবার রাস্তা নেই। আসতেই হ'ল। এবং সর্বদেশীয় আইনে বিচারও হ'ল সেকেণ্ডের। অবশ্য হ'ল না কিছুই। প্রমাণাভাব। ছোরা মারামারির জন্যে শাস্তি হয়ত' সে পেতে পারত। কিন্তু তারও ত' প্রমাণ নেই। সে নিজে আহত বটে, কিন্তু চীফকেও যে ও মেরেছিল তার প্রমাণ কোথায়? দেহ কোথায় তার? ফলে খালাস। মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল মিচেল—যাক্ বাবা, দেশের সুনাম ত' বাঁচল।

তা সে ফেলতেই পারে। বলি আমি।

তাই বা ফেলতে পারল কোথায় ? বলল সে—মাঝপথেই আটকে দিল দৈনিক পত্রিকাগুলি। কোথা থেকে কি করে যে সমস্ত ঘটনা টেনে বের করল ওরা—বেশ ভালভাবেই ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিল সব ঘটনা। অবশ্য আইন বাঁচিয়ে, কলমের কায়দায় ।······সেই হচ্ছে রাগ, বুঝলি ? সুযোগ পেলেই ভারতবর্ষের জাহাজী জীবনের যে সুনামটুকু আছে তার গায়ে আঁচড় বসাতে চেষ্টা করে ও।

মজুমদার ত' তাহলে—চিন্তিতভাবে বলতে যাই আমি।

তুস্, ও আবার একটা ঘটনা না কি ? ঘটনা হচ্ছে মজুমদার একজন লস্করকে মদ দিয়েছিল কেন। তারপরই উচ্ছ্বসিত গলায় বলে ওঠে দিনেশ, ঐ দেখ, দেখেছিস। ভারি সুন্দর, তাই না ? সামনের পাসেটোর দিকে দেখায় সে।

তাকিয়ে দেখি সত্যিই দেখবার মত, তু'ঘণ্টা বসবার মত জায়গা। স্নান করবার মত কি না, জানি না। একবার মাত্র সমুদ্র-স্নান করেছিলাম আন্দামানে। তারপর গায়ে মাথায় সে কি চিড়বিড়িনি। গা রগড়াই আর খড়ি উঠবার মত নুনের প্রলেপ উঠতে থাকে। শুকনো চুল ঝাড়লে ঝর ঝর ক'রে পড়ে নুনের গুঁড়ো। আর এমন শয়তান ওরা, আমাকে একবার বলেনি পর্যন্ত যে সমুদ্রে স্নানের পর আবার ভাল জলে স্নান করতে হয়। পরে শুনেছিলাম সেটা বিশ্বাসেরই চোখ টিপুনির ফল।

কপালে জুটেছে ভাল। যেমন দিনেশ, তেমনি তেরেসা। তুটোয় কি এত নাচতেও পারে। পথের মাঝে কুড়িয়ে পাওয়া বন্ধুর মত সেদিন পাসেটোতে জুটে গিয়েছিল কয়টি বন্ধু। কয়টিই কলেজের ছাত্রী। বসেছিল একপাশে, সামনের নিথর সাগর-বারির দিকে তাকিয়ে। মুগ্ধ চোখে। আর মাঝে মাঝে নিতান্ত অকারণেই হেসে উঠছিল। যেমন ভাবে হাসে চিরযৌবনমদমত্তা অলকানন্দা। ওদের হাসির বাতাস লেগেছিল বুঝি আমাদের গায়েও। হাসছিলাম আমরাও। অহেতুক, উদ্বেলিত।

হাসতে হাসতে লাফাতে লাফাতে নেমে গিয়েছিলাম এঁকে বেঁকে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে সমুদ্রের ঠোঁটের কাছটিতে। ছুটে ছুটে ঘুরে ফিরে দেখছিলাম জায়গাটি। নেই, এমন একটিও স্নানের জায়গা নেই আমাদের দেশে। এ যেন ভ্রমণকারীদের জন্যেই বিশেষ ভাবে তৈরী করা হ'য়েছে। তারপর উঠে এসেছিলাম যখন তখন ওদেরই একজন জিজ্ঞাসা করেছিল আমাদের, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে—তোমরা কি ইণ্ডিয়া থেকে আসছ ?

বাস্। আর পায়কে দিনশকে। অপরিচয়ের বেড়ার দরজাটা একটু ফাঁক করলেই হ'ল, তাহ'লেই ও একটানে সেটাকে খুলে হাট ক'রে দিতে ওস্তাদ। নিজেদের পরিচয় ত' দিলই, ওদের পরিচয়ও অজানা থাকল না আর। এ্যাঙ্কোনা সহর যেখানে শেষ হয়েছে তার পাশেই ওদের বাড়ী। শুধু মারী থাকে সহরের ভেতরে। সকলেই ওরা কলেজে পড়ে। মনের অভিপ্রায়ও প্রকাশ করল কেউ কেউ—পাশ করে বেরিয়ে মিলানএ যাবার চেষ্টা করবে। সেখানে যদি কোন একটা কাজ পায়, থেকে যাবে। দেখবার যা কিছু সবত' উত্তর ইটালীতেই। আলাপের পালা শেষ হ'তে উঠে দাঁড়াই আমরা। ওরাও ওঠে। বলে—একদিন যাব তোমাদের জাহাজ দেখতে। উত্তর দিই না আমি। এ সভায় এ পর্যন্ত নীরব দর্শকের ভূমিকা অভিনয় ক'রে গিয়েছি। এখনও তাই করি। উত্তর দেয় আমার বন্ধুটি—নিশ্চয় যাবে। গেলে খুব আনন্দিত হব।

পরদিন ইঞ্জিনঘরের কিছু সারাইএর কাজে আটকে পড়েছিলাম। কাজ সেরে ওপরে উঠে শুনি কয়টি মেয়ে এসেছিল বেড়াতে। দিনেশ তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে। ভালই হ'য়েছে। অকারণ লাফ-ঝাঁপ আমার আসে না। ভালও লাগেনা। চিনুর চিঠি পেয়েছি এখানে এসে। ওর বাবা খড়্গ হস্ত হ'য়ে রয়েছেন আমার ওপরে। এবারে আমি ফিরে গেলেই নাকি বলিদানের ব্যবস্থা করবেন। আমার বাবাকেও জানাতে চেয়েছিলেন কথাটা। কিন্তু চিনুর কাছ থেকে আমার কোন ঠিকানা বের করতে না পারায় গুম্ মেরে গিয়েছেন। আমি লিখে দিয়েছি—আমরা দু'জনে আর পৃথক নই, একথা চিন্তা ক'রে যা ভাল বিবেচনা কর, তাই করবে। এখন তোমার এবং আমার বাবা জানলেও সরে যেতে পারিনা

আমরা। পারি কি? তুমি বরঞ্চ আই, এ ক্লাসে ভর্তি হ'য়ে যাও। আমি হেড অফিসকে লিখে দিচ্ছি প্রতি মাসে তোমাকে কিছু টাকা দিতে।

চিন্তায় আচ্ছন্ন মন। কখন যে জাহাজ থেকে নেমে এসে ঢুকেছি সহরের ভেতরে, সে খেয়ালও নেই। খেয়াল হয় বাসের দেখা পেতে। প্যালোমবিনার দিক থেকে এসে চলেছে পোর্টোনোভোর দিকে। লাফিয়ে উঠে পড়ি। পাসেটোই আমার গন্তব্যস্থান। ভাল লেগেছে জায়গাটিকে। আপন প্রশান্তির ছোঁয়া দিয়ে শান্ত ক'রে আনে মনের সকল উদ্বেলতা, অস্থিরতাকে। নিজের ভেতরে খুঁজে পাই নিজেকে। এই যে লড়াই, সাগর-দোলা, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর এক জীবন গড়ে তোলা, এর অন্তর্নিহিত কারণটি কি? শুধুই কি অর্থাগম? তাহলে বিদেশের মাটি কেন, দেশের মাটিতে বসে একটা কিছু করা যেত নিশ্চয়ই। আসল কথা, চাই চিনতে, জানতে, বুঝতে। জানি, আজকের দেখা আর দশ বৎসর পরের দেখার ভেতরে অনেকখানি প্রভেদ ধরা পড়বে আমার নিজেরই চোখে। তবুও স্বল্পমূল্য বলে ভাবতে পারিনা আমার আজকের দেখাকে। গারিবল্‌দি, দ্য ভিঞ্চির কথা নাইবা শুনলাম আজ, নাইবা চিনলাম মাৎসিনিকে; চিনব ত' তেরেসা, রোজা, মারীকে। সদ্য যুদ্ধস্নাত যুবতী ইতালীকে। সেই বা কম কি?

বাইরের দিকে নজর পড়তেই দেখি সহরের সীমানা পেরিয়ে গিয়েছি। পাসেটোকে বাঁয়ে রেখে সোজা এগিয়ে যাবে বাস আরও দক্ষিণে। অতএব নেমে পড়তে হয় এখানেই। এগিয়ে চলতে থাকি লম্বা লম্বা পা ফেলে। শোনা আছে—অন্ধের রাজত্বে একচক্ষু মানুষই হচ্ছে রাজা। এই জনমানবহীন প্রান্তরে আমারও তেমনি একচ্ছত্র অধিকার। মনের আনন্দে গলা ছেড়ে দিয়ে বেতালা গেয়ে চলেছি। হ'ক বেতালা, আপত্তি নেই। তালের চাইতে বড় কিছু একটা অনুভূতি এসেছে মনে। গান জিনিসটি অপরজনকে শোনাবার জন্যে সৃষ্টি হয়নি। আপন অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসেই এর সৃষ্টি। গায়কের নিজের চাইতে বড় শ্রোতা আর নেই। ব্যবসার পণ্য নয় এ। হৃদয় নিয়ে কেউ ব্যবসা করে না।

গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলেছি। একটা বাঁকের মুখে এসে

দাঁড়াতেই হারিয়ে যায় গানের কথাগুলি। পালিয়ে গেল যেন মানুষের দেখা পেয়ে। পূর্ব দিনের পঞ্চ-কন্যার একটি দলচ্যুত অবস্থায় বসে রয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে যেতেই মুখ ফেরায় সে। দেখি মারী। পরে শুনেছিলাম ঐ নাম। পাঁচ বান্ধবীর ভেতরে এই-ই বোধহয় একমাত্র আকর্ষণী শক্তিহীনা অর্থাৎ চেহারায় টানে না ' সাদ-মাটা একটি মেয়ে। পোষাক আসাকেও অত্যন্ত সাধারণ।

তোমাদের জাহাজে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বলল মারী।

ধন্যবাদ। কি রকম দেখলে ? জিজ্ঞাসা করি।

কি বুঝি বল ? একটুখানি সলজ্জ হাসি হেসে বলে—জাহাজের বুকে এই প্রথম পদার্পণ আমার। তুমি ত' ইঞ্জিনীয়ার। গিয়েছিলাম ইঞ্জিন ঘরেও। দেখলাম না ত' তোমাকে। বস।

একটুখানি সরে বসে সে। বসে পড়ি তার পাশে।

ছিলাম ভেতরে। কাজ করছিলাম। উত্তর দিই ওর কথার।

একটা ছোটখাট নরক। ওর ভেতরে কাজ কর কি ক'রে ?

মানুষ অভ্যাসের দাস।

হবে।

চুপ ক'রে যায় ও। কি যেন ভাবে। একটু পরে নিজের মনেই বলে ওঠে—আমাদের এক কঠিন পরীক্ষা চলেছে। যুদ্ধ ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে সমস্ত দেশের মেরুদণ্ড। এখন লড়াই চলেছে নিজেদের অন্তরের সঙ্গে।

সে আমাদের দেশেও। যুদ্ধের পরিণাম। যূপকাষ্ঠে মাথা গুঁজে দেওয়া হচ্ছে সততার।

ঠিক তাই। বলে উঠেই থেমে যায় ও। ভাব দেখে মনে হয় কিসের একটা চিন্তা বারে বারেই অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে ওকে। অপেক্ষা করছি ওর পরবর্তী কথার। দেশের কথা যখন উঠেছে তখন আরও কিছু শুনতে পাব নিশ্চয়ই। হঠাৎ একসময় বলে ওঠে সে—চল, আমাদের বাড়ী বেড়িয়ে আসবে।

ঠিক এই ধরণের নিমন্ত্রণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না আমি। একটু ভয়ও যে না হয় তাও নয়। শুনেছি কলকাতায় নাকি এরকম ঘটনা

কখন কখন ঘটে। 'বিপদে পড়েছি, বাড়ীতে পৌঁছে দিন' বলে বাড়ী ডেকে নিয়ে যায়। তারপরই ধরে স্ব-মূর্তি। টাকা পয়সা ঘড়ি আংটি সব খুলে দিতে হবে, নইলে চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করবে। আর পাড়াতুত দাদারাও নির্দোষ ভগ্নীকে সাহায্য ক'রতে ছুটে আসতে দেরি করবে না। তারপরের কথা না হয় উহ্যই থাকল।

ভাবছি সব, মুখে বলতে পারছি না কিছুই। এক বিশ্রী অবস্থায় ফেলেছে আমাকে মারী। এদিকে উত্তর দেবার ভদ্রতা-সম্মত সময়টুকু পেরিয়ে যাচ্ছে একটু একটু ক'রে। ভাবছি জাহাজের কাজের দোহাই পেড়ে এখান থেকে উঠে যাব। এমন সময় আপনা থেকেই বলে ওঠে—থাক্, সেখানে গিয়ে তোমার অসুবিধে হবে।

না, না, অসুবিধের কথা আমি চিন্তাও করিনি মেরি। দোষস্খালনের চেষ্টা করি—আমি ভাবছি তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরতে হবে, সেই কথা।

একটু খানি হেসে সংশোধন করে সে আমাকে—মেরি নয়, মারী।

ধন্যবাদ। ওরা কোথায় বেড়াতে গেল?

প্যালোমবীনাতে। বেশ সুন্দর জায়গাটি। বেড়াবার উপযুক্ত। স্বর্ণালী বালির চর সূর্যের আলোয় চিক্ চিক্ করে। মনে হয় যেন সোনা দিয়ে গড়া বিরাট একখণ্ড ভূমি পড়ে রয়েছে। দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না। ওদিকে সোনার বালুচর, তারপরেই সবুজের আস্তরণ। উচ্ছ্বসিতভাবে বলে যেতে থাকে সে—মাঝে মাঝে দেখা যায় কৃষকদের কুটির, গ্রামের ভেতরে; চাষের ক্ষেত, আবার তার পাশেই গড়ে ওঠা বিরাট কারখানা। বড় রাস্তা আর রেল লাইন চলে গিয়েছে তার পাশ দিয়ে।

তুমি গেলে না?

বাধা পড়ে তার উচ্ছ্বাসে। কি যেন ভাবে। একটু পরে উত্তর দেয় আমার কথার—না।

কেন, আপত্তির আছে কিছু? জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও পারি না। একবার তাকিয়ে দেখি ওর মুখের দিকে। ব্যথাক্লিষ্ট। আনমনা হ'য়ে পড়েছে কিসের চিন্তায়। অপেক্ষা করতে থাকি তার জাগরণের। সামনেই

নিথর বারিরাশি। শান্ত, গভীর, গম্ভীর। মারীর সঙ্গে এই এ্যাড্রিয়াটিকের কোথায় বুঝি একটা মিল রয়েছে। অপেক্ষার পালা আরও কিছুক্ষণ হয়ত' চলত। মাথার ওপর থেকে জেগে ওঠা সম্মিলিত হাসির কলোচ্ছ্বাস ভেঙে দিল মারীর চিন্তার ঘুম। ওদের দিকে না তাকিয়েই বেশ শান্ত গলায় স্বাগত জানায় সে—যায়।

হুড়দাড় ক'রে নেমে আসে ওরা। বসে প'ড়ে সিঁড়ির ওপরে। দিনেশ প্রাচীরের ওপরটাতে গিয়ে বসে।

মেয়ে, সে এদেশ ওদেশ কি। চরিত্রের গঠন প্রায় সব দেশেই সমান। চারজনে এসে বসেই চারটি রেডিওতে চারটি স্টেশন ধরে দেয়। বিরতিহীন শব্দের ঝাঁক নিক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। যার অক্ষর জ্ঞানটিও আমার নেই। কি অদ্ভুত মনে হয়। মানুষে মানুষে কি বিরাট প্রভেদই না গড়ে তোলে এই ভাষা। আকারে ইঙ্গিতে যা বোঝান যায় তাতে প্রাথমিক আলাপই হয় শুধু। অন্তরটি অচেনা থেকে যায়। বাঁশীর বুকে প্রথম ফুঁএর মত। শব্দ জাগে, সুর ফোটে না।

এই কলোচ্ছ্বাসের মাঝখানে আমরা তিনজনে গাঁদা ফুলের মালার ভেতর লঙ্কাজবার মতই বেখাপ্পা। মারী শান্ত, সমাহিত। আমি অবুঝ। দিনেশের মুখখানি দেখা যায়নি এখনও।

সোরকার, তোমার জাহাজে কাজ আছে বলছিলে না? হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে মারী।

হ্যাঁ, এইবার যাব।

উঠে দাঁড়াই আমি। বিদায় নিই ওদের কাছে থেকে। ক'ধাপ উঠে এসে থামি দিনেশের সামনে, জিজ্ঞাসা করি—কিরে, যাবি নাকি?

ওর হ'য়ে উত্তর দেয় তেরেসা—না, আমরা সহর ঘুরব এখন।

ঘোর। দিনেশকে লক্ষ্য ক'রে বলি—তবে মাথা না ঘোরে।

সোজা হাঁটতে থাকি সহরের দিকে।

কিছুদূর এগিয়েছি এমন সময় কানের কাছে 'সোরকার' শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি মারী। এতদূর তাকে টেনে এনেছিল যে হৃদয়াবেগ, আমার কাছে পৌঁছে সেইটিই যেন তার লজ্জার কারণ হ'য়ে পড়ে।

আমৃতা আমৃতা ক'রে বলে—ভাল লাগছিল না ওদের ঐ বক্‌বকানি। তাই—মানে—কথা আর শেষ ক'রতে পারে না সে।

চল, তোমাদের বাড়ী যাব। ওকে সহজ ক'রে তুলবার জন্যে বলি।

যাবে? সত্যি? আনন্দে লাফিয়ে ওঠে সে—আমার বাবা মা অত্যন্ত খুশি হবেন তোমাকে দেখলে। তুমি ভারতবর্ষের মানুষ। সেত' আমাদের কাছে স্বপ্নের দেশ। কেন জান? বলেই সে ঘুরে দাঁড়ায় আমার মুখোমুখি হ'য়ে। আমার মুখের পাতায় কি এক লুকোন লেখা পাঠ ক'রতে চেষ্টা করে। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে থাকে এগিয়ে। বলে—কারণ, তোমাদের মত এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসতে আর কেউ পারে না। আরও অনেক দেশের মানুষ আসে এই এ্যাঙ্কোনাতে। তাদের দেখেছি ঘরের টান নেই। আছে নীড়ের আকাঙ্খা। প্রয়োজন মিটতেই ভুলে গেল সেই ক্ষণস্থায়ী বাসার কথা।

অনর্গল বকে চলেছে মারী। বাধা দিই না আমি। স্বল্পভাষী যখন কথা বলে তখন মনের গভীর থেকেই সেগুলিকে তুলে আনে। সুচিন্তিত তার বক্তব্যকে সুখশ্রাব্য ক'রে তোলে আপন অন্তরের পরশ দিয়ে। ওর কথা শুনতে শুনতে এক সময়ে এসে দাঁড়িয়ে যাই ওদের বাড়ীর দরজায়।

আলাপ হ'য়েছিল মারীর বাবা মার সঙ্গে। ভদ্রলোক ভালই ইংরিজি বলেন। এখানকার স্কুলের একজন শিক্ষক। আগে ছিলেন অন্য একটা বাড়ীতে, তু'খানা ঘর নিয়ে। তখন ওঁদের একমাত্র পুত্র বোরিসও ছিল ওঁদের কাছে। পরে যুদ্ধে চলে যায় সে। আর ফেরেনি। এখন মারীর বাবার একার রোজগারের ওপরেই নির্ভর ক'রে সংসার চলে। তাই তু'খানা ঘরের পাট তুলে দিয়ে এই একখানা ঘরেই সংসার পাততে হ'য়েছে তাঁকে। মারীই তাঁদের ছেলে মেয়ে সব কিছু। ও যদি কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরিয়ে একটা কোন কাজ জোগাড় ক'রে নিতে পারে তাহ'লে হয়ত' আবার সংসারটি দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

দেখেছিলাম ওদের ঘর সংসার আর শুনেছিলাম ভদ্রলোকের কথা। সহজ সরল কথাবার্তা। আমি বিদেশী বলে রেখে ঢেকে বলেননি কিছু। সোজাসুজি বলেছিলেন—দেখ, এ যুদ্ধের ঢেউ পৃথিবীর সমস্ত দেশেই

লেগেছে। আর এ অবস্থা তোমার আমার সকলের। যারা যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সততার অভিমান ত্যাগ ক'রতে পারল তারা উঠে গেল ওপরে। যারা তা পারল না, তারাই হ'ল যুদ্ধের পরবর্তীকালীন বলি।

একমনে শুনে চলেছিলাম ভদ্রলোকের কথা। খেয়ালই ছিল না সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছে কখন। তিনি নিজেই মনে করিয়ে দিলেন। মারীকে বল্লেন আমাকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসতে। রাস্তায় নেমেই প্রশ্ন করলাম আমি—মারী, তোমার মা নিশ্চয়ই ইটালীয়ান নন, তাই না?

কি ক'রে বুঝলে? আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছে সে আমার প্রশ্নে।

এমনি মনে হ'ল। উত্তর দিলাম আমি— ওঁর কথায় একটি টান আছে যা তোমাদের কথার সঙ্গে ঠিক মেলেনা।

ঠিকই ধরেছ। মারী স্বীকার করে আমার কথা—আমার মা জার্মান। জার্মান মেয়েদের একটি বিশেষ গুণ আছে, জানো? তারা খুব গোছালো হয়। আর রান্নাঘরকে ছবির মত ক'রে সাজিয়ে রাখা তাদের একটা নেশা। মাও চেষ্টা করেছিলেন কিছুদিন, কিন্তু বাবা এমনই অগোছালো যে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছেন মা।

দাঁড়িয়ে যাই। ওকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয় ভেবে বলি, মারী, এবারে আমি চলি।

এস। কাল আসছ তো? একটু সকাল সকাল এসো, গ্রামের ভেতর দিয়ে কিছুটা বেড়িয়ে আসব।

আসব। বলি আমি।

তারপর হাঁটতে থাকি বন্দরের দিকে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি, ও ঠায় তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। একটু হেসে হাত নেড়ে আবার পিছন ফিরি।

দেখেছি ইটালীর গ্রাম। চাষীদের বাড়ী, ফসলের ক্ষেত আর গ্রামের বুকে গড়ে তোলা কলকারখানা। এদের সম্বন্ধে একটি কথা চোখ বন্ধ ক'রেই বলে দেওয়া যায়—মোটেই পরিচ্ছন্ন নয় এরা। আর খায় বোলেন্তা

নামে এক অদ্ভুত জিনিস। ভুট্টার আটা সেদ্ধ ক'রে আগুনে সেঁকে নেওয়া হয়। তার সঙ্গে তরকারী হিসাবে থাকে স্যালাডএর কচি পাতা। কি ক'রে যে খায় ওরা এই জিনিসটি, বুঝতে পারিনা। একদিন এক রেস্তোঁরায় আমি আর মারী নিয়ে বসেছিলাম দু'প্লেট ঐ আজীব পদার্থ। এক চামচ মুখে দিয়েই মনে হ'য়েছিল আমার আর এক চামচ জোর ক'রে চালাতে গেলে ঘরদোর নোংড়া ক'রে ফেলব। মারী বুঝেছিল আমার অবস্থা। বলেছিল—থাক্, জোর ক'রে চেষ্টা করোনা। তার চাইতে রোষ্ট খাও। বোলেন্তা কিন্তু এখানকার সর্বজনীন খাদ্য।

হ'ক সর্বজনীন, আপত্তি নেই। আমি ত' সেই সর্বজনের একজন নই। ভেসে এসেছি, ভেসেই বেরিয়ে যাব। অবশ্য সে কথা বলিনি ওকে। ব্যথা পাবে। তবে এতগুলি দেশের মাটি ছুঁয়ে এসে একথা আজ বলবার অধিকার আমি লাভ করেছি যে ইটালীয়ানরা শয়ন বিলাসী বা ভোজন বিলাসী এ দুটোর একটাও নয়।

রিজত্ত খাবে?

মারীকে জিজ্ঞাসা করতেই আঁতকে ওঠে সে—না না, অনেক দাম।

দামের প্রশ্ন আমার কাছে। তুমি খাবে কিনা তাই বল।

পদার্থটি চাখবার সখ আমারও ছিল। লোকে বলে মুরগীর রসে সেদ্ধ করা এক ধরণের পোলাও এটা। দুটো পয়সা পকেটে থাকলে ইটালীয়ানরা নাকি খুব খায় এই জিনিস। দু' প্লেট রিজত্তের হুকুম জানিয়ে মুখ ফেরাতে দেখি মারী মাথা নীচু ক'রে বসে আছে।

কি হ'ল? রাগ হয়েছে বুঝি? হেসে হেসেই জিজ্ঞাসা করি আমি।

উত্তরে সে মুখখানি তুলতেই হাসি নিভে যায় আমার। বাষ্পের একটা আস্তরণের নীচে ব্যথা-কাতর দুটি চোখ। সশঙ্কিত হ'য়ে উঠি। অজান্তে কোনও অপরাধ ক'রে ফেলেছি কি? কথাটা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি, মারী বলে—তোমার সঙ্গে কয়টি কথা আছে সোরকার।

বল।

এখন নয়। বলব, পরে।

ইটালীয় পোলাওএর স্বাদটা আর পুরোপুরি পাওয়া হয় না। মারী

এক ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছে মনে। একবার একটু সন্দেহও জাগে, কোনরকম প্রস্তাবনা করে বসবেনাত' ও। তখুনি আবার ঝেড়ে ফেলে দিই সে চিন্তা—ধ্যেৎ, যেটুকু চিনেছি ওকে তাতে এরকম সন্দেহ করা মোটেই চলে না। ও দিনেশ নয়, তেরেসা বা রোজাও নয়। ওর নিজস্ব একটি চিন্তাধারা আছে। সেখান থেকে সামান্যমাত্র স্খলনও সহ্য হবে না তার। খাওয়া শেষ ক'রে বাইরে আসতেই ও বলে—চল, হারবারের মাথার ওপরে গিয়ে দাঁড়াই।

এগিয়ে চলতে থাকে সে। পিছনে আমি।

এ্যাঙ্কোনা সহরের একপ্রান্তে হারবার, অপর প্রান্তে পাসেটো। অনেকখানি নীচে নেমে গিয়ে পৌঁছুতে হয় হারবারে। আমরা নামি না, বরঞ্চ উঠতে থাকি সহরের পিছনের উঁচু জমির দিকে। সবটা মিলিয়ে তিনটি ধাপ যেন। প্রথম ধাপে মাঠ, দ্বিতীয় ধাপে সহর, তৃতীয় ধাপে সমুদ্র সৈকত। আমরা উঠে গিয়ে দাঁড়াই সর্বোচ্চ ধাপটিতে। এখান থেকে কত ছোট মনে হয় আমাদের জাহাজ। বেড়ির আকারে সৃষ্ট বন্দরটির ভেতরে আটকে পড়েছে বলে মনে হয়। স্বাভাবিক বন্দর নয় এটি। মনুষ্য সৃষ্ট। স্বাভাবিক বন্দর দেখেছি সিঙ্গাপুরে। পাহাড়ের বেড়া দেওয়া এমন একটি খাঁড়ি যার ভেতরে ঢুকতে পারে না সমুদ্রের ঢেউ। আহত হওয়ার ভয় থাকে না জাহাজের।

নিরালা স্থানটিতে এসে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করি—কি বলছিলে, বল।

মারী হঠাৎ আমার হাত দুটো চেপে ধরে বলে—সোরকার! মানুষের মনের যখন মিল হয় তখনই সেখানে জন্মায় ভালবাসা। তবুও আমার অনুরোধ আমাকে অপমান ক'রোনা তুমি।

বুঝলাম কি বলতে চাইছে ও। শুধু বুঝতে পারলাম না একথা হঠাৎ কেন এল ওর মনে। উত্তর দিই না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। সেই দৃষ্টিরই উত্তর দেয় মারী।

আমরা প্রায় ভেঙ্গে পড়বার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। সামান্যতম প্রলোভনও এড়িয়ে চলা কষ্টকর হ'য়ে উঠেছে আমাদের পক্ষে। তেরেসারা তোমার বন্ধুকে ভাঙিয়ে যতদূর আদায় করা যায়, করে নিচ্ছে।

আমারও সেইরকম সন্দেহ হ'য়েছিল। বলি আমি।

আরও আছে। আগামীকাল তোমাদের জাহাজেরই একজন নাবিক বিয়ে করবে এখানকার একটি মেয়েকে। হয়ত' এখানকার সেণ্ট সিরিয়্যাক ক্যাথেড্রালে ওদের বিয়ে হবে। তাই বলছিলাম আমাদের বন্ধুত্ব যাতে অমলিন থাকে সেই চেষ্টা করাই আমাদের উচিত হবে নাকি ?

অন্যরকম ভাববার কোন কারণ ঘটেছে কি ?

না। তবে মাঝে মাঝে এমন জোর কর—বলেই হেসে ফেলে সে, ভয় হয়, আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তুমি। তখন বাধা দেবার শক্তি কোথায় পাব ?

মারী !

বল।

আমরা কয়েকদিনের ভেতরেই এ্যাঙ্কোনা ছেড়ে যাচ্ছি। যে দু'চারদিন আছি, তোমার সঙ্গে আর দেখা না হওয়াই বোধহয় ভাল হবে।

কথা শেষ ক'রে আর দাঁড়াইনি সেখানে। লম্বা লম্বা পা ফেলে চেষ্টা করেছিলাম যত অল্প সময়ে ওর কাছ থেকে যতটা দূরে সরে আসা যায়। এমনকি একবার তাকিয়েও দেখিনি ওর দিকে। বিশ্বাস নেই মনের আবেগকে। ভালবাসতে গিয়ে হয়ত' ঐ সুন্দর মনটিকে চরম আঘাত দিয়ে ফেলব শেষে।

আবার ভেসেছি জলে। দক্ষিণের সদর দরজা পেরিয়ে যাওয়া নয়। আরও উত্তরের ভেনিস আমাদের লক্ষ্য। এ্যাঙ্কোনার কারখানায় তৈরী মালের রসদ নিয়ে গিয়ে ভেনিসের বন্দরে ঢেলে দিতে হবে। সেকস্‌পীয়ার প্রসিদ্ধ নগরী। জানিনা আজও সেখানে কোন শাইলক্ আছে কিনা। আছে কিনা পোর্সিয়ার মত কোনও নারী। স্বামীর বন্ধুকে এক কুসিদ-জীবির হাত থেকে বাঁচাতে যে উকিল সেজে এসে বিচারালয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপন বুদ্ধিমত্তায় উদ্ধার ক'রে নিয়ে গিয়েছিল এণ্টনিওর মত মহৎ প্রাণকে। তারা থাকে না, থাকবেও না কোনদিন। না থাকাটাই পরম সত্য।

আমাদের এ্যাঙ্কোনা বাসের মত। কিন্তু মারী থেকে যাবে আমার মনে। ভালবাসা অর্থেই যে জীবনটিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয়, সে পাঠ ওর কাছ থেকেই প্রথম নিলাম আমি। জীবনের একটি বিরাট দিকের মারী আমার শিক্ষাগুরু। জাহাজ ছাড়বার আগের দিন এসেছিল দেখা করতে। আমার পরণে তেল-কালি মাখা ওভার-অল। কেবল বেরিয়েছি ইঞ্জিনঘর থেকে। আমার মূর্তিখানি দেখে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলেছিল ও।

আহা, যা চেহারা হ'য়েছে!

এই আমাদের রুটি।

জানি। ঘরে যাবে না?

কেন?

কথা আছে।

চল।

সুখানীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে ঘর খুলে ভেতরে ঢুকতেই দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে হু হু ক'রে কেঁদে উঠেছিল মারী। আশ্চর্য হ'য়ে যাই ওর এই হঠাৎ ভাব পরিবর্তনে। দু'দিন আগের সেই শক্ত মানুষটা এমন ভেঙ্গে পড়ল কি ক'রে? দু'হাতে ওর দু'কাঁধ ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রে বলি—কি হ'য়েছে বলত'।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে সে—আমি তোমার মনে আঘাত দিয়েছি।

ও, এই কথা! হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি ওর কান্নার আবেগকে—আঘাত নয়, ঠিক যা তাই করেছিলে।

ছাই করেছিলাম। তোমার বন্ধুর মাপকাঠিতে ফেলে তোমার বিচার ক'রতে বসেছিলাম।

বেশত'। সাহচার্য গুণও ত' কিছু থাকতে পারে।

যত সরল ক'রে আনবার চেষ্টা করি ওকে ততই বেঁকে যায় ও। ঝাঁঝিয়ে ওঠে যেন নিজের ওপরেই—কি ক'রে পারে? ক'দিন ধরে মিশলে আমার সঙ্গে। নিঃশেষে নিংড়ে নিতে পারতে আমাকে। কৈ, নাওনিত'। সেইজন্যেই ত' এত ভাল লাগে আমার তোমাকে। তোমাকে আমি ভুলব না সোরকার। এ জিনিস ভোলা যায় না।

অদ্ভুত! বাস্তবের ওপরে দাঁড়ানো এক ভাবরাজ্যের মেয়ে। ভয় বেশি এদের নিয়েই। ভাবের আতিশয্য ঘটলেই শেষ হ'য়ে গেল। বাস্তবের বিচার আর আটকে রাখতে পারে না এদের। তেরেসারা তা নয়। ওরা জানে, ভোক্তা এবং ভুক্তির সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে ভাববাদের চাইতে বাস্তবের অর্থ জিনিসটি অনেক বেশি দামী। মারীও যদি তাই হ'ত তাহ'লে অনেকখানি স্বস্তি পেতাম আমি। এক কথায় ঝেড়ে ফেলতে পারতাম মন থেকে। তা নয়, হ'য়েছে ঠিক তার উল্টোটি। সেই হ'য়েছে এক জ্বালা। এদিকে বারান্দার ওপরে কুতুহলী চোখের আনাগোনা বুঝতে পারছি। কথার পালা সংক্ষেপ করবার জন্যে বলি—আমিও তোমাকে কোনদিন ভুলতে পারব না মারী।

চিঠি দেবে ত'?

নিশ্চয়ই। দাঁড়াও, একটি জিনিস তোমাকে দেবার আছে।

এডেন থেকে কিনে আনা তিনটি ফাউন্টেন পেনএর একটি বের ক'রে মারীর হাতে দিই।

এটা দিয়েই আমাকে চিঠি লিখবে, কেমন? আমি তোমাকে জানাব কোথায় বেশিদিন থামবে জাহাজ, সেই ঠিকানায় চিঠি দেবে।

কলমটি সযত্নে জামার সঙ্গে আটকে রেখে বলে ও—আমি যদি তোমাকে কিছু দিতে পারতাম।

নাইবা দিলে। একটুকরো হাসি দিয়ে সান্ত্বনা দিই ওকে—যা পেলাম তাই বা কম কি?

এরপরই এক কাণ্ড ক'রে বসেছিল মারী। দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে ওর গোলাপী পাতলা ঠোঁট দুটি চেপে ধরেছিল আমার গালে। তারপরই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

দিনেশ পালিয়ে বেড়াচ্ছে আমার কাছ থেকে। এমন কি খাবার সময়েও সেলুনে আসে না। বোধহয় ঘরে বসেই সেটা যাতে সারা যায় তার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে। জাহাজ নোঙর তুলতেই বেরিয়ে পড়ি তার খোঁজে। এবারে ত' আর বাইরে পালাবার রাস্তা নেই। খুঁজতে খুঁজতে ব্রীজের ওপরে উঠে দেখি রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ও। অন্যমনস্ক।

আমার আসাটাও জানতে পারেনি। আলতো পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পিঠের ওপরে একটা হাত রাখতেই চম্‌কে ওঠে।

এতই অন্যমনস্ক!

কথাটা ঠাট্টার সুরেই বের হয় আমার মুখ দিয়ে।

ও সে ভাবে নেয় না। গম্ভীরভাবে বলে—এক যুদ্ধে সবগুলি দেশকে কি ভাবে গুঁড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে দেখেচিস্ অশোক?

যুদ্ধের নিয়মই তাই।

আমি এমনভাবে আর উপলব্ধি করিনি কোনও দিন। তেরেসারা যেন উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে নিজেদের বিলিয়ে দেবার জন্যে। বিনিময়ে চাই রসদ, নইলে অচল হ'য়ে পড়ে সংসার। আর তাদের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হচ্ছি আমরা, জাহাজীরা। এত বেপরোয়া খরচ আর কেউ নাকি করে না। ক্রমে দূরে সরে যাওয়া এ্যাঙ্কোনার দিকে তাকিয়ে বলে যেতে থাকে দিনেশ —একদিন রোজাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কথাটা। উত্তর দিতে পারেনি। উল্টে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সে। বলেছিল—আমরা মরে গিয়েছি দানীশ। মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে এই পথই বেছে নিতে হয়েছে আমাদের। বাড়ীতে খাদ্য নেই, কলেজে পড়বার বই নেই, মাইনে জোগাড় করতে পারি না, যেদিকে তাকাই শুধু নেই আর নেই। বলতে পার দানীশ, কি করে বাঁচব আমরা? বিশ্বাস করবি না অশোক, আমার কোলের ভেতরে মুখ গুঁজে সে কি কান্না রোজার।

থেমে যায় দিনেশ। আমিও কোন কথা বলি না। জানি, যৌবনের উদগ্র কামনা নিয়েই সে মিশেছে রোজাদের সঙ্গে। কিন্তু দেখতে ভোলেনি ওদের মনের কোণে লুকিয়ে রাখা ব্যথা জর্জ্জরিত মানুষটিকে। দিয়েছে যেমন, লুটেছেও তেমনি। কিন্তু পুঁজিভরে যা এনেছে তা হচ্ছে রিক্তা ইটালীর চোখের জল।

সেই চোখের জল আর একবার দেখেছিলাম আমি যাভাতে। তখন আমি আর 'বিহঙ্গম্'এ নেই। থার্ড ইঞ্জিনীয়ার হ'য়ে চলে এসেছি 'অভয়া'তে। বুঝতে পারি বয়সের ভার নেমেছে শরীরে। কারণে অকারণে আর চঞ্চল হ'য়ে উঠি না। বোনের বিয়ের চিন্তা এসেছে

মাথায়। লেখাপড়ার পালা শেষ ক'রেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে ভাইটা। কেরানীগিরি ভাল লাগে না। অথচ অন্য কোন পরিশ্রমের কাজ করবার মত বাঁধুনি নয় শরীরের। তাছাড়া নিজে খুঁজে পেতে যে জুটিয়ে নেবে পছন্দসই কাজ, সে রকম তদ্বিরেও নয়। রেগে গিয়ে বলেছিলাম, তাহ'লে একটা পানের দোকান দাও। গ্রাজুয়েট ছেলের হাতের সাজা পান খেতে ভিড় করবে অনেকে। বুঝি, বলা উচিত হয়নি কথাটা। বড় হয়েছে, এখন তার প্রাপ্য সম্মানটুকু তাকে দিতে হবে বৈকি। কিন্তু কেমন যেন এক নিঃস্ব রিক্তভাব মাঝে মাঝে এসে জোর নাড়া দেয় মনটাকে ধরে। নিজের অজান্তেই হিসাব কষতে বসি, নিজেকে নিংড়ে শেষ করে দিয়ে বিনিময়ে কি পেলাম আমি। শূন্য কোঠার হাহাকার ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাই না। বিরাট এক একাকীত্বের বোঝা মাথায় নিরে ঘুরি রাস্তায় রাস্তায়। মায়ের আজকাল প্রায়ই অসুখ করে। ক্লান্ত দেহ, অবসন্ন মনের ক্ষোভ নিয়ে অনুযোগ করেন--হ্যাঁরে, যা করবার ক'রে ফেলবিতো। নাকি, এইভাবেই জীবনটা কাটাবি ঠিক করেছিস্? উত্তর দিতে পারি না সে কথার। চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকি মায়ের চেহারাখানি। একটু সেবার জন্যে উন্মুখ সংসার-ক্লান্ত এই মানুষটি। রাগ ধরে নিজের ওপরেই। মায়াও হয় চিনুর ওপরে। আমার জন্যে সে বেচারীও কি কম কষ্ট সহ্য করছে। কিন্তু কোনও অনুযোগ নেই। অস্থিরতার উৎপাদক বহির্মুখী চিন্তাধারা অন্তর্মুখী হ'য়ে বিলুপ্তি ঘটিয়েছে তার। দেখা হয় সেই স্কুলের ধারেই। দেখা হ'তেই মাথায় কাপড় টেনে দেয়। এক ঘোমটার কারসাজিতেই চেহারাখানি পালটে যায় তার। বৌ বৌ চেহারা, বেশ লাগে দেখতে। মুখে হাসি টেনে এনে এগিয়ে যাই। কৃত্রিম ধমকও খাই একটি—থাক্, আর হাসতে হবে না। চল, এগিয়ে যাই। কোথাও গিয়ে বসি। মনের ভেতরে আঁতিপাতি ক'রে খুঁজেও বসবার মত একটু নিরিবিলি জায়গা মেলে না। বিরক্ত হ'য়ে বলি—কোথায় বসব বলত'? এই ভবানীপুর অঞ্চলে এক সিনেমা হাউস ছাড়া আর বসবার জায়গা কোথাও নেই। চিনু হেসে বলে আছে। ধরতে পারি না ওর কথাটা। জিজ্ঞাসা করি—কোথায়? উত্তর মেলে—রেষ্টুরেণ্টের কেবিনে।

তাহলে ত' ট্রাম বাসেও বসবার জায়গা আছে। বলি আমি।

নাও, যথেষ্ট হয়েছে। এখন চলত'।

এগুতে থাকে চিনু। ঠিক বুঝতে পারি না কোথায় চলেছে ও। তবুও চলি। বিনা প্রশ্নে। মিনিট কুড়ির ভেতরেই এসে পৌঁছে যাই ন্যাশনাল লাইব্রেরীর এলাকার ভেতরে। স্থানটি বড় পছন্দ হয় আমার। সত্যি কথা বলতে কি, আমি চিনতামই না এই জায়গাটি। ভুলেই গিয়েছি যে এ সবেরও প্রয়োজন আছে মানুষের জীবনে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি কামারশাল বলা যায়, পাঠাগার হচ্ছে শান্ পালিশের জায়গা। আর আমি? না ইস্পাত, না লোহা। স্রেফ মাটি দিয়ে গড়া একটি থাবড়া থুবড়ো মূর্তি, যার শান পালিশ হয় না। জীবনে কত না আফসোসই থেকে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস বুঝি ঝরে পড়েছিল নিজের অজান্তেই। শব্দে ধরা পড়ে যাই।

তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে। দাঁড়িয়ে যায় চিনু, বলে—এস, এখানেই বসি।

সত্যিই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। বসতে না বসতে গড়িয়ে পড়ি ঘাসের বিছানায়। শুয়ে শুয়ে দেখতে থাকি ওর মুখখানি। আলতো হাসি একটা লেগেই রয়েছে। ঠিক ঠিক অর্থ করতে পারি না সেই হাসিটির। ব্যথার, না আনন্দের? ভাগ্যের নির্মমতায়, না তাকে বিদ্রূপ করে। তবুও হাসিতো! হাসতে পারছেতো! আমার মুখে যে তাও নেই। হাসতে গেলেই কেমন এক নিঃস্বভাব এসে উপস্থিত হয়। মনে হয়, হাসবার মত পুঁজি কোথায় আমার? হঠাৎ উঠে বসে হুমড়ি খেয়ে তাকাই ওর মুখের দিকে। ডাক দিই—চিনু!

দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে ওর গাল দুটির ওপর দিয়ে। আমার ডাকের উত্তর। সব বলা হারিয়ে যায় আমার। মাথাটা নীচু ক'রে আবার ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ি। পাশে বসে আমার স্ত্রী। যাকে আমার পরম আপনার জন বলে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না আমার নিজের সংসারে। একটি উন্মুখ মাতৃহৃদয় যাকে কাছে টেনে নেবার জন্যে আজও দিন গুণছে।

তুমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ।

মাথার চুলের ভেতরে অনুভব করি ওর হাতের স্পর্শ।

মা তোমাকে চান। বলি আমি।

ছিনিয়ে নিয়ে যাও।

কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত হলেও অন্তরের ইসারা তার কথায়।

পারি। তাতে তোমার মুখ থেকে ঐ মিষ্টি হাসিটি মুছে যাবে। ও আমার সহ্য হবে না। এক গড়ান দিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে মুখ তুলে তাকাই ওর মুখের দিকে—বল না আর একবার তোমার বাবাকে।

বাবার অবস্থা তুমি দেখনিগো। সমবেদনা ভরা গলায় বলে চিনু, বৌদির অত্যাচার আর অবহেলায় ক্রমেই ভেঙে পড়ছেন। মাঝে মাঝে বলেন—মারে, বুঝি। বুঝেও কিছু করতে পারছি না। আগে পারিনি জেদে, এখন পারি না ভয়ে। ভয় হয় তুই গেলে ওরা না খেতে দিয়েই মেরে ফেলবে আমাকে। নইলে, এইত' দেখ না, নিজের ছেলে কোনদিন একটা কমলা এনেও বলল না—বাবা, খাও। অথচ যাকে কোনদিন মেনে নিলাম না, সেই পরের ছেলেটি দূর থেকেই জানায় তার শ্রদ্ধা।

আশ্চর্য হ'য়ে যাই চিনুর কথা শুনে। আমিত' কোনদিন ভুলেও কিছু পাঠাইনি ওর বাবাকে; তাঁর জেদের মত আমার জেদও কিছু কম ছিল না। আত্মীয় বলে কাছে টেনে নিলে তবেই যাব, নইলে নয়।

কিন্তু আমিত' কোনদিন—

তোমার দেওয়া আর আমার দেওয়া কি আলাদা? মুখ মেরে দিল চিনু—তুমি যখন এখানে ফিরে আসো, তখন প্রায়ই কিছু কিছু ফল কিনে নিয়ে গিয়ে বাবাকে দিই, বলি, তুমি পাঠিয়েছ। বাবা দু'হাত দিয়ে ফলগুলো নেড়েচেড়ে দেখেন। মুখে কিছু বলেন না বটে কিন্তু চোখে দেখেছি তাঁর বুক ফাটা কান্না। এর ভেতরে এক মজা হ'য়েছিল, জান? ওঠো না, তোমার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মাথাটা ধরে ঝাঁকাতে থাকে চিনু।

আমাকেও যেন ভূতে পেয়েছে আজ। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে সোজা ওর কোলের ওপর তুলে দিই মাথাটা।

তুমি মেরে ফেল আমাকে। মাথা নামাও, লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে ধরছি—কাকুতিতে ভেঙে পড়ে সে, ঐ যে দু'জন লোক আসছে। তাড়াতাড়ি দু'হাতে মাথাটা তুলে ধরে আমার। উঠে বসি এবারে। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে ও—কি দস্যি মানুষ, বাব্বাঃ, আর কোনদিন নিয়ে আসছি না এখানে। তোমার ট্রাম বাসই ভাল।

কি বলছিলে যেন? জিজ্ঞাসা করি নিরীহ ভাল মানুষটির মত।

আহা, কি বলছিলে যেন? সে কি আর মনে আছে কিছু? সত্যি, তুমি এমন কর মাঝে মাঝে, ভয় হয় বুঝি এখুনি আমাকে টেনে নিয়ে যাবে বাড়ী।

সেই ইচ্ছাই যে করে তা কি বুঝতে পারনা তুমি?

লক্ষ্মীটি, তুমিত' অবুঝ নও। বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে চিনু, বাবার শরীর যে রকম ভেঙে পড়েছে আর বৌদির যা অত্যাচার—

জানি। থামিয়ে দিই ওকে। ওর বাবার কথা শুনতে আর ভাল লাগেনা আমার। কঠিন হ'য়ে যায় গলার স্বর, আমার অজান্তেই—সবার কথাই সকলে ভাবল, ভাবতে ভুলে গেল শুধু আমার কথাটা। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল এই খেলার? একজন তাঁর জেদ বজায় রেখে বহাল তবিয়তে দিন যাপন করবেন আর একটি মা সমস্তটা জীবন শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যাবে! উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াই আমি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর মাথাটা নুয়ে পড়েছে মাটির ওপরে। দুঃখ হয় ওর অবস্থার কথা ভেবে। তবুও থামতে পারিনা, রুখতে পারিনা নিজের ভাষাকে। সোজা বলে চলি—তার চাইতে ভেঙে দাও এই খেলার পালা। তাতেও বরঞ্চ শান্তি পাব। ভাবতে পারব এই দুনিয়ায় আমি একা, কেই নেই আমার কথা ভাববার, দুটো মিষ্টি কথা বলে আমার শ্রান্তির বোঝাটি লঘু ক'রে দেবার।

যে কথা বলব বলে ভাবতেও পারিনি কোনদিন, সেই কথাই সেদিন ওরকম উত্তেজিতভাবে বলে ফেলে আর দাঁড়াতে পারিনি তার সামনে। একরকম পালিয়েই এসেছিলাম চিনুর সামনে থেকে। শুধু সামনে থেকে নয়, কলকাতা থেকে। জাহাজ ছাড়বার নোটিশ পেয়ে গিয়েছি। তাই গিয়েছিলাম চিনুর কাছে বিদায় নিতে। হয়নি বিদায় নেওয়া। যে

আচরণ ক'রে এসেছি সেদিন তারপর আর তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস হয়নি। পরদিন সকালে বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে এসে উঠেছি জাহাজে। ভাল লাগছে না কিছুই। এতবার ছেড়েছি কলকাতার বন্দর, এরকম ভাঙা মন নিয়ে একবারও নয়। থেকে থেকেই ধিক্কার আসছে মনে। শুধু আমার কথাটাই ভাবলাম? কৈ, চিনুর কথাটিত' একবারও ভাবলাম না? কষ্ট তারও কি কিছু কম! অস্বস্তিতে অস্থির মন। ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি অন্ততঃ লেখা উচিত তাকে? মনের ভার কিছুটা লাঘব হ'তে পারে তাতে। জাহাজ থেকে নেমে পড়ি। যেতে হবে একবার ডাকঘরে। আনমনা চলেছি অকল্যাণ্ড রোড ধরে এমন সময় সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়ায় মেয়েটি—বাবু, কয় আনা পয়সা দিব্যান? মানুষডা কাইল থিকা কিচ্ছুই খায় নাই।

মেয়েটিকে এর আগেও কয়েকদিন পয়সা দিয়েছি। ঐ একই বুলি ওর—মানুষডা খায় নাই। মানুষটি যে কোন মহাপুরুষ, যার জন্যে এমনভাবে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায় একটি মেয়ে, তা এখনও জানবার সৌভাগ্য হয়নি আমার। শুধু মেয়েটিকেই কিছুটা জেনেছি। হাইকোর্ট ট্রামডিপোর পাশে ছোট ছোট ঝুপড়ি তুলে বাস করছে যে উদ্বাস্তুর দল, মেয়েটি তাদেরই একজন। সংসারে আপনার জন বলতে কেউ নেই তার। কয়েক ঘর গ্রামবাসীর সঙ্গে পাকিস্থান থেকে পালিয়ে এসেছে। আছে তাদেরই ঝুপড়ির পাশে আর একটি ঝুপড়ি খাড়া করে। এই পর্যন্তই শুনেছি মেয়েটির মুখে।

অন্যান্য দিনের মেজাজ নেই আজ। পয়সা চাইতেই রাগ ধরে যায়। নিজের চলে না, আবার শঙ্করাকে ডাকে! খিঁচিয়ে উঠি আমি—তাড়িয়ে দিতে পার না মানুষটাকে?

না, না, ও মানুষ, কাতরে ওঠে মেয়েটি, খুব বালো মানুষ বাবু। অরে না দ্যাখলে না খাইয়া মারা পরবে বাবু। দ্যান বাবু কয় আনা পয়সা।

মেয়েটির অন্তর বুঝব কি, নিজের অন্তরই যে রয়েছে অচেনা। কে একটা মেয়ে আর কোথাকার একটা পথের ভিক্ষুক, তারা খেতে পেল

কি না পেল তাতে কি এসে যায় আমার ? তবুও একটা পুরো টাকা তার হাতে দিয়ে বলি—কোন একটা কাজের চেষ্টা কর। আমি আজই চলে যাচ্ছি, আরত' পয়সা দিতে পারব না। তারপর আর দাঁড়াই না সেখানে। ডাকঘরে যেতেই হবে আমাকে।

ফিরে আসছি ডাকঘর থেকে। চিনুকে চিঠিখানা লিখে এখন বেশ হাল্কা বোধ হচ্ছে নিজেকে। লিখেছি, এবারে আর বেশীদূর নয়, ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ঘুরেই চলে আসব। বড় জোর মাস দেড়েক লাগতে পারে। ফিরে এসেই দেখা করব। তখন যেন অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে থেক না তুমি, লক্ষ্মীটি। মুখ ভার ক'রেও থাকবে না। তোমার মুখের সুন্দর হাসিটিই আমি দেখতে চাই। সম্ভাষণ জানিও ঐ হাসি দিয়েই। যা বলেছি, আমার মনের অবস্থা দিয়ে তার বিচার করো। ক্ষমা আমি চাইব না। তার কারণ ক্ষমা আমি পেয়ে গিয়েছি বলেই ধরে নিয়েছি। ভালবাসা নিও। ইতি—

মনের কথাটা বলতে পারা বড় সহজ কাজ নয়। বলতে না পারার জন্যেই সৃষ্টি হয় যত ঘোর প্যাঁচের। ফুরফুরে মন নিয়ে এগিয়ে চলেছি ট্রামডিপোটার পাশ দিয়ে। দেখি সেই মেয়েটি। কয়টি ইঁট সাজিয়ে উনুন বানিয়ে নিয়ে ভাত রাঁধছে। তার পাশেই সেই মানুষটি। দু'হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে কি একটা গানের সুর ভাঁজছে গুন্ গুন্ ক'রে। আপনিই থেমে যায় আমার পা। সর্বহারা একটি মেয়ে যার জন্যে এতখানি চিন্তা করে তাকে একবার দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারি না।

কান্দ ক্যান্? বলে ওঠে মেয়েটি, এই যে বাত হইয়া গেল বইলা। কথার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি শুক্‌নো পাতা, খড়কুটো ঢুকিয়ে দেয় উনুনের ভেতরে, জ্বাল বাড়াবার জন্যে।

ওদের কাছ থেকে একটু দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি আমি। আশে পাশে আরও কয়েকটি উনুন জ্বলছে। পট্‌পট্ শব্দ উঠছে জ্বলন্ত পাতা আর শুকনো ডালপালার। সেদিকে তাকাবার মত অবসর নেই আমার।

একদৃষ্টে চেয়ে আছি ঐ ক্রন্দনরত মানুষটার দিকে। কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। অথচ ঠিক ধরতে পারছি না। মাথার ঐ ঝাঁকড়া গুচ্ছ চুলগুলি যদি পাট ক'রে দেওয়া যায়! পরিষ্কার ক'রে দেওয়া যায় ঐ দাড়ি গোঁফের জঙ্গল! ঠিক। ছুটে গিয়ে তার কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকি দিই আমি—দিনেশ, দিনেশ! চম্‌কে ওঠে ও। মুখ তুলতেই আমার সন্দেহ সঠিক প্রমাণ হ'য়ে যায়। ওর একখানা হাত ধরে টানতে থাকি আমার বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে—ওঠ্, চল্ আমার সঙ্গে। ছুটে এসে আমার হাত থেকে মেয়েটি ওকে ছিনিয়ে নেয়।

ক্যান্, নিয়া যাবা, ক্যান্? অরে আবার পাগোল করার লইগ্‌গা? ক্যান্? এত হাউস ক্যান্? কি, করছে কি ও তোমার?

একটানা কথাগুলি বলেই ফিরে তাকায় দিনেশের দিকে। একমুহূর্ত্ত পূর্বের উত্তেজিত গলার স্বরকে যতদূর সম্ভব নরম ক'রে বলে—বস দেহি, বইসা যাও, আমি বাত বাইড়া দেই, খাইয়া লও। তারপরই আবার ঝাঁকি মেরে ওঠে আমাকে লক্ষ্য ক'রে—এঃ, কিডা যে কইছিল কথা, সিই কথার কথা। চ দেহি আমার লগে! যাও, নিয়া যাও অরে, তোমার মুরাদখান্ দেহি। ট্যাহাখান্ দিয়া মাথাখান্ কিনছ আমার। লও, লইয়া যাও তোমার ট্যাহা। আঁচল থেকে খুলে কিছুক্ষণ আগে আমারই দেওয়া এক টাকার নোটটা এগিয়ে ধরে আমার দিকে—ন্যাও, লইয়া এ্যাহুনি চলিয়া যাও এইহান থিকা।

রাগ করবার শক্তিটুকুও হারিয়ে গিয়েছে আমার। আশ্চর্যের শেষ সীমায় এনে দাঁড় করিয়েছে আমাকে মেয়েটি। যে মানুষ একটু আগেই ভেঙে পড়ছিল কাকুতিতে, এতখানি শক্তি তার কোথা থেকে আসে? এমন কোন সম্পদের অধিকারিণী হ'য়েছে যার জোরে দাতাকেও অগ্রাহ্য ক'রে তার দান ফিরিয়ে দিতে তিলমাত্র ইতস্ততঃ করে না সে? জানতে হবে সেই কথাটিই। অন্যরকম কিছু সন্দেহ হওয়ায় আশপাশের কয়েকটা ঝুপড়ি থেকে এসে দাঁড়িয়েছে ক'জন লোক। একবার ভেবেছিলাম জিজ্ঞাসা করি, আজকের চাল কিনবার জন্যে টাকা চেয়ে নিলে অথচ টাকাটা ত' আস্তই রয়েছে দেখছি। মুখ থেকে খসতে দিই না সে কথা।

স্ত্রীলোক এবং টাকা—সহজবোধ্য অর্থটিই ধরে নেবে সকলে। সে রাস্তা ছেড়ে অন্য প্রশ্ন পাড়ি—দিনেশের সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?

ঐ মানুষডাত'? ঝুপড়ি-বাসীদের একজন বলে ওঠে—সে বাবু হইছে অনেক দিন অইল। ঐ গঙ্গার ধারে পইরা আছিল। না খায়্যা না খায়্যা মরবার জুগাড়। আমাগো ফন্তিরও যতো ঐ খোঁজ। নিজির প্যাটে বাত জোঠে না, ইদিক আর মানুষের মুখে দানা নাই' ত্যাখলেই পাগোল অইয়া যায়। গিছিল বুঝি কুন্ কামে গঙ্গার ধারে। মানুষডাক্ দেইখাই ছোটতে ছোটতে আইল পাগোলের মতন। তহনি বাত রাঁইধা লইয়া গেল। নিজির হাতে বইসা বইসা খাওয়াইল অরে। তারপর মানুষডা একটু য্যানো দম পাইল। সেই থিক্যাই ও ফন্তির ঐখানেই থাকে। তা বাবু মানুষডা কি আত্মজন হয় আপনার?

উত্তর দিই না তার প্রশ্নের। চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকি ছিন্নবাস অর্দ্ধ-আবরিতা ঐ মেয়েটিকে। মিলে গিয়েছে ওর সম্পদের খোঁজ। অতবড় অন্তর না হ'লে এভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে না কেউ। স্বার্থ-চিন্তা মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না কোনদিন। এরা সেখান থেকে অনেক দূরে। নিঃস্বার্থতায় এরা অসীম উদার, উন্নত-গ্রীব।

এক পা এগিয়ে যাই ফন্তির দিকে। বলি—ফন্তি, দিনেশকে সাবধানে রেখো। ওরও তোমারই মত বিরাট অন্তর ছিল। আঘাত খেয়েই আজ ওর এই দশা। একটু মায়া, মমতা, ভালবাসার কাঙাল। আবার হয়ত' ও ভাল হ'য়ে উঠতে পারে। সেদিন দেখো, ও তোমাকে মোটেই ভুলবে না।

কোটের পকেট থেকে দু'খানা দশটাকার নোট বের ক'রে এগিয়ে ধরি ফন্তির দিকে। হাত টান দিয়ে নেয় ও। তাকায় দিনেশের মুখের দিকে। আমিও আর এক পা এগিয়ে গিয়ে দিনেশের মুখখানা ঘুরিয়ে ধরি। জিজ্ঞাসা করি—কিরে? টাকা নিবি না আমার?

আমার চোখের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে ও। স্পষ্ট দেখতে পাই আমি, মূক চোখদুটিতে তার একটু একটু ক'রে ফুটে উঠছে সহজ স্বাভাবিক মানুষের ভাষা। ক্রমে স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট হয় তা। তারপরই

হঠাৎ দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ওঠে সে। আমার চোখও খুব শুকনো নয়। তবুও সান্ত্বনা দিই ওকে—তুই আবার ভাল হ'য়ে উঠবি দিনেশ, আবার ভাল হ'য়ে উঠবি। ঐ ফন্তিই তোকে ভাল ক'রে তুলবে। তারপর আবার আমাদের সঙ্গে উঠে আসবি জাহাজে। একসঙ্গে পাড়ি দেব বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর; যাব ইটালী, রোম, ইংলণ্ড, জার্মানী, কত দেশ, কত বন্দর। তারপর একদিন আবার ফিরে আসব ক'লকাতার বন্দরে। পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ফন্তি। রুমাল উড়িয়ে স্বাগত জানাবে তোকে—

আমি যাব, আমি যাব—ফিস্ ফিস্ করে ওঠে দিনেশ। আমি স্পষ্ট অনুভব করি তার দেহের কম্পন। পূর্বস্মৃতি ফিরে পাওয়ার উত্তেজনা। উত্তেজিত হ'য়ে উঠি আমি নিজেও—আশা হারিয়ে যায় নি তাহ'লে আজও। এখনও চেষ্টা করলে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠতে পারে ও।

কানের কাছে অস্ফুটে বলে চলেছে দিনেশ—তেরেসা, রোজা, বড় ভাল মেয়েরে ওরা। কেঁদেছিল, আমার কোলে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল রোজা। বলেছিল—দানীশ! বাঁচতে চেয়েছিলাম, তাই এইভাবে মৃত্যুবরণ ক'রে নিতে হ'ল আমাদের। উপায় নেই দানীশ। জীবনটাকে যে এখনও ভালবাসি।

এক ঝাঁকি দিয়ে ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধরি ওর হাত দু'খানা। কড়া সুরে বলি—হতভাগা, ওরা ভালবাসে জীবনকে, তুই ভালবাসিস না? তবে কেন হারিয়ে ফেলেছিস্ নিজের শক্তিকে? চল্। আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে তারপর আসবি। আর ফন্তিকে ছেড়ে কোথাও যাবি না।

আবার এগিয়ে ধরি নোটদুটি ফন্তির দিকে। এতক্ষণে আমার সঙ্গে দিনেশের সম্বন্ধ বুঝে ফেলেছে সে। দৃষ্টিও সেইমত গিয়েছে বদলে। নোটদুটি হাত পেতে নিতে আর আপত্তি করে না। বলে—বাবু, মানুষডার একখান্ কাপোড় কিন্যা দেওন যায় না?

সে কথা আমিও ভাবছি, উত্তর দিই আমি, কিন্তু হাতে যা টাকা আছে আর ত' দেওয়া চলে না তা থেকে। চিন্তা করতে থাকি, কি করা যায় এ

অবস্থায়। শুধু দীনেশেরই নয়, কন্তির শাড়ীর যা অবস্থা তাতে ওর আবরু রক্ষার ব্যবস্থাই আগে করা দরকার।

এক কাজ কর, ফন্তিকে বলি, আমার সঙ্গে এস। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি আমার মায়ের নামে। সেই চিঠি নিয়ে কাল যেও মায়ের কাছে। ধুতি, জামা, শাড়ী সব পাবে।

নিশ্চিন্ত মনে দিনেশের হাত ধরে অগ্রসর হই আমি। আর পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ফন্তি অনুসরণ করতে থাকে আমাদের।

জাহাজে উঠতে গিয়েও ওঠা হয় না। পাড়ের ওপরেই ঠেক্ খাইয়ে দেয় অনন্তরাও। বহুদিন পরে দেখা এই মানুষটির সঙ্গে। আনন্দাতিশয্যে তার হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করি, কেমন আছেন রাও?

সে আনন্দে পুরোপুরি সাড়া দিতে পারে না রাও। মুখের ওপরে নেমে আসে বিষণ্ণতার ছায়া। বলে—ভাল আর কোথায়? অভিজ্ঞতা এবং পারদর্শিতার দাম নেই আর।

ধরতে পারি না ঠিক ওর কথাটা। শুধু একটা সন্দেহের ছায়া উঁকি-ঝুঁকি মারছে মনের কোণে। এ ধরণের কথা কখন ত' বলে না রাও। বরঞ্চ এর ঠিক উল্টোটিই বলত। ছোট খাট অসুবিধের কথা যখনই আমি বলতে গিয়েছি তখনই ও এস্ এস্ কমলার মালিক পক্ষের হ'য়ে তর্ক করেছে আমার সঙ্গে। তাদের বৃহৎ বিবেচনার উদাহরণ দিয়ে, তর্কের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে আমার। আজ তাই ওর কথা শুনে আশ্চর্যই হ'য়ে যাই। জিজ্ঞাসা করি—কি হ'য়েছে বলুন দেখি।

কি আবার হবে? বলে ওঠে রাও। তদ্বিরের যুগ মশায়। এতদিন ধরে কাজ করছি। রিপোর্টও ভাল। কাজ করে চলেছিলাম নিশ্চিন্তে। এমন সময়ে কাকে খুশি করবার প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল কোম্পানীর। বাস, আমি হয়ে গেলাম অপ্রয়োজনীয়। এখন বসে আছি দু'মাস ধরে। বাড়ী থেকে চিঠি আসে—টাকা পাঠাও। কোথা থেকে পাঠাব বলতে পারেন? বলতে বলতে গলা আরও চড়ে যায় রাওএর—হবে না? হতেই হ'বে।

আর্টিকল্‌এর ওপরেই জীবন কাটে আমাদের। পাকা চাকরীর তো আর ব্যবস্থা নেই। তারপরই আবার চিন্তিতভাবে বলতে থাকে—কি যে করি এখন ? এদিকে বয়স গিয়েছে বেড়ে—

আপন মনে গজর গজর ক'রতে করতে চলে যায় রাও। আমি দাঁড়িয়ে থাকি হতভম্বের মত। একেবারে অস্বীকার করতে পারি না ওর কথাগুলি। এই কিছুদিন আগে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গিয়েছে একজন লস্করের বাড়ীতে। বেচারীর আর্টিক্‌ল্‌এর ছ'মাস কেটে যাবার পর আর কোথাও কাজ পায় না। এদিকে অন্য কোন কারখানায় কাজ খুঁজে নেওয়ার পক্ষে বয়স গিয়েছে বেড়ে। দিনের পর দিন জাহাজী কোম্পানী গুলির দরজায় হত্যা দিতে থাকে। ফল হয় না কিছুই। অর্থাভাবের অশান্তি প্রকট হ'য়ে উঠতে থাকে সংসারে। যারা পরমুখাপেক্ষী, গঞ্জনা বাক্যগুলি আবার তাদের কাছ থেকেই আসে বেশি। লস্করটির স্ত্রী এবং মাও তার ব্যতিক্রম হয় না। সারাদিনের পরিশ্রম, হতাশা, তার ওপর গঞ্জনা। সহ্যশক্তির সীমানা ছাড়িয়ে যায়। সেই অবস্থাতেই একদিন স্ত্রীর কটুক্তি সহ্য করতে না পেরে হাতের কাছে যা পেয়েছিল তাই দিয়ে বৌটির মাথায় বসিয়ে দিয়েছিল প্রচণ্ড এক আঘাত। ফলে আজ সে ভোগ করছে যাবজ্জীবনের মেয়াদ।

থেমে গিয়েছে চলা। থামিয়ে দিয়েছে রাও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি ওকে। এগিয়ে চলেছে। ভেতরকার জ্বালাটাই ওকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে দেয় না কোথাও। নিরাপত্তাহীন জীবনের অভিশাপ ওর মাথায় বর্ষিত হয়েছে। বুঝতে পারি ওর ব্যথা। কিন্তু করতে পারি না কিছুই। দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে আমাকেও এগুতে হচ্ছে অতি সাবধানে। বিভার পাত্র দেখা চলেছে। মায়ের শরীর ক্রমেই দুর্বল হ'য়ে পড়ছে। কেবলমাত্র ওষুধের ঠেক্‌না দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে হচ্ছে। আমি আর আমি নই শুধু। আমি ওদের ক্ষুধার অন্ন, অঙ্গের পরিধান, রোগের ওষুধ।

আনমনা বুঝি হাঁটতে আরম্ভ করেছিলোম। হঠাৎ একটা খিল্‌ খিল্‌ হাসির শব্দ কানে যেতে চম্‌কে ফিরে দাঁড়াই। অদ্ভুত এক দৃশ্য। দেখে

হকচকিয়ে যাই। একদিকে রেলিঙ আর একদিকে ঢালু বাঁধ, তারপরেই গঙ্গা। রেলিঙের ওধারে পোর্ট কমিশনার্সের রেলের লাইন। এধারে এক পেয়ে রাস্তা আর মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। তারই মাঝখানে ধরা-ছোঁয়া খেলায় মেতে উঠেছে দিনেশ আর ফন্তি। খেয়াল নেই ওদের যে এই দিনের বেলায় গঙ্গার ঘাটে চোখের অভাব হয় না। আর তাদের কাছে এই খেলার অর্থ অন্য কিছুও হ'তে পারে। রাগ ধরে আমার। এ কি ধরণের অসভ্যতা! জোর একটা চীৎকার ক'রে উঠতে যাব, এমন সময় দিনেশের ধরে ফেলা হাতখানি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে বলে ওঠে ফন্তি—বারে, আমি যামু ক্যান্? তোমার বন্ধু তোমারে নেমন্তন্ন করছে, আমারে তো কয়নাই। যাওনা, আমি পাডে খাড়াইয়া আছি। তুমি খাইয়া আসে গিয়া।

তুমি যাবে না? দিনেশের গলায় অভিমানের সুর।

না। মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে ফন্তি—তুমি এক্কেবারে পোলাপান। ভীষণ খারাপ দেহায়।

তাহ'লে আমিও যাব না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে দিনেশ।

শোন, শুইনা যাও—ফন্তিও হাঁটতে থাকে দিনেশের পিছন পিছন।

খাওয়াটা এখানে বড় প্রশ্ন নয়। আমি চেয়েছিলাম ওকে নিয়ে গিয়ে একদা পরিচিত আবহাওয়ার ভেতরে ফেলতে। হয়ত' তাতে কোনও কাজ হ'তে পারে। এই ছিল আশা। কিন্তু যা দেখলাম তাতে একটু বিরক্ত হ'লেও আশা পেলাম বেশি। ক্রমেই নিরভ্র হ'য়ে চলেছে ওর মনের আকাশ। শুধু একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। ওর মনের এই অনাবিল শান্তির মাঝখানে কেউ না তোলে আবার ঝড়ের বাতাস।

জাহাজে ওঠা আর হয় না। আবার হাঁটতে থাকি ট্রামডিপো লক্ষ্য ক'রে। সবটা পথ যেতে হয় না আমাকে। কিছুদূর যেতেই দেখি একটা দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিতে বসে গিয়েছে দুই যদ্‌ভবিষ্য। আমার দেওয়া টাকার সদ্ব্যবহার ক'রে চলেছে একাগ্রচিত্তে। পিছনে যে আর একটি মানুষ গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে খেয়ালও নেই ওদের। একবার দিনেশ

হুকুম করছে ফন্তিকে মিষ্টি দেবার জন্যে আর একবার ফন্তি হুকুম করছে দিনেশের খালি প্লেট ভরে দিতে।

এই হতভাগা, আজ সব গিলে রাখলে কাল খাবি কি ?

ভীষণ এক চম্‌কানি খেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় দু'জনেই। হাঁ করা মুখের ভেতরে অর্দ্ধ-চর্বিত খাবারের অংশ দেখা যাচ্ছে। ফন্তির চোখে অপরাধ ধরা পড়বার ভয়। দিনেশের তা নেই। অবাক হয়েছে সে এমন সুখের খাওয়া বিঘ্নিত হওয়ায়।

পেট ভরেছে ? না, বাকী আছে কিছু ?

ভরছে। উত্তর দেয় ফন্তি।

দামটা মিটিয়ে দিতে গিয়ে দেখি দু'জনে মিলে চার টাকার ওপরে গিলে রেখেছে। রাখুক। আর ক্ষমতার ভেতরে যদি হয় তাহ'লে খরচ করতেও রাজী আমি। মোটকথা, ফেরবার মুখে দিনেশ। এ অবস্থায় ওকে ছেড়ে দিয়ে চিরজীবনের মত হারানো যায় না। টাকা মিটিয়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে দাঁড়াই একটু ফাঁকা জায়গায়। ফন্তিকে সাবধান ক'রে দিই এভাবে বেহিসাবী খরচ না করতে। তার চাইতে কিছু চাল ডাল কিনে রাখা ভাল।

বারে, চুরি করিয়া নেয় যে।

তাওত' বটে! যুবতী মেয়েকে তারা বুক দিয়ে আগলে রাখতে রাজী। কিন্তু চাল ? ক্ষুধার অন্ন ? সেখানে মায়া দেখাবার মত দুর্বলতা পদ্মার ওপারে রেখে এসেছে তারা। এপারে এসে দেখেছে মা অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার তাদের জন্যে খালি। কিন্তু খালি বললেই ত' হবে না। শিশুর মতই অবুঝ এই পেট। ঠিক সময়ে তার প্রয়োজন না মেটাতে পারলেই কাঁদতে আরম্ভ করে। যেখান থেকে হ'ক, যেমন ক'রে হ'ক, বাঞ্ছিত দ্রব্য তার চাই-ই চাই। তা সে চৌর্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি অথবা ভিক্ষাবৃত্তি, যে বৃত্তিই অবলম্বন করুক না কেন। অতএব চাল ডাল কিনে রাখা চলে না ফন্তির।

বুঝলাম। কিন্তু টাকা ফুরিয়ে গেলে কি করবে ?

ফন্তি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করেছে কি না জানবার জন্যে জিজ্ঞাসা করি আমি।

ক্যান, অয় রোজ্জগার কোরবো। নিত্যদিনই আমি ভিক্ষা কইরা খাওয়ামু নাহি?

ওর কথার ভেতরে অদ্ভুত এক দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। আশা হয়, এই মেয়েটিই হয়ত' আবার কাজে মন বসাতে পারে দিনেশের। আপন সাহচর্য দিয়ে যতখানি টেনে তুলেছে ওকে, তাতে নিশ্চিন্ত মনেই ওর হেফাজতে রেখে যাওয়া যায় হতভাগ্যটিকে। তাড়াতাড়ি ডাইরীর একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মায়ের নামে একটা চিঠি লিখে দিই। সেখানা ফন্তির হাতে দিয়ে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিই কিভাবে যেতে হবে আমাদের বাড়ী। আর বার বার ক'রে সাবধান ক'রে দিই ওকে, হতভাগাটার মনে যেন আবার আঘাত না লাগে। তারপর বহুদিন পরে এক পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে এসে উঠি জাহাজে।

দ্বীপ নয়, দ্বীপের আড়ৎ। কলকাতা থেকে একটানা ১৬৩০ মাইলের ধাক্কা কাটিয়ে তবে সিঙ্গাপুর। মালাক্কা প্রণালীর ওপরে। তার ওপারে সুমাত্রা। বাংলাদেশের মানুষ আমি। সমতলভূমি দেখতে অভ্যস্ত। পাহাড় কোথায় আছে খুঁজে নিতে হয়। দ্বীপগুলির দেখি উল্টো ব্যবস্থা। সমতলকেই খুঁজতে হয় পাহাড়ের বেড়ার আড়ালে। কিন্তু ধূসর নয় তাদের চেহারা। সবুজের জাজিম পাতা। মাথার ওপরেও টাঙানো সবুজ সামীয়ানা। পথ চলতি মানুষের কোনও পুষ্করিণীর ধারে বসে ক্ষনিক বিশ্রাম নেওয়ার মতই থামা আমাদের। একটি দিনের কাজ। তারপরই ছুটতে হবে বোর্ণিওর দিকে। জাহাজের লস্করেরা সবাই ব্যস্ত। কাজে নয়, সংস্কারের আকর্ষণে। বিষুবরেখা পেরিয়ে গেলেই নাকি সমুদ্রের সম্রাট নেপচুনের বিচারালয় বসবে। এ বিষয়ে অগ্রণী আমাদের মেঘা। ছেলেটাকে দেখলেই মনে পড়ে জ্যাকি খাঁর কথা। গো-মুখীর মতই অফুরন্ত এর জীবনী-শক্তি। জ্যাকির ভেতরে ছিল ব্যথার একটি

অন্তঃপ্রবাহ। মেঘার সে সবের বালাই নেই। ওর আবার একটা কবিতার খাতা আছে। দেখিয়েছিল একদিন আমাকে। তার প্রথম পাতাতেই লেখা—

ব্যথার পণ্যে পসরা আমার
ভরব না গো ভরব না,
সুন্দর এই জীবনটি মোর
অশ্রুসজল করব না।

জানি না সুন্দর কোথায়। কাজত' করে অগ্নিবর্ষী ঐ খোলের ভেতরে। দৈনিক পরমায়ুর সবটাই যেখানে খুইয়ে দিয়ে ওভার-ড্রাফট ক'রে আগামী দিনের পরমায়ু থেকে কিছুটা ধার নিয়ে এসে তবে আজকের দিনটা বাঁচতে হয়। তবুও সুন্দর! তাহ'লে চোখদুটি ওর সত্যিই তুলনাহীন। ক্ষীরাম্বুমধ্যাৎএর মত সকল অসুন্দরকে ছাঁটাই করে ফেলে সারবস্তুটুকু দেখা, এ যার তার কাজ নয়। স্বভাব-সুন্দর-পিয়াসী বুঝি একেই বলে।

প্রথম দিনই বলেছিল—ছার, এই জায়গাখান বড় একঘাইয়া লাগে। গান গাই যদি অপরাধ নিব্যান না তো?

হেসে ফেলেছিলাম ওর কথা শুনে। গান গাইবার উপযুক্ত আব-হাওয়াই বটে। তা গাক্। হ্যা হ্যা ক'রে কিছুক্ষণ চীৎকার ক'রে শেষে আপনিই থেমে যাবে। আমি মাঝখান থেকে 'না' বলে অসন্তুষ্টির কারণ হ'তে যাই কেন? বলেছিলাম—বেশত', ভাল লাগলে গাইবে।

গেয়েছিল মেঘা।

গান নয়। সুরের সূতোয় গাঁথা বাণী-ফুলের মালা। উপলক্ষ্য ঐ সুন্দর। আর শুনেছিলাম ওর গলার কাজ। আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলাম ছেলেটির এই বিশেষ গুণের খোঁজ পেয়ে। মনে হ'য়েছিল কি এক রহস্য যেন লুকিয়ে আছে এই ছেলেটিকে ঘিরে। প্রকাশ নেই তার কোনও কাজে। তাই আরও দৃঢ় হয় সন্দেহ—ও যেন জোর ক'রে ভুলিয়ে রাখে নিজেকে। সযত্নে লুকিয়ে রাখে নিজের ক্ষতস্থানটিকে।

ওর আর একটি গুণের খবর পেয়েছিলাম আসবার সময়ে। পড়ে

গিয়েছিলাম চব্বিশ ঘণ্টার পাল্লায়। জাহাজের হৃৎপিণ্ড একটি নয়, দু'তিনটি। একটি বিগড়োলে আর একটি আছে।

তাই বলে অকেজো ক'রে ত' আর ফেলে রাখা যায় না একটি ইঞ্জিনকে। সুতরাং এ্যানেস্থেটিক, নার্স এবং সার্জনএর ডাক পড়ল অপারেশান থিয়েটারে। যেমন ভাবেই হ'ক অকেজোকে আবার কেজো ক'রে তুলতেই হবে। জাহাজী ছুরি কাঁচির বাণ্ডিল নিয়ে বসেছে মেঘা। আর আমরা ক্ষণে ক্ষণে দাও শ্লাই-রেঞ্চ, দাও স্ক্রু-ড্রাইভার ক'রে চলেছি। ভাবাও যায় না আমাদের সেই কর্মব্যস্ত সময়টিকে। হিসাব মত সমুদ্রের কয়েক ফুট নীচে রয়েছি আমরা। তবুও তার শীতলতার স্পর্শ পাই না একটুও। ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকবার চোঙ দিয়ে যেটুকু বা বাতাস ঢোকে তাও এই উত্তপ্ত মরুভূমির পক্ষে নিতান্তই অপর্যাপ্ত। কিন্তু সেদিকে খেয়াল দেবার মত অবসর কোথায়? দিন, না রাত, সে হুঁস নেই। এগিয়ে চলেছে হাতের কাজ। নির্দিষ্ট সময় অন্তে ছুটি দেওয়া হ'য়েছে দু'নম্বর টিণ্ডেল আর তার সঙ্গী লস্করদের। মেঘাও ওদের সঙ্গেই ছুটি পেয়েছে। তার বদলে এসেছে আ-হুই। আর এসেছে বাটলার। জানে, এখন ওপরে ওঠা সম্ভব নয়, তাই এখানেই নিয়ে এসেছে আমাদের খাবার। তেল-কালি আর ঘামে শরীরের ওপরে সৃষ্টি করেছে নতুন এক আস্তরণ। ভালভাবে সাবান মেখে স্নান না করা পর্যন্ত প্রবৃত্তি হয় না কিছু মুখে দিতে। কিন্তু নাচার। মেজাজ যেভাবে বিগড়েছে ইঞ্জিনটার আরও কত সময় নেবে, কে জানে। বাধ্য হ'য়ে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চামচের সাহায্যে উদর-পূর্তি ক'রে নিতে হয়। তারপর আবার গিয়ে বসি ইঞ্জিনের পাশে।

কতক্ষণ পরে, খেয়াল নেই, উঠতে যাচ্ছি মাজাটা একটু টান করে নেবার জন্যে, পেছন থেকে হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে মেঘা—উঠফেন না, উঠফেন না ছার, আর একটু বসেন।

কি ব্যাপার? এমনভাবে উঠতে বারণ করছে কেন? তাহ'লে আর না উঠে পারা যায় না। এগিয়ে আসতেই দেখি প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে সেকেণ্ড হাসছেন। আর তাঁর পাশেই একখণ্ড তক্তার ওপরে এক তা

কার্টিজ কাগজ পিন্ ক'রে আঁকতে বসে গিয়েছে মেঘা। আমি উঠে আসায় সম্পূর্ণ হয়নি আঁকাটা। কিন্তু যেটুকু হ'য়েছে তাতেই আমি হতবাক্।

যান, আর একটু বসুন, সেকেণ্ড বলেন, স্কেচটা শেষ করুক মেঘা।

গিয়ে বসেছিলাম আবার। স্কেচটা শেষও করেছিল সে। অপূর্ব সে ছবি। আমাদের জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তকে সে ধরে রেখেছিল তার পেন্সিলের সাহায্যে। মুগ্ধ হয়েছিলাম তার গলার সুরে। সেটা আরও বেড়ে গেল তার হাতের কাজ দেখে। সত্যিই গুণী ছেলে। দুঃখও হ'ল তার জন্যে। কেন এই আঘাটায় এল পড়ে মরতে? এই রূঢ় বাস্তব ক্ষমা করবে না তাকে। নিংড়িয়ে নিংড়িয়ে শেষ করে দেবে তার শিল্পী মনটিকে।

তখন জানতাম না। পরে দেখেছিলাম শিল্পী মন ছাড়া আরও একটি মনও আছে তার ভেতরে। তারই প্রচণ্ড আকর্ষণে ঘর ছাড়া হয়েছে মেঘা। যখন ঘুমিয়ে থাকে সেই চেতনা তখন সে এক নতুন মানুষ। সুস্থ, স্বস্থ। আর যখন জাগে, ওর চোখে মুখে ফুটে ওঠে এক বেপরোয়া ভাব। উচ্ছৃঙ্খলতাই যার লক্ষ্য। উন্মত্ত যৌবনের ডাকে সে তখন নিজেও উন্মাদ।

আমার জীবনে এই প্রথম রেখা পেরিয়ে যাওয়া। শুনেছি রেখা পেরুলেই নেপচুনের নকল বিচারশালা বসিয়ে একটা নাটক অভিনয় করে জাহাজের লস্করেরা। এটা ওদের সংস্কার। বহুযুগ আগে নাবিক এবং বণিকেরা এক গোলার্দ্ধ থেকে অপর গোলার্দ্ধে গিয়ে অবাক হ'য়ে যেত তার প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখে। এ হেন পরিবর্তনকে তারা কোনরকম ভৌতিক কাণ্ড বলেই মনে করত। আর ভাবত এ সবই সমুদ্রের সম্রাট নেপচুনের কারসাজি। দায়ী যেমন করত তেমনি আবার তাঁকে এবং তাঁর দরবারের সভ্যদের খুশি করবার জন্যে নানাপ্রকার প্রার্থনা এবং উপচারের ব্যবস্থা করতেও কসুর করত না।

দিন যায়, বিজ্ঞানের ওপরে বিশ্বাস বাড়ে মানুষের। এই প্রাকৃতিক

পরিবর্তনের আসল কারণটিও ক্রমে ধরা পড়ে মানুষের কাছে। এখন তাই সেই পুরাতন সংস্কারকেই একটু ঢেলে সাজিয়ে নেপচুন এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সেই পদ্ধতিতেই নাটকটি সাজিয়েছে মেঘা। একটি নকল বিচারালয়। বিচারক স্বয়ং নেপচুন। পাশে বসে তাঁর রাণী, সভাসদেরা, একজন ডাক্তার, নার্স এবং নাপিত। বিচারক যখন আছেন দোষীকেও তখন হাজির করতে হবে। যে এই প্রথমবার বিষুবরেখা পেরিয়ে এল সেই হল দোষী। তারপর বিচারের শেষে আইসক্রীম নয়ত' মাখন মাথায় মাখিয়ে অপরাধীর মাথা কামিয়ে দেওয়া হয় চওড়া একখণ্ড কাঠ দিয়ে, অথবা তাকে জলের টবে চোবান হয়। প্রয়োজন হলে ভীষণ দর্শণ ডাক্তার অপরাধীর অস্ত্রোপচারেরও ব্যবস্থা করে।

নাটকের শেষে বিশেষ কিছু খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা থাকে।

মেঘা ঠিক করেছিল নাটকের প্রারম্ভে থাকবে তার একটি গান এবং নাটকের শেষেও থাকবে একটি। কিন্তু ভোটভণ্ডুল করে দিল নেপচুন-রূপী বিরাট বপু সেকেণ্ড টিণ্ডেল। মেঘা এই প্রথম বিষুবরেখা পার হল, তাই তাকেই দোষী সাব্যস্ত করল সে। বেচারীত' হতভম্ব। ওর ধারণা ছিল একই দোষে দোষী হওয়ায় পালাটা বুঝি আমার ওপর দিয়েই যাবে। বিচারকের আসনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েই চীৎকার করে উঠল—মাথা কামানো চলবেনা। অর্থাৎ মাথায় মাখন মাখানো চলবে না ; কিন্তু সে কথা আর শুনছে কে ? বেশ কিছুটা মাখন বেশ ভাল করেই মাখান হয় তাকে। এত সাধের চুল এমন ভাবে নষ্ট করা সহ্য হয় না মেঘার। চীৎকার করে গালাগালি দিতে থাকে সকলকে। ফল হয় উল্টো। নেপচুনের হুকুমে জলের টবে চোবান হয় তাকে। ঘটনাটিকে তখন আর তামাসা বলে নিতে পারছে না বেচারী। আক্রোশে ফেটে পড়ছে।

হাসতে হাসতে মাথাব্যথা হ'য়ে যায় দেখে আমরা কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে দিই ওকে। তখনও চীৎকার করছে ও—আমি চলে যাব। করব না কাজ এই অসভ্য জানোয়ারদের সঙ্গে।

সিঙ্গাপুর থেকে বাঞ্জারমাসিন। দক্ষিণ বোর্ণিওর বন্দর। বাঞ্জারমাসিন থেকে আরও সাড়ে তিনশ' মাইল পূবে গিয়ে ম্যাকাসারকে বুড়ি-ছোঁয়া করেই ফিরে এলাম যাকার্তায়। একচক্ষু হরিণের মত একটা দিকেই বারে বারে ঘুরেছি। দেখেছি শুনেছি ঐ একই দিকের ইতিহাস। কিন্তু এপিঠের মত ওপিঠও যে আবার থাকে, থাকে তারও কিছু বক্তব্য, সেই কথাটিই ছিল অজানা।

এ এমনই এক জায়গা, যেদিকে ফিরাই আঁখি নারকেল নেহারি। দূরে তাকাই, দেখি আকাশের গায়ে নারকেল পাতার আস্তরণ। কাছে গেলে দেখা যায় নারকেল গাছের খুঁটির ওপরে ওরই পাতা দিয়ে ছাওয়া এক একটি দ্বীপ। শুধু বড় নয়, শুধু ছোটও নয়। মেজ, সেজ, নোয়া, ফুল করে দ্বীপের অন্ত নেই। দৈর্ঘ প্রস্থ কিছুই নেই যার সেই নাকি বিন্দু। এখানে এসে দেখেছি বিন্দুর পরিধি এক মাইলেরও উপর। ম্যাপ বইতে যে দ্বীপটিকে বিন্দু দিয়ে বোঝানো হয়, তার কথা বলছি। আর বিন্দু নয় যারা অর্থাৎ সুমাত্রা, যাভা, বোর্নিও, এদের দ্বীপ বলতে লজ্জাই করে। দ্বীপ ত' বোম্বেও, সিঙ্গাপুরও। বলি কি আর সে কথা? এক যাভার লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের চাইতে কিছু কম নয়। এদের ভেতরে আবার একটি দ্বীপকে বলে প্রেমের দ্বীপ। ভাল নাম অবশ্য একটি আছে। বালী দ্বীপ। সেখানকার মেয়েরা চোখ ফুটতেই প্রেমে পড়ে কিনা জানা নেই। তবে ষোলয় গিয়ে যদি বরে ঘরে হয় তবে নাকি বড্ড দেরি হ'য়ে গেল। তাও আবার বাপমায়ের জোগাড় করে দেওয়া বর হ'লে চলবে না। স্ব-নির্বাচিত হওয়া চাই। তারও আবার কানুন কত! একপ্রস্থ কাপড়-জামা অর্থাৎ সারং, ব্লাউস আর স্কার্ফ নিয়ে কন্যাকে তার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে পালিয়ে যেতে হবে। রাত্রে। দিনে পালালে হবে না। মেয়ে চুরির দায়ে ধরা পড়ে যাবে বর। শাস্তিও পেতে হবে। পালিয়ে গিয়ে থাকতে হবে কোনও বন্ধু বান্ধবের বাড়ী। এরপর তিন চারটি দিন পাত্র-পাত্রীর কেউই নিজ বাড়ীতে যেতে পারবে না। গেলে শাস্তি। অর্থাৎ যা কিছু করবে তাতে যেন স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিয়ে ঘটছে। কোথায় ঘটছে, কখন ঘটছে, সে হিসাব পাত্র-পাত্রীর কাছে। সমাজ জানলেই হ'ল যে ওদের

দু'জনের বিয়ে হ'য়ে গেল। তিন চারদিন পরে বন্ধুর বাড়ী থেকে ফিরে এল বর-কনে। সমাজ-স্বীকৃত স্বামী-স্ত্রী হ'য়ে।

বালী দ্বীপের কিছু কিছু ছোঁয়াচ নাকি লেগেছে যবদ্বীপের গায়েও। লাগতে পারে। আশ্চর্য কি? আমার ভাগ্যে অত দেখা জুটে ওঠেনি। আমি দেখেছিলাম বন্দরে জাহাজ ভিড়তেই তর্ তর্ ক'রে উঠে এসেছিল কয়টি মেয়ে। প্রথমটা বুঝতে পারিনি ঠিক। ভেবেছিলাম কোনও প্রমিলারাজ্যে এসে পৌঁচেছি বুঝি। যেখানকার শ্রমিক, মালিক, চোর, পুলিশ ইত্যাদি ক'রে সবাই নারী। তারপর দেখলাম, তা নয়। প্রশ্ন জাগল মনে, তা নয় যদি তা'হলে বাধা দিল না কেন? বিনা অনুমতিতে যেভাবে উঠে এল ওরা তাতে এই মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে ওরাও এই জাহাজের কর্মী। ভাবছি একবার কারও কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখি ব্যাপারটা কি। এমন সময় একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। লম্বা চেহারা। পরণে শুধু সারং আর ব্লাউস। স্কার্ফ নেই যে তার উদ্ধত যৌবনকে ঢেকে রাখে। কিম্বা প্রয়োজন বোধ করেনি, জানিনা। এসে দাঁড়িয়েই ওদের ভাষায় কিছু বলল আমাকে। বুঝলাম না ওর কথা। শুধু হাতের ইসারায় জানিয়ে দিলাম ওকে—তুমি যাও। আমার সে ইঙ্গিতের ভেতরে কোন রূঢ়তা ছিল না। তবুও দেখেছিলাম মুহূর্তে শুকিয়ে গিয়েছিল মেয়েটির মুখ। এত ঘাটের জল খেয়ে এসেছি কিন্তু এমন জ্বালায় ত' পরিনি কোনদিন! রাগ হ'ল বিষুবরেখার ওপর। ঐ রেখাটি অতিক্রম করে এসেই এই ফ্যাসাদে পড়তে হ'ল আজ। তাড়াতাড়ি ইংরিজিতে বলে উঠি—কি চাও? মেয়েটিও একটি ইংরিজি শব্দ উচ্চারণ করে—ঘর। মেজাজকে আর দোষ দেওয়া যায় না। জমি ছেড়ে কেউ যদি জাহাজের ওপরে ঘর খুঁজতে আসে তাকে পাগোল ছাড়া আর কিই বা ভাবতে পারা যায়? ভাবলাম এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। নইলে এ ফ্যাসাদ সহজে ঘাড় থেকে নামবে না আমার। ঘুরে দাঁড়াতে যাব, মেয়েটি বলে ওঠে—তোমার কেবিন। সরল হ'ল বটে ওর কথা কিন্তু বুকের ভেতরে আমার দুরু দুরু ডাক। আমার কেবিনে নিয়ে যাব ওকে! এও কি একটা কথা হ'ল! তাও যদি চেনা-জানা কেউ হ'ত,

মনের ছবিটি থাকত দেখা, তাহ'লেও না হয় কথা ছিল। ও কিন্তু নাছোড়বান্দা। যেতেই হবে ওকে নিয়ে কেবিনে।

পরে জেনেছিলাম, নাছোড়বান্দা না হ'য়ে ওদের উপায় নেই। হারলে ওদের চলে না।

কেবিনের দরজা খুলে দিতেই ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। এক এক ক'রে নিপুণ হাতে গুছিয়ে রাখল ছিটোন জিনিসগুলি। টেবিলের ওপরে কিছু খুচরো পয়সা ছিল। সেগুলি নিয়ে এসে দিল আমার হাতে। জুতো দু'জোড়া ব্রাশ করা হ'ল। ঝেড়ে দিল কোটটা। ঠিক ক্রীজ মাফিক ভাঁজ ক'রে প্যাণ্টটা আলনায় রাখল। তারপর বিছানার সংস্কার। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছি তার কাজ। একজন সু-গৃহিণী আর এই মেয়েটির ভেতরে প্রভেদ ধরা পড়ে না চোখে। তবে কি আমাদের দেশের প্রবাদ-বাক্যটি খাটে এদের এখানেও? অতিবড় ঘরণীর জোটেনাকো ঘর!

পরিমার্জিত হ'ল ঘরটি। দেখে মনেও হয় না যে আমার মত একটা হা-ঘরে মানুষ এই ঘরটির বাসীন্দা। এক কথায় যাকে বলে ফুল পড়ছে। এও ঠিক তাই। কাজ সেরে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। ভাবলাম, বোধহয় পারিশ্রমিক চায় কিছু। টাকা বের করতে গেলাম, বাধা দিল মেয়েটি। কি যেন ওদের ভাষায় বলে গেল। এই হয়েছে এক বিপদ। এই অবোধ্য ভাষায় আমার চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল দিলেও বুঝতে পারব না তার এক অক্ষরও। আবার সেই ইংরিজির আশ্রয়। সেদিন যেন বিশেষ করে উপলব্ধি করেছিলাম পৃথিবীর বুকে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাষাটি। তার কারণ বোধহয় নিজেদেরকেই ছড়িয়ে ফেলা আর কিণ্ডারগার্টেনী পদ্ধতিতে আপন ভাষা অপরকে শিখিয়ে তোলবার চেষ্টা করা। যাইহ'ক, জিজ্ঞাসা করলাম তাকে—কি চাও? উত্তর দিল সে একটি ক'রে শব্দের ভেতর দিয়ে—সিনেমা অথবা নাচ? বুঝলাম। আমি সিনেমায় যেতে চাই, না, নাচ দেখাটাই পছন্দ করি, তাই জিজ্ঞাসা করছে সে। খুশি করতে পারিনি তাকে। ভাল লাগেনি। তবুও হেসে বলেছিলাম—আমি ওসব দেখা পছন্দ করি না। এরকম একটা উত্তর বোধহয় আশা করেনি সে। হতাশার ব্যথা ফুটে উঠেছিল তার মুখে।

কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই হাসির রেখা টেনে এনে জিজ্ঞাসা করেছিল—রাত্রে? আসব? এতক্ষণে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল মেয়েটির স্বৈরিণী বৃত্তি। এইজন্যেই তাহ'লে সে এসেছে? ঘরছাড়া এই নাবিকদের সঙ্গসুখ দেওয়াই ওর পেশা! তাই ওরা দল বেঁধে আসে। ঢুকে যায় এক একজন অফিসারের ঘরে। সু-গৃহিণীর মত গুছিয়ে দেয় তাদের একক সংসার। তারপর তাদের ক্ষুধার্ত যৌবনের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়ে নিয়ে যায় নিজেদের দৈনিক মজুরী! ভালত' লাগেইনি উপরন্তু অনুভব করেছিলাম এক বিবমীষা ভাব। কঠিন দুটো চোখে ওর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়েছিলাম—না। সঙ্গে সঙ্গে হাতটিও পকেটের ভেতরে চলে গিয়েছিল তার পরিশ্রমের দাম বের করবার জন্যে। আঁৎকে উঠেছিল মেয়েটি—না, এখন না। বলে আর দাঁড়ায়নি আমার সামনে। ছুটে নেমে গিয়েছিল জাহাজ থেকে। সবই হ'ল, বুঝতে পারলাম না শুধু একটি কথা। কেন ঘৃণা করলাম ওকে। কেন তাড়িয়ে দিলাম এভাবে। ওর এই বৃত্তির জন্যে কতটুকু দায়ী ও? আবার কোনদিন এ্যাঙ্কোনাতে গিয়ে মারীকে যদি দেখি এই মূর্তিতে, দোষারোপ করব আমি কাকে? কাঁদবে মারী, কাঁদব হয়ত' আমিও। কিন্তু স্খলিতা বলে ঘৃণা করতে পারব না তাকে কোনদিনও।

তাকিয়ে আছি বাইরের দিকে। যে পথে নেমে গিয়েছে মেয়েটি। আকাশচুম্বী অট্টালিকার অভাব এদেশে। যা আছে তার বেশির ভাগই সরকারের। বাকী প্রায় সব বাড়ীই একতলা। এরা বলে—সমুদ্রের বুকে বাস, বারোমাসই নাভিশ্বাস। মন কেমন করা পাগলা হওয়া নয়, প্রাণ নিয়ে টানাটানি করা সামুদ্রিক ঝড়। এখানকার বাড়ীগুলিও তাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। পরিস্কার ঝকঝকে রাস্তার দু'ধারে বিরাট মুখব্যাদন করা সব দোকান। সুন্দর ভাবে সাজান। কিন্তু এতদূর থেকে আর কতটা দেখা যায়? ঘরে ঢুকে বাইরে বেরুবার পোষাক চড়িয়ে নিই অঙ্গে। নেমে পড়ি জাহাজ থেকে। ঘুরে দেখতে হবে দেশটাকে একটু।

আমার মনে হয় একটা দেশ দেখবার কিছুই আর বাকী থাকে না শুধু যদি দেখা যায় সেখানকার ভিখারীর সংখ্যা। উন্নতির সংগাটি আমার

জানা নেই। অনেকে অনেক রকম বলে। তর্কসাপেক্ষ সে বলা। আমার মন বলে, বেকারত্ব লোপই উন্নতির একমাত্র সংগা। সেই বেকারত্ব-ব্যাধিতেই ভুগছে এই দেশের বাসীন্দারা। একটা দেশের ক্যান্টিলিভারের একদিকে বিত্তশালী অপরদিকে বিত্তহীনদের টানা। দুর্বল এই গঠন-কার্য। কবে ভেঙে পড়ে, কে জানে। এড়িয়ে চলেছি অকালজীর্ণ হাতের স্পর্শ। এখোগুড়ের গন্ধ পেয়ে ছেঁকে ধরেছে মাছির দল। জামা-প্যাণ্ট ধরে টানবার উপক্রম। কিছু দিতেই হবে। ওদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে দিকভুলের হাত থেকে বাঁচতে পারিনি। কোথা দিয়ে কোন রাস্তায় এসে পড়েছি খেয়াল নেই। হঠাৎ সামনে একটি সিনেমা হাউস দেখে দাঁড়িয়ে যাই। মনে পড়ে ঐ মেয়েটিও বলেছিল সিনেমা দেখবার কথা। ঢুকব, কি ঢুকব না ভাবছি, এমন সময় দেখি আমাদের মেঘা আর সেই মেয়েটি এসে দাঁড়াল কাউণ্টারের সামনে। বুঝলাম বাইরের টান কিছু কম নয় মেঘার। সে সুযোগ পূর্ণমাত্রায় পাওয়ার জন্যেই হয়ত' এই যাযাবরের জীবন বেছে নিয়েছে সে। শিল্প-সাধনার বাঁধন দিয়ে আটকে রাখতে পারেনি তার জৈব-ক্ষুধার তাড়নাকে। সরে আসি সেখান থেকে।

তারপর পরপর কয়েকটা দিনই দেখেছিলাম মেয়েটিকে। নাম শুনেছিলাম সোণি। আসত। নির্বিবাদে আমার ঘরে ঢুকে গুছিয়ে রাখত সব। তাকের ওপরে ছিল কয়েকখানি বই। একদিন একখানি নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখেছিল। বুঝতে পারেনি বোধহয়। আমিও জানিনা তার অক্ষর পরিচয় আছে কিনা। জিজ্ঞাসা করবার প্রবৃত্তি হয়নি। কেবলই মনে হ'য়েছে এই মেয়েটিই আমাদের মেঘার নর্মসহচরী। সেও কোন কথা বলত না। যদি শুয়ে থাকতাম বিছানায়, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত দরজার পাশে। আমি উঠে গেলে বিছানাটি ঝেড়েঝুড়ে পেতে দিয়ে বেরিয়ে যেত। আমি আর তখুনি ঘরে ঢুকতাম না। কেমন নেশা চেপে গিয়েছিল। রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে দেখতাম মেঘা তৈরী হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার ওপরে। সোণি গিয়ে যোগ দিত তার সঙ্গে। দু'জনে হাত ধরাধরি করে চলে যেত দৃষ্টির বাইরে।

এরই ভেতরে এক কাণ্ড হয়ে গেল একদিন। লস্করদের সেলুন ব্যবস্থা

নেই। মেস ব্যবস্থা। রান্নার কাজও নিজেদেরকেই করতে হয়। সেদিন বেঁকে বসল সকলে, মেঘাকে রান্না করতে হবে। আব্দার শুনে বেচারীত' হতভম্ব। গান শুনিয়ে আর ছবি এঁকে দিয়ে এতদিন কাটল আর একটা দুটো দিন কাটবে না? চেষ্টা করল সকলকে রাজী করাতে। কিন্তু ইস্পাত বাঁকা বেঁকে বসেছে সকলে। মুস্কিলেই পড়ে গেল মেঘা। রাঁধতে গেলে সোণির সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হয় না। তা'র বেড়াতেই যদি না পেল তাহ'লে এই চাকরী নিয়ে পড়ে মরবার দরকার ছিল কি তার? রাগে গজর্ গজর্ ক'রতে ক'রতে আসছিল এই দিকে। হঠাৎ চোখে পড়ে তার আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সোণি। ওকে দেখেই একছুটে এসে সামনে দাঁড়ায় মেঘা। আবেগ-বিহ্বলভাবে কি একটা কথা বলেই ওর একখানি হাত নিজের হাতের ভেতরে টেনে নেয়। তারপরই কি যে হ'য়ে গেল—জানার পরিধিকে অগ্রাহ্য ক'রে উঠে আসে সোণির একখানি হাত। ভাবতেও পারেনি মেঘা এই মেয়েটির দ্বারা এমন কাজও সম্ভব। যারা বিক্রীত, যাদের সত্বা জিয়োন থাকে অন্যের অর্থপুটে, তাদের দ্বারা এমন কাজও যে সম্ভব, এ ছিল মেঘার স্বপ্নেরও বাইরে। অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে সে চেয়ে থাকে সোণির মুখের দিকে।

আমার দৃষ্টি এড়ায়নি এ দৃশ্য। বস্তুতঃ আমিই এর প্রকৃত কারণ। শুয়েছিলাম ঘরে। অনেকটা আনমনা। এমন সময়ে ঘরে এসে ঢোকে সোণি। মুখখানি ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। বরঞ্চ উল্টোটাই হয়েছিল। দেখেছিলাম তার উদ্ধত যৌবনের অহঙ্কার দুটি। সাজাতে হয়নি তাদের বিশেষ যত্ন নিয়ে। গঠন-সজ্জিত তারা। আবদ্ধ দৃষ্টি। শরীরের প্রতি অণু-পরমাণুতে অনুভব করি এক অস্থিরতা। অভাবনীয় এক জ্বালা। নিভে যাচ্ছে সকল সুষ্ঠ চিন্তা। পরিবর্তে এসেছে এক অতৃপ্ত আকাঙ্খার তাড়না। কপালের দুটি শিরায় সেই চেতনার উল্লম্ফন। ইচ্ছা হচ্ছে চীৎকার করে উঠি—আমিও মানুষ। আমারও ক্ষুধা আছে। তারপরই লাফিয়ে উঠে বসে হাঁক দিয়ে উঠেছিলাম—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

চম্‌কে উঠেছিল সে আমার সেই হাঁক শুনে। প্রথমটা বুঝতে পারেনি

কিছুই। তারপর আমার চোখ এবং হাতের ইসারা দেখেই সব বুঝতে পারে সে। মাথা নীচু ক'রে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। সোণি বেরিয়ে যেতেই অনুভব করেছিলাম কতখানি আঘাত আমি তাকে দিয়েছি। এক প্রথম দিন ছাড়া আর কোনও দিনত' সে কোনরকম ইঙ্গিতই দেয়নি। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না। এক অপরিসীম আত্মজ্বালা নিয়ে কাটিয়ে দিই সেই দিনটি।

পরদিন সকালে তার দলের আর সকলেই এল, সোণি এল না। ছট্‌ফট্ করছিলাম অন্তরে অন্তরে। ভাল নয় সে, কিন্তু খারাপও নয়। ক্ষুধার অন্নের জন্যে যেটুকু না করলে নয় সেইটুকুকেই সে শুধু মানিয়ে নিয়েছে। তার বেশী এগুতে দেখিনি একতিলও।

বেরিয়ে পড়লাম জাহাজ ছেড়ে। অনির্দিষ্ট গতি। ঘুরতে ঘুরতেই ঝ্‌পঝপিয়ে নেমে এল বৃষ্টি। এই এক বিপদ এখানে। বলা নেই কওয়া নেই যখন তখন কিছুটা চোখের জল ফেলে যায়। ঘুরতে ঘুরতে আবার পৌঁছে গিয়েছি যব-সাগরের ধারে। সারবন্দী পাহাড় প্রতিহত ক'রে রেখেছে সমুদ্রকে। মানুষও অভয় পেয়েছে। নির্ভয় নিশ্চিন্ততায় ছোট ছোট ঘর তুলেছে গরীব গৃহস্থ। ছুটে গিয়ে মাথা গুঁজি একটি চালার নীচে। নারকেল বাগানের ভেতরে। সামনেই রাস্তা দিয়ে চলেছে তেলেঙ্গী শ্রমিকেরা। লক্ষ্য রবারের বাগান। মালয়ের মত অধিক সংখ্যায় না হলেও রবার গাছের বাগান যাভাতেও প্রচুর আছে। আর আছে তার নারকেল সম্পদ। তেলের খনিও মিলেছে।

চালার নীচে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছি। হঠাৎ নজরে পড়ে কয়টি শিশুর সঙ্গে খেলা করছে সোণি। আমার দিকে চোখ পড়তেই খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। দাঁড়িয়েই থাকে মাথা নীচু ক'রে। ডাক দিই ওকে। বলি কাছে আসতে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে সে।

বলি—চল, কোথায় যাবে। সিনেমা, না নাচ?

মাথা ঝাঁকায় ও। কোথাও যাবে না।

রাগ হ'য়েছে?

সেই মাথা ঝাঁকানো।

নিশ্চয় রাগ হয়েছে। তাকাও দেখি আমার দিকে।

তাকাতে পারে না। তু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে।

সেদিন আর ক্ষমা করিনি নিজেকে। সোণির একখানা হাত তুলে নিয়েছিলাম আমার হাতের ভেতরে। বলেছিলাম—সিনেমাও নয়, নাচও নয়। চল, ঐ পাহাড়ের মাথায় গিয়ে বসিগে। আজ শুধু গল্প, কেমন?

ভাষাইত' সব নয়, সুরও অনেকখানি। সে আমার কথার সবটা হয়ত' বোঝে না, কিন্তু সুরটা বোঝে। হাসি ফুটে ওঠে ওর চোখে মুখে। ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় শিশুর দলের মাঝখানে। এক একজনকে তু'হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে নামিয়ে দেয়। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কাণ্ড দেখতে থাকি। সব কয়টি শিশুকে আদর করা শেষ হলে এসে দাঁড়ায় আমার কাছে। এবারে নিজেই এগিয়ে এসে ধরে আমার একখানা হাত। চলতে থাকি তু'জনে পাহাড়-প্রাচীরের দিকে।

গিয়েছে উপযাচক হ'য়ে, সেবা করেছে। তুনিয়ার দিকে নজর ফেলতেই চোখে পড়েছে পুরুষের সঙ্গে একটিই মাত্র সম্বন্ধ তাদের। এক ভোক্তা, অপর ভুক্তি। এর লক্ষ্য যদি দৈহিক সম্পদ তো ওর লক্ষ্য আর্থিক সম্পদ। লোকসানের খতিয়ান খতায় না কেউই। নেশার মাশুল, গুণতেই হবে। এই ওদের সান্ত্বনা।

আমি নেশায় আসিনি। সোণির চরিত্রে যে ব্যতিক্রমটুকু চোখে পড়েছিল, এসেছিলাম তারই হদিস্ করতে। কিন্তু বলল না। কিম্বা পারল না কিছু বলতে। হয়ত' অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে ভালভাবে দেখেইনি কোনদিন। দেখবার অবসরই পায়নি হয়ত'। সাত আটটি ভাইবোনকে মানুষ করতে হয়। মা এক বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করে। বাবা নগ্দা মুটে। তারা বাড়ীতে এলে তবে বেরুতে পায় ও। না বেরিয়ে উপায়ও নেই। কেননা ভাইবোনেরা তা'হ'লে মাসের অর্দ্ধেক দিনই বোধহয় খেতে পাবে না। বাইরে থেকে ঘুরে এসেই গড়িয়ে পড়ে বিছানায়। ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসে তু'চোখের পাতা। চিন্তা করবার অবসর কোথায়?

হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে উঠে পড়ি। নীচে নীল জল ছল ছল করছে।

সোণির চোখের জলের মতই। শত সহস্র সোণির চোখের জলে সৃষ্ট ঋবসাগর। বিদায় নিই তার কাছ থেকে। বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত সে পিছন পিছন আসে আমাকে এগিয়ে দিতে। তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার হাতটা তুলে নিয়ে একটা চুমু খেয়েই ছুটে চলে যায় তার ডেরার দিকে।

সেই সোণিরই অদ্ভুত তুটি রূপ দেখেছিলাম আমি। সেদিন জাহাজ ছাড়বে আমাদের। আমার ঘরে এসে বসেছিল। নিঃশব্দে ফেলেছিল কয়েক ফোটা চোখের জল। শুধু তার কথা নয়, তার ভাইবোনদের কথাও চিন্তা করে কয়টি টাকা দিয়েছিলাম। হাত পেতে টাকা কয়টি নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখেছিল ঘরটার চারিদিকে, আগোছাল কিছু আছে কিনা। নেই দেখে নিশ্চিন্ত মনে পর্দাটা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই চোখ তুটি চিক্ চিক্ ক'রে উঠেছিল তার। আর একটি জাহাজ এসে ভিড়ছে। দেখেছি আমিও। অন্য সময় হ'লে হয়ত' তুষ্টুমি ক'রেও ওকে আটকে রাখতাম কিছুক্ষণ। কিন্তু এখন আর সে সময় নেই। নোঙর উঠছে। ছাড়বে কিছুক্ষণের ভেতরেই। তাই ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাইরে এসে দাঁড়াই। তর্ তর্ ক'রে নেমে যায় ও। পাড়ের ওপরে গিয়েই ঘুরে দাঁড়ায়। কান্নামাখা একটু খানি হাসি হাসে। হাত নাড়ায়। জানায় বিদায়। তারপরই ছুটে যেতে থাকে সদ্য ভেড়া জাহাজখানির দিকে।

ভেনিসের পথে দিনেশের বলা রোজার কান্নার কথা মনে পড়তে সোণির চেহারাখানিও ভেসে ওঠে চোখের ওপরে। কেঁদেছিল রোজারা, কেঁদেছিল সোণিও। কিন্তু রোজাদের মত অন্তর দিয়ে বোঝেনি কেন সে কাঁদে। নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিল আপন ভাগ্যলিপিকে। একবারও প্রশ্ন তোলেনি—কেন সে এই, কেন সে আর নয়।

এ্যাঙ্কোনা থেকে সোজা গিয়েছিলাম ভেনিসে। কিছুটা উত্তেজনাও অনুভব করেছিলাম অন্তরে। সেকস্‌পীয়ার প্রসিদ্ধ নগরী দেখবার লোভ

বড় কম নয়। কিন্তু সহর দেখে এই কথাটিই বারবার মনে হ'ল, কি সুখে সেই জগৎ-প্রসিদ্ধ নাট্যকার এই সহরটিকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নাটকের স্থান হিসাবে ? সহর নয়ত', দ্বীপ। নদী আর সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। সহরের অনেকখানি ভেতরে চলে গিয়েছে অগভীর সমুদ্র লাগুনা। তার ওপরেই মাইল দুয়েক লম্বা রেলের ব্রীজ। এই ভেনিস উপসাগর থেকেই জন্ম নিয়েছে কানাল গ্রান্দে খাল। বেশ বড় খাল এটি। বলা যেতে পারে খালের 'কাণ্ড'। তারপরই ছড়িয়ে পড়েছে তার শাখা প্রশাখা। অন্ত নেই তার। এ পাড়ায় ও পাড়ায় যেতে হ'লেও একটি করে খাল পেরুতে হয়। আর আছে গলি। কাশীর গলিকেও হার মানায়।

একদিন বেড়িয়ে এসেই সহর দেখবার সখ মিটে গিয়েছে আমার। শুধু পাথরের তৈরী বাড়ীগুলিই যা দেখবার। আর আছে সোনায় মোড়া সানমার্কো গির্জা। দেখে যেটুকু আনন্দ পেয়েছিলাম তাও আবার কর্পূরের মত উপে গেল পথ ভুল ক'রে। একবার নয়, বার দুই তিন। খাল, গলি আর কাঠের পুল। যেন একই ছাঁচে তৈরী। ডোমকানা হয়ে ঘুরছি আর সাইলকের সৃষ্টি-কর্তার মুণ্ডপাত করছি। এই ভাবেই কিছুক্ষণ পথ চলবার পর দে'খ কোন সময়ে স্টেশনের কাছে গেত্তোতে এসে পৌঁচেছি। হ্যাঁ, এখানে কিছু দেখবার জিনিস আছে বৈকি। ঘরে ঘরে কুটির শিল্প। তার ভেতরে আবার ঝলক দিচ্ছে সৌখিন ফিতে তৈরীর কাজ। শুধু ইটালী নয়, ইউরোপের অনেক জায়গাতেই এই ফিতের চাহিদা আছে। মেয়েদের গাউনে, ব্লাউসে, স্কার্ফে লাগাবার জন্যে তৈরী হয়। লোভ জিনিসটি বড় বিশ্রী রোগ। সংক্রামকও বটে। পিল্লাই পথ দেখাল। এ্যাঙ্কোনায় তার নববধূর জন্যে কিনে ফেলল কয়েক গজ ফিতে। রোগে ধরল আমাদেরও। সকলেই কিনলাম কয়েক গজ করে।

ভেনিস অবধি একরকম কেটেছিল ভালই। তার পরই বেসুরো গাইতে আরম্ভ করলেন মাস্টার। যেখান থেকে যতটুকু পান ঝাঁকায় তুলে নিয়ে ছোটেন ঢেলে দিতে। উঞ্ছবৃত্তির আর শেষ নেই। এক গল্প শুনেছিলাম—এক গরীব চাষীর ছিল বড়ই ফলার খাওয়ার লোভ। একে ভাত জোটে না, তার ওপর ফলার! এমনিতে আর কি করে হবে?

ভেবে ভেবে সে এক বুদ্ধি বের করল। পড়ন্ত বেলায় যেতে হবে কোনও ভদ্রলোকের বাড়ী। সেই মতই একদিন রওনা হ'ল। এদিকে ভাল ক'রে কথা ফোটেনা মুখে। জিবের আড় ভাঙেনি। আর ভাঙবেও না হয়ত'। কিন্তু জ্ঞান টনটনে। নিদাঘের দ্বিপ্রহরে বিরাট মাঠ পাড়ি দিয়ে চলল সে এক গ্রামের ব্রাহ্মণ পাড়ায়। গলিত-ঘর্ম অবস্থা। এমন সময় দেখা আর একটি চাষীর সঙ্গে। চেনা মানুষ। শুক্‌নো মুখে মানুষটিকে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করে—চলেছ কোথায় ?

ঐ বামুন পালায়। চলতে চলতেই উত্তর দেয় সে।

মুখ শুক্‌নো দেখি। খাওয়া হয়নি বুঝি? নিছক ঔৎসুক্য অপর চাষীর।

না।

এরপর আর কি ক'রে চুপ ক'রে থাকা যায়? সহানুভূতিশীল চাষী টেনে নিয়ে গেল নিজের বাড়ী। পেট ভরে তাকে খাইয়ে দিল। খিদের জ্বালায় খেল বটে কিন্তু মন খারাপ হ'ল ফলার খাওয়া হ'ল না দেখে। যেমন ভাবা তেমনি তার জেদ চেপে বসল। ফলার খেতেই হবে। ভর-পেটেই ঠেলে গিয়ে উঠল এক ব্রাহ্মণ-বাড়ী। তা কপাল ভাল চাষীর। ভাল বাড়ীই জুটে গেল একটা। যত্ন করে বসিয়ে ফলারের ব্যবস্থা করল তার। চিড়ে, দৈ, কলা, গুড়—মুখে হাসি আর ধরে না। সব একসঙ্গে মেখে নিয়ে বসে গেল খেতে। এক গ্রাস, দু'গ্রাস—একি! আর যে মুখে যায়না! একটু ক'রে জল খায় আর একগ্রাস ক'রে ফলার মুখে তোলে। শেষে জলেও কুলোয় না। ক্ষুব্ধ মন। এমন ফলার সামনে, অথচ কাজে লাগাতে পারছে না একটুও। খেদোক্তি করতে থাকে সে—একেতে চিয়ে কয়া, তাতে দৈ, গু'এল দয়া; তাতে আবাল বামুন বায়ী, ফেয়াও যায় না, খাওয়াও যায় না!

তা আমাদেরও হয়েছে ঐ ফলারে চাষীর অবস্থা। মাসিক অঙ্কের লোভ। না পারছি ফেলতে, না পারছি গিলতে। অবস্থাটির জন্য দায়ী পঞ্চমজর্জীয় ছাঁটের দাড়িওয়ালা ওল্ডম্যানটি। কোথায় 'ভেনিস থেকে ছুঁড়লাম তীর, তীর লাগল সৈয়দ বন্দরে' করব, তা নয়, চল মার্সাই।

আকাশের ঘুড়ি যেন। গোঁৎ খেয়ে নীচে নামতে নামতেই আবার ঠেলে উঠল উত্তরমুখো। তারপর ছোট স্পেন। সেখান থেকে কর্সিকা। কর্সিকা থেকে একটানা ছুটে গিয়ে থামে লিসবন।

একটানা একঘেয়ে ভাবে কোনও কাজ ক'রতে ক'রতে কেমন একটা নেশার ঘোর এসে যায়। অসাড়তা আসে দেহে, মনে। তেমনি অসাড় হ'য়ে গিয়েছি আমরা। ঠিক সময়ে ব্রীজের বেল বেজে উঠে জানিয়ে দেবে ডিউটি বদলের সঙ্কেত। অথবা দরজায় পড়বে টোকা। আমি তৈরী হ'য়ে নেব, তারপর নেমে যাব নীচে। ডেক অফিসাররা উঠবে ব্রীজে। একটানা চারঘণ্টার পালা চলতে থাকবে। বিন্দু বিন্দু ক'রে স্বেদকণা ঝরে পড়বে। পড়তে না পড়তেই মিলিয়ে যাবে বাস্প হ'য়ে। চিন্তাকে ত্যাগ ক'রতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আমরাও তাই হ'তে চেষ্টা করি। কখনও পারি, কখনও পারি না। পারলে নিজের পিঠ নিজে চাপড়াই না, না পারলেও দোষ দিই না। এই আমাদের ভাগ্যলিপি। না মানলে শুনছে কে ?

এরই ভেতরে একটি ঘটনা ঘটে গেল সমুদ্রের বুকে। আমরা তখন লিসবন ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি ভূমধ্যসাগরের দিকে। প্রত্যেকটি মানবদেহের কণ্ট্রোল প্যানেলে জ্বলে উঠেছে জোর আশার আলো। সেলুনে গরম গরম খিস্তি। লস্করদের মেসে মুখের চেহারা আরও উদ্‌লো। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। অভিমন্যু-বধ পালা-গান গেয়ে বসবে সকলে। রকম সকম বুঝেই উঠে পালিয়েছেন ভজহরিদা। আমি এই 'রক'ফেলারদের সভায় শিশুসভ্য। কথা বলিতে পারিনা দাদা সভ্যদের ধমক খাবার ভয়ে। শুধু বসে বসে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসতে থাকি। প্রতিযোগিতা চলেছে পিল্লাই আর বাক্এর ভেতরে। জাহাজী আভিধানিক শব্দ কার কত মুখস্থ আছে তারই প্রতিযোগিতা। কিন্তু শুধু শব্দ উচ্চারণ করলেই হবে না। প্রয়োগ করা চাই তাকে ভাষার ভেতরে। আবার ভাষা ফাঁকা হ'লে মনে গাঁথে না। উপলক্ষ্য চাই।

জাহাজী হরিসভার উপলক্ষ্য ক্যাপ্টেন। যত শব্দের তীর তাকে লক্ষ্য ক'রেই জিবের জ্যা-মুক্ত করা হতে থাকে। তার কারণও আছে একটু। পিল্লাই এ্যাঙ্কোনাতে পোঁছে হঠাৎ কিছু বেশি টাকা চেয়ে বসে ক্যাপ্টেনের কাছে। কিন্তু বে-নিয়মি চাইলেই ত' আর হবে না। যা সোনার ডিম দেবার তা সে এমনিই দেবে। তারপর হাজার পেট টিপলেও আর একটিও বেশি দেবেনা। ফলে বেচারীকে 'নম নম' ক'রেই সারতে হ'য়েছিল বিয়ের কাজটা। অবশ্য পিল্লাই জানতে পারেনি যে আমি আর দিনেশ সাক্ষিগোপাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলাম গির্জার বাইরে।

চলেছে জাহাজ। এ কূল ও কুল আর দেখা যায় না। বুকে লেগেছে পালের বাতাস। মাঝে মাঝে আফসোস হয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তির জোরে যদি বাড়িয়ে দিতে পারতাম জাহাজের গতি! খেউর গাওয়া কবিগানের আসর ছেড়ে উঠে আসি বাইরে। লস্করদের মেসে জারিগানের পালা আরও জোর দাপটে চলেছে। ঘুরে নিজের ঘরের দিকে যাব এমন সময় জাহাজের শিরায় শিরায় জেগে ওঠে এক বিপদের কম্পন। এস, ও, এস খবর ধরেছে স্পার্কি। গ্রীসের কাছাকাছি একটি জাহাজ বিপদ-বার্তা জানিয়েছে। দ্রাঘিমা এবং অক্ষাংশ অনুযায়ী স্থানটির ভৌগলিক অবস্থানও জানিয়েছে তারা। বলেছে জাহাজটির তলা ফেঁসে গিয়েছে। এখুনি সাহায্য চাই। অতএব ঘোরাও মুখ, ছোটাও ঘোড়া। কিন্তু ছোটাও বললেই ত' আর ছোটানো যায় না। সেই বাঁধা মাপ আমাদের। কুড়ি থেকে বাইশ নট ঘণ্টায়। হিসাব করে দেখা গেল চিকিৎসক গিয়ে পোঁছুবে মৃতদেহ দাহ করবার পর। অর্থাৎ ঘণ্টা কয়েক লাগবে আমাদের ঘটনাস্থলে পোঁছুতে। তাহ'ক, তবুও যেতে হবে। এই জায়গায় সব জাহাজ একসূত্রে গাঁথা। সাগরের নিয়ম। বর্ণ, ধর্ম বা রাজনীতির ক্ষমতা নেই তার ওপরে কোনও কথা বলে। এমন কি রাশিয়ার জাহাজ বিপদে পড়লে আমেরিকা ছুটে আসবে, আমেরিকা চোট খেলে চীন যাবে আশ্রয় দিতে। স্থলের কলুষতা সমুদ্রের লবণাক্ত জলে স্নান ক'রে হয়েছে নিষ্কলুষ। তার উদারতার স্পর্শ লেগেছে আমাদের প্রাণে। ছুটতে থাকি আমরা। আর্ত সাহায্যার্থায়।

কিন্তু শুধু ছুটলেই হবে না। পথে কাঁটাঝোপ, নুড়ি পাথর ইত্যাদি করে অনেক কিছুই থাকতে পারে। তার ওপর আবার গ্রীস বলে জায়গা। যেমন জলে তেমনি স্থলে। পাথর আর পাহাড় নিয়েই যেন কারবার। এগুতে হয় অতি সাবধানে পথ বুঝে বুঝে। দূর থেকেই দেখতে চেষ্টা করি। ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা এখনও। তবে যেভাবে খাড়া হ'য়ে উঠেছে একটা দিক তাতে মনে হয় শুধু তলা ফেঁসে যাওয়া নয়, আটকেও গিয়েছিল জাহাজখানা দুটি পাহাড়ের খাঁজের ভেতরে। তারপরই বেধে গিয়েছে ভাসবার ক্ষমতা (Centre of boyancy) ও ভার সাম্যের (Centre of gravity) লড়াই। ফলে উলুখাগড়া জাহাজটির এখন প্রাণ যায়।

গেলও তাই। আমরা গিয়ে পৌঁছুবার আগেই কিছুটা সোজা খাড়া হ'য়ে উঠে কাত হ'য়ে গড়িয়ে পড়ল জাহাজটি। আমরা হ'য়ে গিয়েছি আরও সাবধান। না দেখেও বলে দিতে পারি চীফ এবং সেকেণ্ড ডেক-অফিসার দু'জনেই এখন ব্রীজে একই টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে। সামনে খোলা রয়েছে গ্রীসের তটভূমির মানচিত্র। একমনে দেখে চলেছে অকুস্থানের হদিস আর সেই মত আদেশ দিচ্ছে সুখানীকে।

জাহাজের গতি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক আগে থেকেই। হাম্বা ডাক দিয়ে আশ্বস্তও করা হয়েছে বিপদগ্রস্থদের। এখন শুধু সমুদ্রের বুক থেকে একটি একটি করে গুণে তাদের তুলে নিতে পারলেই হয়।

ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছুতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। জলের ওপরে দুলছে কতকগুলি নীলপদ্ম আর তাদের ঠিক মাঝখানে একটি শ্বেতপদ্ম। ঢেউএর মাথায় মাথায় উঠছে আর নামছে। দেখলেই বোঝা যায় লড়াই করে চলেছে তারা অনেকক্ষণ ধরে। পাছে ঝিম এসে যায় সেই ভয়ে পরিত্রাহী চীৎকার করে চলেছে। অর্থ তার বাক্যে নয়, মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত করায়, জাগিয়ে তোলায় অবসাদগ্রস্থ স্নায়ুমণ্ডলীকে।

জলের ওপরে দাগ কেটে সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চলেছে লাইফ-বোট দুটি। যাচ্ছে আর ছুঁড়ে দিচ্ছে লাইফ-বেল্টগুলি। এক একটি বেল্ট জলে পড়ে আর ভাসমান মৃতদেহ লক্ষ্য করে ছুটে আসা মাছের ঝাঁকের

মত তু'পাখনায় জল টেনে এগিয়ে আসতে থাকে বাঁচার আকাঙ্খায় আকুল নাবিকের দল।

থেমে যায় একটি বোট। টেনে তুলে নিতে থাকে নাবিকদের। অপরটি এগিয়ে যায় শুভ্রকেশ ক্যাপ্টেনের দিকে। সেটাকে লক্ষ্য করেই চেঁচিয়ে ওঠে ক্যাপ্টেন—না। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি মানুষও জলে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উঠব না। আমার দোষেই এই জাহাজ ডুবেছে। শাস্তি পাওয়া আমার উচিত।

আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম দেখে যে কিছুতেই সেই বৃদ্ধ বোটে উঠল না। একে একে লস্কর, অফিসার, ইঞ্জিনীয়ার সকলকে উদ্ধার করার পর তাঁকে আবার অনুরোধ করা হ'ল উঠে আসবার জন্যে।

কতজন উদ্ধার পেল, আমাকে বল।

যার নিজের উদ্ধার পাওয়ার আশা নেই সে করছে আর কে কে উদ্ধার পেল তার খোঁজ। বিড়বিড় ক'রে মুখ খিস্তি করে একজন। করলে হবে কি, ক্যাপ্টেনের ঐ এক কথা। বাধ্য হ'য়েই আবার ফিরে গিয়ে উদ্ধারপ্রাপ্তদের গুণে এবং তাদের নাম লিখে নিয়ে এসে তাকে বলা হ'ল। তখন ভালমত শোনবার অবস্থাও নয় তার। একবার ডুবছে, একবার উঠছে। ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে আসছে শরীর, বেশ বোঝা যায়। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দেয় কয়েকজন। ঠেলে দেয় সে। জিজ্ঞাসা করে—কতজন উঠেছে? সংখ্যাটি বলতেই সে খপ্ ক'রে চেপে ধরে একজনের হাত। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি হাত তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তারপর ঐ বিরাট শরীরটিকে বহু টানা হ্যাঁচড়া করে তখন বোটের ওপরে তোলা হ'ল তখন আর জ্ঞান নেই তার।

ওরা উদ্ধার পেল কিন্তু আমাদের আর উদ্ধার নেই। ওদের নামিয়ে দেওয়া হবে নিকটতম কোনও বন্দরে। তারপর মাস্টারের মর্জ্জি হয়, হয়ত' সুয়েজ পেরিয়েও যেতে পারি। আশায় আশায় দিন কাটে। বন্দরের যেমন অন্ত নেই, তেমনি শেষ নেই আমাদের আশার। দিনশেষের

নিরাশা পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন আশায় বুক বাঁধি। ক্রমে নামতে থাকি। কেনিয়া, সাইপ্রাস, তেলআবিভ, ইস্রায়েল। নিস্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছে সেলুন। মেসেও আর শব্দ জাগেনা। এত খিস্তি, এত হুল্লোড়, সব যেন কেড়ে নিয়েছে কে। জোরে কথা বলতেও ভয় হয়। পাছে আমাদের প্রাণ-প্রাচুর্যের সংবাদ ঈর্ষা জাগায় মাস্টারের মনে, আর জাহাজে আবার উত্তর দিকের মাল বোঝাই করবার ব্যবস্থা করে বসেন তিনি। মুখর মুখের স্তব্ধতা আরও সজাগ ক'রে দিয়েছে দৃষ্টিকে। তাকিয়ে দেখি এ ওর মুখের দিকে, বিপরীত কোনও ভাষা লক্ষ্য করা যায় কি না। কিন্তু না, সকলের চোখে একই প্রার্থনার সুর—দোহাই ভগবান, জাহাজে যেন মাল না ওঠে আর।

মাল উঠলও না শেষ পর্যন্ত। যা উঠেছিল আগে তা ভারতবর্ষেই নামবে। এবার? পাড়ি মার রেড-সী। তারপরই এডেন। এত' আর ট্যাঙ্কার জাহাজ নয়। এডেনও দেবে না ঝাঁকা বোঝাই ক'রে। শুধু খোরাকিটুকুই বরাদ্দ। অতএব—

বালা গম্ভীরভাবে বললেন—বাপু হে, ভক্তিশ্রদ্ধা একটু করতে শেখ। অত নাস্তিকতা ভাল নয়।

অবশ্য অভক্তি যে কোনদিন করেছি তারও কোন প্রমাণ পাইনি। তবুও কথা হচ্ছে বলবার পালা এসেছে বালার, আমাদের শুনতেই হবে। সুবোধ ছাত্রের মত।

ছুটতে থাকি আমরা পোর্ট-সৈয়দের দিকে।

চুরি গিয়েছে। স্রেফ আত্মসাৎ করা যাকে বলে। আমি ত' আর যাই না। যায় দিনেশ। বেমালুম হাত সাফাই ক'রে দিয়েছে একখানা চিঠি। এ কাণ্ডটি যে ও কেন ক'রে বসল আমার ধারণাতেই আসে না তা। নিজের চিঠি পায়নি। রেগে গিয়ে ওখানাই হাতিয়ে নিয়ে চলে এসেছে।

এবারে এডেনে নেমে একটু দেখব বলে তৈরী হচ্ছি, এমন সময় এসে দাঁড়ায় ও। চোখে মুখে উত্তেজনার ছাপ।

কিরে, বিশেষ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিস্ বলে মনে হচ্ছে ?

চুরি করেছি। বলে হাতের চিঠিখানা দেখায় দিনেশ।

ছি ছি, যা, যার চিঠি তাকে ফেরত দিয়ে আয়। বলি আমি।

পাগল আর কি ! এখন ফেরত দিতে গেলে কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে। বলেই গলা নামিয়ে নেয়। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে—তার চাইতে আয় পড়া যাক।

তুই পড়গে' যা। ধমক্ দিয়ে উঠি আমি, ও কর্ম আমার দ্বারা হবে না।

সন্তু মহারাজ ! টিপ্‌পনি কাটে দিনেশ—না পড়লি, যা। বালার চিঠি, আমি পড়বই।

বিছানার ওপরে জুত্ হ'য়ে বসে চিঠিখানা খুলে নেয় ও। পড়তে থাকে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

শ্রীচরণেষু,

ওগো ! কতদিন তোমার মুখখানি দেখিনি। একবার ফিরে আসতে পার না কলকাতায় ? কয়েকটা দিন থেকে আবার না হয় যেও। তোমার যে গেঞ্জিখানা কাচতে দিয়েছিলে, আজও কাচিনি সেটা। ওটায় যে তোমার গায়ের গন্ধ মাখানো। ঝন্টি মন্টির সেই বাবাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি রোজই চলেছে। আমি কেউ নই। সবাই ভাল আছে। যত তাড়াতাড়ি পার আসতে চেষ্টা করবে কিন্তু।

প্রণাম নিও।

ইতি

সেবিকা

আশা

চিঠি শেষ হ'তেই খুক্ খুক্ শব্দ। ছোঁয়াচে রোগ। আমার পক্ষেও সামলে থাকা মুস্কিল হয়। যত গম্ভীর হ'তে চেষ্টা করছি পেয়ে বসছে তত বেশি ক'রে। শেষে দু'জনেই একসময়ে হো হো করে হেসে উঠি।

তারপর থেকে সমস্তটা রাস্তা রবীন্দ্রনাথেই পেয়ে বসে থাকে দিনেশকে। কখনও গায়—তোমায় আমায় মিলন হবে বলে। কখনও বা কবিতা আওড়ায়—তখন তুমি জানতে পারবে না সে—তারপর নিজেই যোগ করে—তোমার গায়ের গন্ধ নাকে আসে।

সামান্য যা মাল জুটেছে তা সবই নামবে মাদ্রাজে। তারপর সেখান থেকে মাল তুলে নিয়ে তবে কলকাতা। এ যেন পালার সময় শেষ হওয়া ফিরতি রিক্সা। জমা পড়ে যাওয়ার মুখে যা পাওয়া যায় দু'চার আনা তাতেই তুলে নেয় সোয়ারী। একেই বলে বুঝি পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। কলকাতাওয়ালাদের মুখ ভার। পিল্লাইএর কালো মুখে সাদা দাঁতগুলি ঝিলিক মারতেই থাকে। তা এইত' নিয়ম। ষোল আনা লোকের মুখে হাসি ফোটানো কোন আইনেই সম্ভব নয়। আমিও হাসতে পারি না। চিনুর চিঠি পেয়েছি এডেনে। লিখেছে ওর বাবার অসুখের কথা। প্রতিজ্ঞার কথা। তারপরে ক্ষমা চেয়ে বলেছে এছাড়া আমার উপায় ছিল নাগো। বাবার মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়াব, এ যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। তারপরই লিখেছে—তুমি বরঞ্চ আর কাউকে বিয়ে কর। আমার দুঃখের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নিজের জীবনকে ত' আর ভাসিয়ে দিতে পার না। লেখাটা জায়গায় জায়গায় ধেবড়ে গিয়েছে। চোখের জলের দাগ। কতখানি কষ্ট হ'য়েছে যে তার ঐ কথা কয়টি লিখতে, বেশ বুঝতে পারি। ভেবেছিলাম কড়া ক'রে একটা উত্তর দেব এর। মুলতুবি রেখেছি এখনকার মত। কলকাতাতেই ফিরছি যখন তখন উত্তরটা মুখোমুখি দাঁড়িয়েই দেওয়া যাবে। দিন গুণছি তাই, কবে নামব সেখানকার জমির ওপরে।

কলম্বোকে পাক মারতেই চেঁচিয়ে ওঠে পিল্লাই—হা হা, মাদ্রাজ!

তবে আর কি! খেঁকিয়ে ওঠেন বালা—জয় বৌ বলে একটা লাফ মার। একদম একলাফে গিয়ে পৌঁছুবে তোমার ইড্‌লী সুন্দরীর কাছে।

ফেটে যাবে বুঝি সেলুনটা। আবদ্ধ বাতাসের বুকে যে ঢেউ এর সৃষ্টি করছি আমরা আমাদের অট্টহাসি দিয়ে, তার চাপ কিছু কম নয়। তাকিয়ে

দেখি ভজহরিদাও হাসছে ফিক্ ফিক্ ক'রে। এতদিন পরে মানুষটার মুখে একটুখানি হাসির রেখা দেখা যায়।

মনু হাসলেই বিভা শাসন করত—দেখ ছোড়দা, যত হাসি তত কান্না—সেই কথাটিই বার বার মনে পড়ছে মাদ্রাজ বন্দরে গিয়ে।

পিল্লাই সট্‌কান দিয়েছে জাহাজ থামতে না থামতেই। আমরাও সহর ঘুরতে দল বেঁধে নেমেছি। বুঝতে পারি না ওদের ভাষার একটি অক্ষরও। যদিও সেটা ভারতীয়। বাধ্য হ'য়ে অভারতীয় ইংরিজির সাহায্য নিতে হয়। আহা, কি জিনিসই দিয়ে গিয়েছে ওরা! একেবারে 'বিশ্বমাঝে দিয়েছে তারে ছড়ায়ে'। কূলকিনারাহীন সমুদ্রের বুকে ওটা যেন একটি ভেলা। পার হ'তে না পারলেও ভেসে থাকা চলে। মুস্কিল হ'ল কিছু খেতে গিয়ে। পূবের মুখে দক্ষিণী খানা রোচে না কিছুতেই। শুধু-শুধি কতকগুলো কড়ি গুনাগার দিয়ে বেরিয়ে এসেছি একটা হোটেল থেকে। কেউ কেউ বলে—চল, জাহাজে ফিরে গিয়ে খাওয়া যাবে। ভজহরিদা ফিস্ ফিস্ ক'রে কাটান দেয় সে প্রস্তাব—সেখানে যে 'নো মিল' ক'রে দিয়ে আসা হল। অতএব আর কথা নেই, খোঁজ পূবের মানুষ কোথায় আছে। তা খোঁজার মত ক'রে খুঁজলে মধুসূদনদাদাও যেখানে নেমে আসে দৈএর হাঁড়ি হাতে করে, সেখানে বাঙ্গালীত' কোন ছার। মিলে গেলেন এক ভদ্রলোক দোকানে সদাই-রত অবস্থায়। দেখা মিলতেই সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। অবশ্য আমি নয়। ঠোঁটকাটা আমাদের দলে ঐ একটিই আছে। সেই বলল—দাদা! ভুল যদি না হয় ত' আপনি নিশ্চয়ই বাঙ্গালী?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা? মুচ্‌কি হেসে জিজ্ঞাসা করেন ভদ্রলোক।

আমরা সাগর-মরুর বেদুইন। চষে বেড়াচ্ছি পৃথিবীর প্রতিটি বন্দর। ভক্ত হনুমানের মত হাত জোড় ক'রে দাঁড়ায় দিনেশ—কিন্তু আর কথা বলবার ক্ষমতা নেই। চলুন দাদা। বৌদির হাতেব শাক চচ্চড়ি খেয়ে আগে জীবটাকে সজীব করে তুলি, তারপর কথা হবে।

ভদ্রলোকের মুখে সেই মুচকি হাসি লেগেই আছে। একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন আমাদের সকলের দিকে। তারপর বল্লেন—আসুন।

একেবারে যাকে বলে—এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। আমাদেরও হ'ল ঠিক তাই। অতি অল্প সময়ের ভেতরে বেশ পরিতৃপ্তি সহকারেই খাওয়ালেন ভদ্রলোক। তিন চার পদ তরকারী আর ভাত। তার ভেতরে আবার বড়ার অম্বল ছিল একপদ। আমি তো প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম আর কি অম্বল দেখে। যাই হোক খেয়ে দেয়ে এসে বসা গেল গল্পগুজব করতে। কিন্তু মনটা একটু খুঁত খুঁত করছিল। ভদ্রলোক কি এমনই পুরাতন-পন্থী যে আমাদের সঙ্গে আলাপটাও করিয়ে দিলেন না তাঁর স্ত্রীর। না কি, জাহাজী-জীবন বলে বিশ্বাস করতে পারলেন না আমাদের ভদ্রতাবোধকে। পরিবেশন ত' বরাবর তাঁর চাকরটিই ক'রে গেল দেখলাম। ভাবছি, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছি না সে কথা। ভদ্রতায় বাধে। আলাপ চলতে লাগল ঐ অন্তরালবর্তিনী মানুষটিকে এড়িয়ে। অনেক খোঁজ খবর নিলেন আমাদের, দিলেনও কিছু কিছু। গল্পে গল্পে বেলা পড়ে আসতে থাকে। এবারে বিদায় নিতে হবে। সহরটা আর এক চক্কোর ঘুরে তবে জাহাজে ফেরা। উঠে দাঁড়াই সকলে। দিনেশ বলে—দাদা, বৌদির সঙ্গে আলাপ তো করিয়ে দিলেনই না। এবারে একবার ডাকুন তাঁকে। নমস্কারটা অন্ততঃ জানিয়ে যাই।

দাঁড়ান, দেখছি।

বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেলেন ভদ্রলোক। একটু পরে সেই চাকরটিই এসে দাঁড়াল পান আর মশলা নিয়ে। ওকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠি—কৈ হে, বৌদি এলেন না?

বৌদি! লোকটা হতভম্ব হ'য়ে যায় আমার কথা শুনে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বৌদি। তোমার বাবু যে বল্লেন, পাঠিয়ে দেবেন? স্বরটা ঠিক নরম নয় আমার।

বৌদি কোথায় পাব বাবু? বিনয়ের সঙ্গেই বলে চাকরটি, বাবু যে বিয়েই করেনি। আমিই সব রান্নাবান্না করি।

এ কথার পর আমি শুধু একবার তাকিয়েছিলাম দিনেশের মুখের দিকে। দেখি, ও উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছে।

বড় জোর কিল খেয়েছি। তার উপরে বালার চিম্‌টি। দিনেশকে

পেয়েছে আজ হাতের ভেতরে। ওর বৌদি রোজ দাড়ি কামায় কি না, বিড়ি খায়, না সিগ্রেট খায়, একেবারে ল্যাজে গোবরে অবস্থা। সারাটা রাস্তা বাক্যের লড়ি দিয়ে কাতুকুতু দিতে দিতে দাবড়ে নিয়ে আসে গরুটাকে। কোনরকমে বন্দরে পৌঁছেই বেচারী গোঁৎ খেয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে ওর কেবিনের ভেতরে।

আমার পা আর চলে না। মাল ওঠান হচ্ছে জাহাজে। তারই একটার ওপরে দৃষ্টি আটকে গিয়েছে আমার। চম্‌কে উঠেছি তার গায়ের লেখা দেখে। লেখাত' নয়, কোন ডাকিনী যাতুমন্ত্রের বলে স্থাণু ক'রে দিয়েছে আমাকে। বারবার একই কথা ঘুরপাক খেতে থাকে মাথার ভেতরে—জাহাজ তাহ'লে কলকাতায় ফিরছে না আর! আবার সেই এডেন, সুয়েজ, ভূমধ্যসাগর, জল আর জল, চারঘণ্টার কয়েদী জীবন অগ্নিকুণ্ঠুরীর ভেতরে, তারপর টলতে টলতে ওপরে উঠে আসা, নেতিয়ে পড়া বিছানার ওপরে—ঘুম চাই, ঘুম।

এই আমাদের জীবন। বাড়ীর দোর-গোড়া থেকে ফিরে যেতে হয় বারে বারে। হয়না ঘরে ঢোকা। একবার নয়, বার বার লাভ করেছি এ অভিজ্ঞতা। ছুটি নিয়েও কাটাতে পারিনি নিশ্চিন্তের দিন কয়টি। সাতদিন পেরুতে না পেরুতেই এসেছে জরুরী ডাক। এরই ভেতরে খুঁজে নিতে হয় আনন্দ, বাঁচবার মত একটু অবলম্বন। যেমন অবলম্বন পেয়ে বেঁচে গিয়েছে দিনেশ। ইন্দোনেশিয়ার পালা শেষ ক'রে গিয়েছিলাম বার্মায়। বার্মা থেকে চুরুট আর কাঠ তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম পশ্চিমী বন্দরে। তারপর প্রায় ছয়টি মাস ধরে ঘুরে তবে ফিরে আসতে পেরেছিলাম যখন তখন দেখেছিলাম বেশ সেরে উঠেছে দিনেশ। স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আসায় খুঁৎ খুঁৎ করে ফস্তির ঐ ঝুপড়ির ভেতর থাকতে। ফস্তিকেও আর কারও সামনে হাত পেতে দাঁড়াতে হয় না—বাবু, মানুষডা কালথন না খাইয়া রইছে, কিছু ছান। রিলিফ অফিসের সামনে চট বিছিয়ে বসে যায় দিনেশ। মুহুরীর কাজ করে। যা পায় তাইতেই চলে

যায় তু'জন মানুষের আড়ম্বরহীন জীবন। তবুও ভয় ফন্তির—যদি হঠাৎ বেসামাল হয়ে পড়ে! তাই চুপটি করে বসে থাকে দিনেশের পাশে। নির্বাক সাহচর্য দিয়ে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে তাকে। ভালবাসার মধুর স্পর্শ জুটেছে আমার ভাগ্যেও। কিন্তু ফন্তির এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা সত্যিই অনবদ্য, অপার্থিব।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম দিনেশকে—কিরে, আর জাহাজে আসবি না?

নাঃ। কথাটির মাধ্যমেই যেন ঝেড়ে ফেলে মুক্ত হ'য়ে উঠল সে ঐ জীবন থেকে। তারপরই ডুবে গেল আপন চিন্তায়। আমি অপেক্ষা করছি যদি ও আরও কিছু বলে। একটু পরে নিজে থেকেই বলে সে—কিছু টাকা পেলে তবে হয়।

কি হয়? ধরতে পারিনা ওর বক্তব্য।

ফন্তিকে বিয়ে করব ভাবছি। উত্তর দেয় ও।

উত্তরটি হঠাৎ জাগেনি ওর মনে। মনস্থির করেছে কিছুদিন আগেই এবং তা নিয়ে ভেবেও চলেছে। সুতরাং ও যে নিশ্চিতভাবে সেরে গিয়েছে সে কথা জোর ক'রেই বলা যায়। আর বিয়ে এখন ওর করাই উচিত। সাময়িক কিছু অনটনের ভেতরে পড়তে হ'তে পারে। কিন্তু যে ধার ওর আমি দেখেছি তাতে যদি মরচে না পড়ে থাকে তাহ'লে আটকাতে পারবেনা ওকে কেউই। আশ্বাস দিয়ে আসি—দাঁড়া, দেখি যদি কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারি।

আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম বটে, কিন্তু কিছুই করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। একটা নয় তু'তুটো বিয়ের চিন্তা মাথায়। এর আগের বার এসে বিভার জন্যে পাত্র দেখে গিয়েছি। এবারে ওর বিয়েটা দিয়ে যাব স্থির ক'রে তু'মাসের ছুটিও নিয়েছি। দিন স্থির। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি রাস্তায় রাস্তায়। অন্ততঃ হাজার তুয়েক টাকা ধার না পেলে কার্যোদ্ধার হয় না। বোঝার ওপরে শাকের আঁটি দিনেশ। ওকেও কিছু দিতে হবে। ও বিয়ে করুক ফন্তিকে। ভালবাসার ভেতর দিয়ে আবার বেঁচে উঠুক, এই আমি চাই। কিন্তু আমাদের চাওয়া যে কত তুচ্ছ তা প্রমাণ ক'রে দিল কোম্পানী। তু'মাস ছুটির পনেরটা দিন যেতে না

যেতেই নাকের দড়ি ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান মেরে নিয়ে গিয়ে তুলল জাহাজে। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বিয়ের অনেক কিছু জিনিস কিনে নিয়ে এসেছি। বেলা প্রায় বারটা বাজে। তা বাজুক। সূর্য থাকলে উঠবে আর ডুববেই। ঘড়ি থাকলে একটার পর একটা বাজবেই। তাই বলে আজকের এ আনন্দকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। আমি একে একে জিনিসগুলি দেখাচ্ছি মাকে। আর উত্তেজিত ভাবে বুঝিয়ে চলেছি কোন জিনিসটি ক'দোকান ঘুরে কতটা সস্তায় পেয়েছি। বলছি আর লক্ষ্য করছি মায়ের মুখের হাসিটি। বিভাও এ ঘর থেকে ওঘর যাবার সময়ে আড়চোখে দেখে যাচ্ছে তার জিনিসগুলি। ওকে একটু লজ্জা দেবার জন্যে বলি—দেখছ মা, বিভার এ ঘর ও ঘর যাতায়াতটা একটু বেড়ে গিয়েছে। অত ছলাকলার দরকার কি? সোজাসুজি এসে বসে দেখলেই হয়।

আহা, ঐ দেখবার জন্যে বুঝি? ঘরের ভেতর থেকেই প্রতিবাদ ক'রে ওঠে বিভা—আমার আর কাজ নেই ও ঘরে? তারপরই অভিমানের সুর—যাও, আমি বেরুব না ঘর থেকে।

মা, আমি দু'জনেই হেসে উঠি ওর কথা শুনে। বহুদিন, বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে আর একটি দিনও এমনভাবে হাসেননি মা।

আর সেই হাসিকে মলিন ক'রে দিয়ে এল কোম্পানীর হুকুমনামা। জাহাজ ছাড়বে কয়েকদিনের ভেতরেই। অতএব কাজে যোগ দিতে হবে। মা বিশেষ অসন্তুষ্টই হয়েছিলেন সেদিন। বলেছিলেন—এইভাবে কখন সংসার করা হয়, না ক'রতে পারে মানুষে? ছুটি নিলি পুরো দু'মাসের, পনেরটা দিন যেতে না যেতেই আবার টান পড়ে কেন?

এ 'কেন'র উত্তর আমার কাছে নেই। যাদের কাছে আছে তারা উত্তর দেয় না, দেয় হুকুম। বঁড়শি আর টোপ দুই-ই আছে তাদের হাতে, গেলবার গত মাছেরও অভাব নেই। তাই 'সাবধানের মার নেই' নীতিটি মেনে চলাই প্রশস্ত।

মাকে বলেছিলাম—মনু আছে, ও পারবেনা বিয়েটা দিয়ে দিতে?

পেছন থেকে বলে উঠেছিল মনু—হ্যাঁ, তাই আর কি। মন্তর পড়তে গেলেই বলে বসবে—সংস্কৃত উচ্চারণ হচ্ছে না তোর।

আমি বোঝাতে চেষ্টা করি যে সংস্কৃত উচ্চারণ টুচ্চারণ ওসব কিছু নয়। আসল কথা হচ্ছে নিমন্ত্রিত সকলকে সাক্ষী রাখা হ'ল যে এই মানুষ দুইটির বিয়ে হ'ল। রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করতে গিয়ে কেউ পুরোহিত দর্পণ খুলে বসে না। তার কারণ সেখানে সাক্ষী থেকে যাচ্ছে রেজিস্ট্রার আর রেজিস্ট্রি।

মা ওসব কিছুই শুনতে চান না। বিভার বিয়ে হবে অথচ আমি উপস্থিত থকব না, এ নাকি হ'তেই পারে না। আসল কথাটি সেখানে নয়। যে কথাটি বল্লেন না মা সেইটিই হচ্ছে তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা। মা এখন আর ছেড়ে থাকতে চান না আমাকে। বয়স এবং রোগের ধাক্কায় মনের শক্ত বাঁধনগুলি ঢিলে হ'য়ে গিয়েছে। ভয় এসে গিয়েছে মনে। শক্ত কোনও অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে সেই ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে চান। মনু পারেনি মাকে সে সাহচর্য দিতে। ঘরমুখী নয় ও। প্রয়োজনের খাতিরে কর্তব্য কাজটুকু সেরে দিয়েই পালিয়ে যায়। একা বিভাকে তখন সংসারের সমস্ত ধাক্কাটিকে সামলাতে হয়। মায়ের কাছে এসে দু'দণ্ড বসবারও সময় জোটেনা বেচারীর। ফলে শূন্য মনের সুযোগ নিয়ে দুশ্চিন্তাগুলি একযোগে আক্রমণ করে বসে। বিভার কাছে শুনেছি, একলা ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে মা নাকি কখন কখন ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে ওঠেন। ছুটে যায় বিভা। মাকে ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে দেয় বারান্দায়। অনুযোগ করে—তুমি একটু দেখবে না, শুনবে না, আমি একা একা কাজ করে যাব। পরে বলবে—এটা হ'ল না, ওটা করলি না কেন? মায়ের মনটিকে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে সুস্থ চেতনাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে বিভা। ওর এই সহজ সুন্দর চিন্তাধারাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

জাহাজীদের দুপুরের আয়েসি ঘুমের বদ অভ্যাস করলে চলে না। বরঞ্চ যখন তখন ঘুমের অভ্যাস করতে হয়। কখন প্রয়োজন হবে চোখ থেকে ঘুমকে হটিয়ে দেবার আর কখন মিলবে দু'ঘণ্টা সুযোগ, কেউ বলতে পারে না। তাই দুপুরে ঘুমুই না আমি। মায়ের কাছে বসে বসে গল্প-গুজব ক'রে বেলা একটু গড়িয়ে যেতেই উঠে পড়ি।

দেখি একবার কোম্পানীকে বলে। মানবে বলে মনে হয় না।

উঠে এসে আমার ঘরে গিয়ে ঢুকতেই চায়ের কাপ হাতে ক'রে এসে দাঁড়ায় বিভা।

দাদা, চা।

ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখ পড়ে ওর চোখের দিকে। অন্তরের আবেদনে মুখর। বিংশোত্তীর্ণা। ঘর এখন ও চায়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক। সেই পরম লগনটি কাছে এসেও এমনভাবে দূরে সরে যাবে আমার জন্যে, এইখানেই ওর ব্যথা। এক হাতে কাপটা ধরে নিয়ে আর একটা হাত বাড়িয়ে দিই—আয়। কাছে এসে দাঁড়ায় ও। পরম নিশ্চিন্তে আরও কাছে টেনে নিই তাকে। অনুভব করতে দিই, ওর জন্যে আমার বুকের অনেকখানি জায়গা ছাড়া আছে। ভুল যেন ও না বোঝে।

দাদা, বৌদিকে আনবে না তুমি ?

এই একটি প্রশ্ন পাষাণ চাপ নিয়ে বসেছে এই সংসারটির বুকের ওপরে। বুঝি। বোঝে চিনুও। কিন্তু করতে পারছে না কিছুই। গতদিনও দেখা করেছি তার সঙ্গে। এতদিনে ভেঙ্গে পড়েছে ও। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে আর দোষারোপ ক'রেছে আমাকে। কেন আমি সেই প্রথম দিনেই ছিনিয়ে নিয়ে অসিনি ওকে, কেন লম্পট দুশ্চরিত্রের মত ব্যবহার করিনি ওর সঙ্গে। যোগ সামঞ্জস্যহীন অনুযোগের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে আমার ঘাড়ে। উত্তর দিইনি আমি। এ ধরণের মানসিক বৈকল্যে নিরুত্তরতাই একমাত্র ওষুধ। উত্তর দিলেই আক্রোশে পরিণত হ'তে পারে ওর আক্ষেপ। অনেকক্ষণ ধরে দোষারোপ করা এবং ফোঁপানীর পর আবেগটা ধীরে ধীরে কমে এসেছিল তার। চোখের জল মুছে মুচকি হেসে বলেছিল—দেখি।

কি ?

শ্রীচরণ দুখানি।

জোড়াসন হ'য়ে বসেছিলাম। পাদুটোকে আনতে হয় বাইরে। গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে বলছিল—রক্তমাংস দিয়ে যে পাথরের মূর্তি তৈরী হয় তা এই প্রথম দেখলাম।

পাথর আমি নই। পুরো রক্ত মাংসেরই গড়া। এক পাষাণময়ীর

সংস্পর্শে এসে বাধ্য হয়েছিলাম এই ব্যথার পূজার নৈবেদ্য সাজাতে। এক ধৈর্যশীলার পাশে তারই উপযুক্ত ধৈর্যমান হ'য়ে দাঁড়াতে। সেদিন ওর কথা শুনে মনে হ'য়েছিল তা'হলে কি ভুলই করেছি এতদিন? প্রয়োজন ছিল না এই কৃচ্ছ্রসাধনের? তাই যদি হয় তবে আর মায়ের আফসোস কেন না মেটাই! লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরে টান দিই ওকে।

তাহ'লে চল, আজই যেতে হবে আমাদের বাড়ী।

বাবা? জিজ্ঞাসা করে ও। আবার ছলছলিয়ে উঠেছে চোখতুটি।

ঐ একটি প্রশ্ন। আমার জীবনক্ষেত্রে বারবার ঐ একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে সমাধানহীন সমস্যা হ'য়ে। এড়িয়ে যেতে পারিনি। পারিনি মিটমাট ক'রে নিতে। একবার ছাড়া দ্বিতীয়বার কখনও জানতে দিইনি চিন্নুকে যে ঐ শব্দটিকে সহ্য করাও অত্যন্ত কষ্টকর হ'য়ে উঠেছে আমার পক্ষে। প্রাণপণে চেষ্টা করি নিজেকে সংযত রাখতে। টেনে আর তোলা হয় না তাকে। ধরা হাতখানি ছেড়ে দিতেও পারি না। জিজ্ঞাসা করি—তাহ'লে?

বস, একটা কথা বলি তোমাকে।

মিনতিতে ভরপুর ওর চোখতুটি। থরথর ক'রে কাঁপছে ঠোঁট। বুঝতে পারি ঐ একটিই মাত্র প্রশ্নের দেয়ালে বারবার মাথা ঠুকে ঠুকে ও-ও আজ ক্ষত বিক্ষত। না পারে সইতে, না পারে বইতে। তবুও যার সমাধান নেই তা সহ্য করা ছাড়া উপায়ও নেই। বসি আবার। নইলে আঘাত পাবে ও।

তুমি গতবার এসে যে পেনটি দিয়েছিলে আমাকে, প্রথমটি নয়, দ্বিতীয়টি, সেটি নিয়ে গিয়ে বাবাকে দিয়েছিলাম।

কেটে কেটে ছেড়ে ছেড়ে বলতে থাকে চিন্নু। কান্নার বেগটিকে সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেনি। নির্বাক বসে থাকি আমি। একটু একটু ক'রে শোনাতে থাকে ও—

বলেছিলাম, বাবা, উনি তোমাকে এটা লেখবার জন্যে দিয়েছেন। বাবা কলমটি নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে বল্লেন—দামি কলমরে। তা আমি এখন আর কলম দিয়ে কি করব? লিখতেও যে পারি না ভাল ক'রে।

ভাবলাম কলমটা বুঝি ফেরত দেবেন বাবা। তা দিলেন না। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর একদিন ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখি বাবা খুব বকাবকি করছেন বৌদিকে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল বৌদি—কি আবার, তোমার কায়েত স্বামীর দেওয়া কলমটা দিয়ে একটু লিখেছিলাম তাই এই পালাগান শুনতে হচ্ছে। সেই থেকে বাবা কাছছাড়া করেন না কলমটিকে। সেদিন দেখি, খালি গায়ে বারন্দার উপরে পায়চারী করছেন আর পৈতের সংগে কলমটা ঠিক লটকান রয়েছে।

কথা শেষ ক'রেই খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে চিনু।

হাসতে পারি না আমি। সামান্য কলমের পিছনে রয়েছে বিরাট স্বীকৃতি। শুধু প্রকাশ করতে পারছেন না এতদিনের জেদের লজ্জায়। জাত্যাভিমানের কাঠামোটার বাঁধন ঢিলে হয়ে গিয়েছে। এখন সামান্য একটু নাড়া দিতে পারলেই ঝর ঝর ক'রে খসে পড়বে তার প্রতিটি অংশ। সমাধানের পথটি এতদিনে খুঁজে পেয়েছি আমি।

চিনু, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।

কেন? ভীষণভাবে চম্‌কে ওঠে সে।

এতদিন না যাওয়াটাই অন্যায় হ'য়েছে আমার পক্ষে। বুঝিয়ে বলি আমি, হাজার হ'লেও গুরুজনতো।

যদি বকেন? ভয় কাটে না ওর।

আমার মনেও পড়ে না গুরুজনদের বকুনি কোনদিন খেয়েছি কি না। বড় লোভ হচ্ছে বকুনি খেতে। চল, একটু বাজার ঘুরে যেতে হবে।

উঠে দাঁড়াই। হাত ধরে টেনে তুলি ওকেও। বিশ্বাস নেই মনের গতিকে। এখুনি আবার হয়ত' উল্টো যুক্তির ধারা বইয়ে দেবে।

চিনুকে সঙ্গে নিয়ে সোজা গিয়ে উপস্থিত হই নিউমার্কেটে। কয়েক-টাকার ফল কিনে ওর হাতে দিই। বলি, কাল কিন্তু আমি খালি হাতেই দেখা করতে যাব। আর তোমার বাবাকে আমার যাওয়ার কথা কিছুই বলবে না।

বিভার কথায় সেই কথাটিই মনে পড়ে যায়। এতক্ষণে হয়ত' চিনু

স্কুল থেকে বাড়ী চলে গিয়েছে। আমার অপেক্ষায় চেয়ে আছে সদর দরজার দিকে। বলি ওকে—আজ তোর বৌদির বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভেবেছিলাম—

কথাটা আর শেষ ক'রতে দেয় না বিভা। বলে ওঠে—যাও না। তারপর যা বলে তাতে চমৎকৃতই হ'য়ে যাই আমি। বলে—এতদিন না যাওয়াটাই তোমার অন্যায় হয়েছে। আমি হ'লে—মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যাওয়ার লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল বেচারী। চেষ্টাও করেছিল পালিয়ে যেতে। পারেনি। ওর কাঁধটা জোরে চেপে ধরেছিলাম আমি। বলেছিলাম ওর লজ্জার বাঁধনকে ভেঙ্গে দিয়ে—তোর বুদ্ধি আমাকে দে বিভা। আমি তাই মানবো।

ছাই মানবে। দু'জনেই গোঁয়ার।

নারে বিভা, সত্যিই আজ যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখছিস তো, ডাক এসে গেল জাহাজের। আর এত অল্প সময়ের নোটিশ—কি যে আমি করি? আমার আর ভাল লাগছে নারে। কেমন অবসাদ এসে গিয়েছে। তোর বিয়ে হ'লে তুই চলে যাবি। মনুর মন বসে না বাড়ীতে। মা একা একা পড়ে থাকবে। আমি থাকব দূরে কোথায় কোন সমুদ্রের বুকে, হয়ত' জানতেও পারব না—থর্ থর্ করে কেঁপে উঠি এক অনাগত ভয়ের আশঙ্কায়। সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াই ওর দিকে মুখ করে—কিন্তু কেন? কি এমন পাপ আমি করেছিলাম বলতে পারিস?

শুধু আমার নয়, বিভার চোখেও জল। সরে এসেছিলাম প্যাণ্ট জামা গুছিয়ে নিতে। পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায় বিভা, মায়ের মত স্নেহ দিয়ে মুছিয়ে দেয় আমার চোখের জল। বলে—দাদা, তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু বৌদির বাড়ীর ঠিকানা আর স্কুলের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাও।

কতখানি শান্তি যে সেদিন আমাকে দিয়েছিল বিভা, কতবড় পাষাণ-চাপ নামিয়ে দিয়েছিল আমার বুকের ওপর থেকে, তা ও ধারণাও করতে পারবে না। ওর চিন্তা, ওর কাজ যে মানবিকতার পথ বেয়ে চলে, সাংসারিক তুচ্ছতাকে দিয়ে মলিন ক'রে তোলে না কখনও। বিভা আমার

ছোট বোন। তবুও সে আমার বান্ধবী, আমার দুঃখের দরদী। আমার বিক্ষুব্ধ চিত্তের নিঃশঙ্ক আশ্রয়।

আমাদের দিনেশের সংস্কৃত শাস্ত্রে আর একটি কথা ছিল—ফাটা কপাল আম্রআঠায়াং অর্থাৎ আমের আঠা দিয়ে জোড়াতালি লাগিয়ে ফাটা কপাল আর কতটুকু কার্যকরী হবে, এই হচ্ছে তার ভাষ্য।

আমারও তাই। বি, ও, এ, টির হাতুড়ি মেরে কপাল ফাটিয়েছি। এখন আমের আঠার জোড় দেওয়া ছাড়া গতি কোথায়? ভারতীয় উপকূলের লাইন ধরলে জাহাজ বড় একটা বাইরে যায় না। সেই ভরসাতেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কলম্বো থেকে জাহাজ মাদ্রাজমুখী না হ'য়ে বোম্বাইএর দিকে ছুটতেই বোঝা গেল কোম্পানীর আসল ইচ্ছাটা। সেটা আরও নিশ্চয় ক'রে জানলাম বোম্বাইএ পৌঁছবার পর। হামবুর্গের মাল উঠছে জাহাজে। আবার সেই ভূমধ্যসাগর! গলাবুক শুকিয়ে যায় আমার ঐ সাগরের নাম শুনলেই। বেশ মনে আছে আমার, বিহঙ্গম্‌এ প্রথম যাত্রাতেই আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল দেড়টি বছর। তারপরের দুটি যাত্রা অবশ্য ছ'মাস আট মাসের বেশী নেয়নি। কিন্তু চতুর্থবারে যেবার দিনেশ অসুস্থ হ'য়ে পড়ল তিলবেরীতে গিয়ে, সেবার দু'বছর তিন মাস ছিলাম বাড়ীছাড়া। এই ভাবেই এক এক করে কেটে গিয়েছে জীবনের এতগুলি বৎসর। সে বৎসরগুলির ভেতরে বসন্ত এসেছিল কিনা তার মোহের মন্ত্র নিয়ে, তা জানি না, তবে শীতের কাঁপন আর গ্রীষ্মের দাপট হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি। কিন্তু দুঃখ আমার নিজের জন্যে ততটা নয়, যতটা হয়. ছোট বোনটির জন্যে। আমার ভাগ্যের খেলায় সেও হতে চলেছে একটি খেলার গুটি। কি যে করি, বুঝে পাচ্ছি না। অমন সৎ.পাত্রটিও যদি হাতছাড়া হ'য়ে 'যায়—নিদারুণ এক ভয় এসে বুকের ওপরে চেপে বসে আমার। তাড়াতাড়ি কেবিনে গিয়ে বসি চিঠি লিখতে। প্রথমেই সমরকে বুঝিয়ে বলি আমার অবস্থার কথা। দু'হাত জোড় করে অনুরোধ করি তাকে কয়েকটা মাস অপেক্ষা করতে। কলমের মুখ দিয়ে যতখানি মিনতি করা যায় তার কিছুই বাদ রাখিনা।

তারপর বিভা। জানি, সে বুঝবে আমার কথা। তবুও বলতে হয়—বিভারে, পায়েতে যার নিগড়, ইচ্ছামত চলবার ক্ষমতা তার নেই। আমি জানি বেশি ক'রে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই তোকে। তাহ'লেও কেবলই মনে হয় আমিই অপরাধী। যা কর্তব্য, যা করা আশু প্রয়োজন, তার কিছুই করতে পারছিনা। চলেছি হামবুর্গ। সেখান থেকে ফিরে এসেই সব ব্যবস্থা করব। সমরকেও এই খানেই চিঠি দিলাম। তৃতীয় চিঠিখানিতে সমরের অফিসের ঠিকানা দিয়ে চিনুকে লিখে দিই—চিনু, একটা অত্যন্ত গোপনীয় অথচ বিরাট কাজের ভার তোমার কাঁধে চাপাচ্ছি। সমরের সঙ্গে আলাপ করবে। খুব ভাল ছেলে। আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। আমার হ'য়ে তাকে অনুরোধ করবে এবং সম্মত করাবে যাতে আমি ফিরে গিয়ে ওর সঙ্গেই বিভার বিয়েটা দিতে পারি।

চিঠি তিনখানি ছেড়ে দেবার পর অনেকটা শান্তি পাই মনে। হাসিও পায়। যার ওপর নির্ভর করা উচিত তার দ্বারা কোন কাজই হয় না। এক অডিটিং ফার্মে চাকরী পেয়েছে। বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ তাই আগের চাইতে আরও কমেছে। মনুর এই গা-ছাড়া ভাব আমার কোনদিনই ভাল লাগেনা। একটি পূর্ণবয়স্ক যুবককে দিয়ে সংসারের কোন উপকারই হয় না। আর দুটি মেয়ে আমার সবল দুইটি বাহু। পৃথিবী ঘুরছে। ঘুরবে আরও। ইতিহাস তার চাকার দাগে দাগে পা ফেলে চলে না সব সময়ে। সৃষ্টি করে নতুন ইতিহাস। তারই নূতন ঊষার চোখের চাউনি দেখতে পাচ্ছি আমি। এগিয়ে চলেছে মেয়েরা। আরও এগুবে। হয়ত' সামনে, নয়ত' পুরুষের পাশে পাশে; পিছনে আর নয়। এ দৃঢ়তা তাদের চোখে মুখে প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে প্রকাশ পায়। হারেমের হাজার সুন্দরী থেকে আরম্ভ করে রাত্রের দেহ-পসারিনী, বুকে তাদের একই জ্বালা, চোখে তাদের একই ব্যথার প্রকাশ—নিপীড়ন। সহ্য করতে পারেনি, বুক ফেটেছে যন্ত্রণায়, তবুও মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারেনি—কেন আমাকে এই করে রাখা হয়েছে? মুক্ত, স্বাভাবিক, সুন্দর জীবন কেন আমার জন্যে নয়? সরবে হেসেছে বলদর্পী পুরুষকে খুশি করবার জন্যে, নীরবে কেঁদেছে আপন বিষাক্ত, ক্লেদাক্ত জীবনের বোঝার ভারে মুখ গুঁজড়ে পড়ে।

পুঞ্জীভূত সেই ব্যথাই মূর্ত হ'য়ে উঠেছে আজ। বদ্ধ পরিকর তারা তাদের প্রতিটি আঘাত ফিরিয়ে দিতে।

হামবুর্গ বেড়াবার মত মনের অবস্থা আর নেই আমার। কেবলই মনে হচ্ছে কতক্ষণে ছাড়বে জাহাজ। তবুও দু'একদিন বেরিয়ে ঘুরে এসেছিলাম এই ছোট সহরটি। রিংমেইন রেলওয়ে সীস্টেমএর ট্রেণে চড়ে সহরটিকে প্রদক্ষিণও করে এসেছিলাম। এটা উপভোগ করবার মত জিনিস বটে। কখন সমতলে, কখন ভূ-গর্ভে আবার কখনও বা কোন বাড়ীর মাথার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে ট্রেণ। আর দেখেছিলাম প্লানটেন আন্ ভূমেন্। একটি পার্ক। ঢুকলেই মনে হয় জীবনটা শুধু এই জন্যেই যেন সৃষ্টি হ'য়েছে। কনসার্ট পার্টি, নাচ, স্কেটিং। টিকিট কেটে ঢোক আর প্রাণ খুলে আনন্দ কর। সে আনন্দে মাতবার মত মনের অবস্থা নয় আমার। এতদিনে যেন ঠিক ঠিক ভাবে হ'য়েছি এক ছিন্নতন্ত্রীবীণা। যতবারই নতুন ক'রে সুর বাঁধবার চেষ্টা করেছি, কেটে গিয়েছে কটাস্ ক'রে। ভয় হয় মাঝে মাঝে, এ জীবনটা বুঝি অগীত গানের আক্ষেপ নিয়েই কেটে গেল!

তবুও দেখেছিলাম হামবুর্গকে। গিয়েছিলাম সেখানকার বাঙ্গালীটোলা হ্যালেতেও। আলাপ পরিচয়ও হয়েছিল কয়েকজনের সঙ্গে। তার ভেতরে বিপরীত-ধর্মী দুটি চরিত্র ভোলবার নয়। একজন বহু আয়াসে বাংলা ভাষাকে প্রায় ভুলে এসেছেন। যদিও হামবুর্গের বয়স তাঁর বছর পাঁচেক। অপরজন তাঁর বছর কয়েক আগেই সেখানকার মাটিতে পা ফেলেছেন শুনলাম। কড়া বাঙ্গাল। কথার খৈ ফুটছে মুখে। শুধু সেইজন্যেই নয়, তাঁর একটি কীর্তি যা আমাকে দেখিয়েছিলেন তাতেই আমি বোবা। মনে হয়েছিল, আহা, এই রকম পদার্থ যদি ডজন খানেক নামিয়ে দেওয়া যেত এখানকার মাটিতে!

কথা বলছিলাম তাঁর সঙ্গে স্যাবটপার্কের ধারে দাঁড়িয়ে। বিরাট পার্ক। হামবুর্গের অহঙ্কার। ঢোকবার মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর বার্লিন অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম, এমন সময় একটি জার্মান ছেলেকে দেখে চীৎকার করে ওঠেন তিনি—এই গ্যাটু, কাইল কামে যাইবা না? গ্যাটু ফিরে তাকিয়ে ওঁকে দেখে মুচ্‌কি হেসে উত্তর দিয়ে যায়—যামু। বোসের এই কীর্তির

আর জবাব নেই। আমরা কিন্তু পারিনি মিঃ মিচেলকে দিয়ে বাংলা বলাতে। চেষ্টা করতে গেলেই চটে উঠতেন—আমি বাংলা পছন্দ করিনা। ইংরিজিতে বল। তাই বলতে হ'ত শেষ অবধি।

হামবুর্গ আর ব্রেমেন, একটিলে তুই পাখী মেরে বেরিয়ে এসেছি সাঁ ক'রে। মাল জুটেছে ভারতের। অতএব মাভৈঃ।

বহুদিন, মনে হয় যেন কত যুগ পরে আবার ফুরফুরিয়ে উঠেছে মন। সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রার্থনা ক'রে চলেছি—হে ভগবান, ভালভাবে পৌঁছে দিও কলকাতার ঘাটে। নিজেই ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে যাই, যাঁকে কোনদিন ভুলেও ভাবিনি, না, এমনকি বাবা যেদিন ছেড়ে গেলেন আমাদের, সেদিনও না, তাঁকেই কেন আজ এমনভাবে একমনে ডেকে চলেছি। আমারই যুক্তি ছিল—অসহায়ের শেষ সম্বল ভগবান। তবে কি আমি এতই অসহায় বোধ করছি আজ নিজেকে? কিন্তু কেন? ইঞ্জিনগুলির চেহারা ফুটে ওঠে চোখের ওপরে। না, ঠিকই আছে প্রত্যেকটি। খালাশীরা? তাদেরও কোন অসন্তুষ্টির কারণ ঘটেনি। তবে? খুঁজে পাই না এই 'তবে'র কারণ। নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত বোধ করি। আবার উড়িয়ে দিই সেই ভাবটিকেও। ডেকেছিত' হয়েছেটা কি? আর কোথাও না থাকুক। আমার অন্তরে থাক তাঁর ঠাঁই। সেই যে কি একটা কবিতায় পড়েছিলাম—হৃদয় আমার কর ফুলের মতন, শুভ্র সুনির্মল। সেইরকমই হ'ক না কেন, ক্ষতি কি?

জাহাজ যখন ছোটে, দেখে তার সব চাইতে কম মাপের পথটি। আমরাও তেমনি বেরিয়ে এলাম ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের মাঝখান দিয়ে। আবার সেই অশান্ত বে অফ্ বিস্‌কে। ফুলে ফুঁসে উঠছে সব সময়ে। বায়না ধরা ছেলের মত পা আছড়ে চলেছে। এক একবার ভেবেছি জাহাজ খালি ক'রে তেল ঢেলে দিয়ে দেখা যায় না ওর এই অশান্তার শেষ হয় কিনা? ভেবেছি আর টেনে চলেছি। রিলে রেস নয়, স্টিপ্‌ল চেজ্ নয়, সোজা ফ্ল্যাট রেস। মারী, তেরেসাকে বাঁ হাতে রেখে ভূমধ্যসাগরকে লম্বালম্বিভাবে কেটে বেরিয়ে এসে পড়ব সুয়েজে। আর সুয়েজই যদি দেখা গেল, তবে আর বাড়ী পৌঁছুতে দেরি কি? কত নট্ চলেছে ঘণ্টায়? জলের দিকে তাকিয়ে মনে হয় বাইশের বেশি নয়। মনটা

খারাপ হ'য়ে যায় এই শম্বুকগতির কথা ভেবেই। আশ্চর্য! গতির লড়াই চলেছে সমস্ত পৃথিবীটা জুড়ে, আর আমরা পড়ে আছি সেই একই জায়গায়। কত যাত্রীবাহী জাহাজ আছে যেগুলি ঘণ্টায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ নট্ অনায়াসেই দৌড়োয়। যাকগে, যা নই তা নিয়ে আফসোস ক'রে কোন লাভ নেই। প্রবোধ দিই মনকে।

ঢিমে তালে হলেও বেশ গেয়ে চলেছিল জাহাজখানা। হঠাৎ বেতালা এক ঠেকার টোকা দিয়েই সুরটা কেটে দেয় স্পার্কি। বিপদ। বিপদে পড়েছে একটি জাহাজ। এস, ও এস, পাঠিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম হয়— মুখ ঘোরাও জাহাজের। গতি কমাবার দরকার নেই। হ্যাঁ, পূবে। ত্রিশ দ্রাঘিমা, পঁয়তাল্লিশ অক্ষাংশে। হুকুমের পর হুকুম আসতে থাকে মাস্টারের কাছ থেকে। ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে জাহাজের সকলে। ওপরে না গিয়েও বুঝতে পারি দূরবীন হাতে মাস্টার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। দেখে চলেছে সমুদ্রের বুকে কোথায় দেখা যায় সেই বিপদগ্রস্থ জাহাজটিকে। বোট নামাবার জন্যে প্রস্তুত লস্করেরা। শুধু সেই অসহায় জাহাজটিকে দেখতে পেলেই হয়। এক ঘণ্টার রাস্তা, মনে হয় যেন কত যুগ ধরে পার হ'য়ে এলাম। এতক্ষণে সেই জাহাজখানির ইসারা আসে চোখে। খোদ জিনিসটি নয়। শুধু দেখা যায় সমুদ্রের বুক চিরে আগুনের বিরাট একটি শিখা উঠছে ওপরে। মানুষজন কিছুই নজরে আসে না। দৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকে না অতদূরে। সমান বেগে ছুটে চলেছি আমরা। এ ছোটার বুঝি আর শেষ নেই। আরও বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে যেতে তবে স্পষ্ট হয় জাহাজটি। না, যাত্রীবাহী নয়, মালবাহী। মন্দের ভাল। যারা আছে ওটাতে তারা সবাই পূর্ণবয়স্ক এবং সংখ্যাতেও খুব বেশি নয়। জাহাজের এক অংশ জ্বলছে দাউ দাউ করে। অপর অংশে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সকলে। বোট নামাবার সুযোগ জোটেনি বোধহয়। লাইফ-বেল্ট নিয়ে তৈরি। সাহায্য না পেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমাদের দেখতে পেয়েই চীৎকার ক'রে ওঠে তারা। ঢেউ-এর মাথায়

তুলতে তুলতে ছুটে চলতে থাকে সেই চীৎকারের ঢেউ। সাড়া দেয় আমাদের লস্করেরা। অভয়দানের সুর।

প্রথমেই নামিয়ে দিল ওরা তুটি অর্দ্ধদগ্ধ দেহ। কাজ করছিল ইঞ্জিন-ঘরে, এমন সময় ফেটে যায় ইঞ্জিন। জ্বলন্ত তেল ছিটকে এসে পড়ায় এই অবস্থা হয়েছে তাদের। একজনের তবুও একটু জ্ঞান আছে আর একজনের তাও নেই। বীভৎস হয়েছে চেহারা তুটি। একজনের গালের এক পাশে বলতে গেলে আর কিছুই নেই। অতি সাবধানে তাদের নামিয়ে নিয়ে এসে শুইয়ে দেওয়া হয় বোটের ওপরে। তারপর একে একে নেমে আসে সকলে হালের পাশের লোহার সিঁড়িটা বেয়ে।

তুর্ঘটনায় আক্রান্ত মানুষ তুইটিকে নিয়ে এসে ডেকের ওপরে শুইয়ে দিতেই ছুটে যাই আমাদের ওষুধপত্রগুলি খুঁজে দেখতে। যদি ওদের জ্বালার উপশম করবার মত কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সুধু ছুটোছুটিই সার। হাসি পায় দাওয়াইএর ব্যবস্থাটি দেখে। তুঃখও হয় আমাদের জীবনের এই স্বল্পমূল্যতায়। কয়টি শিশিতে পড়ে রয়েছে কতকগুলি ট্যাবলেট। আইডিনের শিশিটি প্রায় খালি। আর আছে কিছু ম্যাকসাল্‌ফ্‌। শিশির তাকের নীচে এক তা কাগজে সুন্দরভাবে টাইপ করা রয়েছে কোন ওষুধে কি কি অসুখ সারে।

হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকি শিশিগুলির দিকে। আছেত' কতকগুলি সাল্‌ফাগুইনিডিন, এনটেরোকুইনল, কুইনিন, এমনিই আর কয়েকরকম বড়ি। কিন্তু টাইপ করা নির্দেশনামায় লেখা নেই মানুষ পুড়ে গেলে কুইনিনএর প্রলেপ দিতে হবে, না এনটেরোকুইনল খাওয়াতে হবে। মাথা নীচু ক'রে ফিরে আসি আমাদের এতগুলি মানুষের জীবন নিয়ে পরিহাস করা দাওয়াখানা থেকে। ওদের একমাত্র ওষুধ হচ্ছে সমুদ্রের বাতাস আর নিজেদের লড়াই করবার ক্ষমতা। এতে যদি বেঁচে ওঠে তো উঠল। না বাঁচে, ঐ সমুদ্র তার বিরাট বুকখানি পেতে দিয়ে রেখেছে এইসব হতভাগ্যদের জন্যে।

পোর্টসৈয়দ অবধি আর পৌঁছুতেও হয়নি, তার পূর্বেই শেষ হ'য়ে গেল একজন। অপরজনকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হ'ল সৈয়দএর এক হাসপাতালে। তারপর তার খবর আর পাইনি।

এডেনে পৌঁছুতেই চিঠি এল হাতে। বিভা লিখেছে। বেশি কিছু লিখবার মত অবসর জোটেনি বোধহয়। তাড়াতাড়িতে দু'কলম লিখে ছেড়ে দিয়েছে—দাদা, যেমন বিপদ বৌদির তেমনি বিপদ আমাদের। মার অসুখ খুব বাড়াবাড়ি হ'য়েছে এবার। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার চেষ্টা কর।

বাস্, এইটুকু মাত্র চিঠি। এতেই মাথা ঘুরে গেল আমার। চোখদুটো আপনিই গিয়ে পড়ল ঐ সমুদ্রের ওপরে। সূর্যের আলো পড়ে সহস্র দাঁত বের করে হাসছে। ব্যঙ্গ করছে আমাকে। সামনে বিরাট আরব সাগর, তারপর বঙ্গোপসাগর, তারও পরে গঙ্গা, তবে বাড়ী। এক একটি দিন যাবে এক একটি বৎসরের ধাক্কা দিয়ে। উতলা মনের ঘড়ির কাঁটা আবার সহজে নড়ে না। না গিয়ে পৌঁছুন পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কিন্তু চিনু কোনও চিঠি লেখেনি কেন? তার বিপদ কি আমার বিপদ নয়? আজ কি তার কাছে এতই পর হ'য়ে গিয়েছি আমি? ক'লকাতার বন্দর ছাড়বার আগেত' তা ছিলাম না। অশান্তির বীজ বড় তাড়াতাড়ি বৃক্ষ প্রসব করে। শাখায় প্রশাখায় বিস্তার লাভ করতে থাকে দুশ্চিন্তার সার পেয়ে। ইঞ্জিনঘরে গিয়ে ঢুকি যখন তখন শুধু একই চেষ্টা থাকে আমার—কি ক'রে জাহাজটিকে আরও দ্রুতগামী করা যায়।

পথ অন্তহীন নয়। শেষ-তার থাকবেই। আমার পথেরও শেষ হয়। কেবিনের চাবিটা সুখানীর হাতে ধরে দিয়ে ছুটে নেমে যাই জাহাজ থেকে। রাস্তায় পড়েই তাকাই এদিক ওদিক। নেই, একটা ট্যাক্সিও নেই কোথাও। না থাকল ট্যাক্সি, ট্রাম আছে। ছুটতে থাকি হাইকোর্ট ট্রামডিপোর দিকে। ডিপোয় পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ি। সেই ঝুপড়িগুলি আর নেই। তাহ'লে দিনেশ, ফক্তি ওরা কোথায় গেল? অফিস বসবার বা ছুটি হওয়ার সময় নয়। ট্রামের সংখ্যাও তাই কম। ডিপোয় ট্রাম নেই একটিও। পায়ে

পায়ে এগিয়ে যাই রিলিফ অফিসের দিকে। যদি দিনেশের খোঁজ মেলে। মেলে না। কোথাও নেই দিনেশ। ফিরে আসতে যাব, সামনে এসে দাঁড়ায় একটি বুড়ি।

বাবা—

চিনতে পারিনা তাকে। কোনদিন দেখেছি বলে মনেও পড়ে না।

আমাকে বলছেন? জিজ্ঞাসা করি।

তয় আর কারে কমু? বলে সেই বৃদ্ধা যাকে আমি খুঁজছিলাম তারই কথা শোনাতে থাকে। আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার পরই নাকি দিনেশ রেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করেছে ফন্তিকে। এখানকার ঐ রিলিফ অফিসের সামনে বসে মুহুরীর কাজ ক'রে যা পেত তাইতেই চলে যেত ওদের দু'জনের দিন। এরই ভেতরে একদিন একটি বিধবা স্ত্রীলোক এসে হাজির। দিনেশ নাকি তাকে জড়িয়ে ধরে মা মা ক'রে খুব কেঁদেছিল। কেঁদেছিল দিনেশের মাও। মেয়ে জামাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ী থেকে। গঙ্গার ধারে ধারে খুঁজছিল তার ছেলেকে। তারপর এখানে লোকজন দেখে এসে দাঁড়ায়। মনে আশা, এত মুখের ভেতরে তার চেনামুখটি যদি থাকে।

ফন্তি কি য্যান বলিয়া উঠছিল বাবা, আর লগে লগেই তোমার বন্ধুর কি হাঁক। আমি ওয়াদের লগেই খাড়ান আছিলাম। চম্‌কাইয়া উঠছিলাম বাবা। মুখচোখে সেই ভাবটিই আনবার চেষ্টা করে বৃদ্ধা—কি চোখ দু'হান! ফন্তিরে এক্কেরে গিল্যা খাইবো য্যান্। তারপরই কইলো—ক্ষমা চাও, ক্ষমা চাও মার পা ধরিয়া। কও, আর কোনওদিনও একটি কতা কইবা না মারে।

ক্ষমা চাইল ফন্তি? ঔৎসুক্য কম নয় আমার।

চাইবো না! দিনেশের গর্বে নিজেই যেন গর্বিতা হ'য়ে ওঠে বৃদ্ধা। বলে—মায়ের উপুর অমন টান দ্যাহোন্ যায় না। তারপরই চুপ্‌সে যায়—আমারও এট্টা পোলা আছে বাবা, খাইতে দেয় না। ঐখানডায় পিঁড়া পাইতা ভর দিন পান বেচি,তয় একবেলা খাইতে জোঠে।

তা, ওরা কোথায় গেল জান কিছু?

হ, সেই কথাইত' কই। গঙ্গার উপারে ঐ তেলকল ঘাট না কি কয়, ঐধারেই গেছে। বাসা করছে নাকি।

আঁচল থেকে একটুকরো কাগজ খুলে নিয়ে দেয় আমাকে।

এইখানে ত' আর আসে না। একদিন আইছিল ছোটতে ছোটতে, কাগজখান দিয়া তোমারে দিতে কইয়া গেল।

আমাকে চিনতেন ?

চিনুম না ক্যান্ ? দেখছিত' কয়ডা দিনই।

চেনাচিনি নিয়ে আর প্রশ্ন করি না। চিরকুটখানা খুলে পড়ি। শুধু তেলকলঘাট স্ট্রীটের একটা ঠিকানা দেওয়া আছে। আর নীচে লেখা আছে—বিশেষ দরকার। দেখা করবি নিশ্চয়ই। ইতি দিনেশ।

বেশ, করব দেখা। কিন্তু এখন আর কিছুই হওয়ার নয়। ঐ একখানা ট্রাম আসছে। একখানা ট্যাক্সিও এসে থামল। নামলেন মেদবহুল চেহারা, কাঁচি ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী, ঘড়ি, আংটিতে সাজ্জত একজন প্রকৃত উদ্বাস্তু। রিলিফ অফিসের সাহায্য ছাড়া তাঁর চলছে না নিশ্চয়ই। যাই হ'ক্, তাঁকে দিয়ে আমার কোনও দরকার নেই। দরকার ট্যাক্সিটাকে। ছুটে গিয়ে ওটাকে ধরতেই ড্রাইভার বলে ওঠে—ওয়েটিংমে হায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে হয় ট্রাম ডিপোর দিকে। ট্রামত' আর কারও জন্যে ওয়েটিংএ থাকবে না। ঠিক সময়ে ছেড়ে দেবে।

বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন মা। অহেতুক দেরি করেনি এবারে জাহাজ। টেনে গিয়েছে, টেনে চলে এসেছে। কোস্ট্যাল জাহাজ ছাড়া বিদেশগামী জাহাজ এত অল্পদিনে ফেরে না বড় একটা। কত আর, মাস চারেক হবে। তার ভেতরই মায়ের এই অবস্থা। কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। বেলা বারোটায় বাড়ীতে এসে পেঁাচেছি। এখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। এতক্ষণ সময়ের ভেতরে বার দুই তিন 'বৌমা' শব্দটি ছাড়া আর কিছুই বলেননি মা। মুখের ওরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি আমি। সান্ত্বনা দিয়েছি—যাব মা, আজই যাব তার কাছে। যদি একবস্ত্রে সে চলে আসে আমার সঙ্গে তবেই সে এ বাড়ীর বৌ, নইলে সে এ বাড়ীর

কেউ নয়। আমার কথা শুনে মায়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে হেসেছে বিভা। বুঝে পাই না আমি এতে হাসবার কি আছে। আমার কথায় কি কোনও দুর্বলতার ইঙ্গিত ছিল? কৈ, আমার ত' মনে হয় না তা। তবে? এ মেয়েটিও কেমন হেঁয়ালিমার্কা হ'য়ে উঠছে আজকাল। দাঁড়াও না, চোখের শাসন দিয়ে বলি, তোমার ব্যবস্থা এইবা'র করছি আমি। ঘুরে যায় চিন্তা। যেতে হবে একবার সমরদের বাড়ী। যাবার নতুন ক'রে ব্যবস্থা করতে হবে সব। ওর বিয়ে দিয়ে তবে আবার বাইরে যাওয়া আমার।

হ্যাঁরে, ডাক্তারবাবু কিছু বলেছিলেন? জিজ্ঞাসা করি বিভাকে।

কিছুই না। উত্তর দেয় ও—শুধু বললেন, বয়স হয়েছে।

ছাতু হ'য়েছে। রাগ ধরে যায় ডাক্তারের ওপরে। মায়ের বয়সী কত ভদ্রমহিলাকে দেখেছি হন্ হন্ ক'রে রাস্তায় চলতে।

কথা থেমে গিয়েছে আমার। আটকে গিয়েছে ভাবনার বেড়ায়। তাহ'লে? শারীরিক নয়, অসুখটা সম্পূর্ণ মানসিক! কার জন্যে এত চিন্তা? বিভার? নিশ্চয়ই নয়। তার জন্যে ত' আমি আছি। তাহ'লে কি আমার জন্যে? হ'তে পারে। আমার কথা মা ছাড়া আর কে ভাববে? ঠিক আছে। এ ভাবনারও শেষ ক'রে ফেলব এবার।

দাদা, বৌদির বাবা—কি একটা কথা বলতে যায় বিভা। শোনবার প্রবৃত্তি হয় না আমার। ধমক দিয়ে উঠি—থাম্। সেই ভদ্রলোকের জন্যেই তো মায়ের এই অবস্থা।

নেই। তবুও কথাটা শেষ করে বিভা।

নেই! চমকে উঠি ওর কথা শুনে। কৈ, আমাকে ত' জানায়নি কিছু। এতবড় একটা বিপদ গেল মাথার ওপর দিয়ে—কে জানে, আবার কি হয়েছে ওর। যতই দেখছি ততই দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। বসে থাকবার আর সময় নেই। এখুনি দেখা করতে হবে ওর সঙ্গে। লাফ দিয়ে উঠে জামাটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। পিছন থেকে বিভা কি একটা কথা যেন জিজ্ঞাসা করেছিল। ভালমত কানেও যায়নি কথাটা। উত্তরও কি একটা দিয়েছিলাম। তারপরই বড় রাস্তার দিকে ছুটেছিলাম। ট্যাক্সি চাই একটা।

প্রথমেই হেড অফিস। ছুটি চাই হু'মাসের। এ ছুটি আমাকে দিতেই হবে। না দেয়, ছেড়ে দেব কাজ। এতগুলো বয়লারের কাজ শিখেছি, আর কোথাও জুটিয়ে নেওয়া যাবে না একটা চাকরী? ট্যাক্সির চাকার সঙ্গে চিন্তার চাকাটি যেন বেল্টের সূত্রে গাঁথা। হুটিই সমানে ঘুরে চলেছে। বিদেশের উপকূলের টানে জীবনের উপকূল থেকে ছিটকে গিয়েছি আমি। পারছিনা আর তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে এসে ক্রশ-চেনে বাঁধতে। মনে পড়ে গানের কলিটি—যতবার আলো জ্বালাতে যাই, নিভে যায় বারে বারে। সারাজীবন ধরে এই একোদ্যোগী হ'য়ে থাকা, এ এক বিষজ্বালা হ'য়েছে। সহ্য হচ্ছে না আর।

হেড অফিস থেকে সুখবর মিলে গেল একটা। জাহাজ চলেছে ড্রাই-ডকিংএ। যাক্ বাবা, বাঁচা গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। একমাসের ওপরের ধাক্কা। একবার ক'রে মুখ দেখিয়ে আসা গোছের কাজ। ছুটির দরখাস্তের আর প্রয়োজন নেই। ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ি কোম্পানীর বাড়ী থেকে। এবারে লক্ষ্যস্থল বেহালা।

যিনি এসে দরজা খুলে দিলেন তাঁকে আন্দাজে চিনতে হয়। চিন্ময়ের স্ত্রী। একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে একটিমাত্র নেতিবাচক উত্তর এবং তারপরই বন্ধ হ'য়ে যায় দরজাটা। মানুষ যে মানুষের সঙ্গে এতখানি অভদ্রতা করতে পারে তা এর পূর্বে আমার অভিজ্ঞতায় ছিল না। আমাকে না চিনতে পারেন, তাতে কি হয়েছে? 'চিনু আছে?' জিজ্ঞাসা করবার সঙ্গে সঙ্গে 'এখানে থাকেনা' বলে দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার কি অর্থ হয়? আমার দ্বিতীয় প্রশ্নও ত' থাকতে পারে। কিন্তু—কিন্তু এখন কি করা যায়? কোথায় খোঁজ পাওয়া যাবে চিনুর? তাহ'লে কি কোনও মেয়েদের হোস্টেলে উঠে গিয়েছে? স্কুলে গেলে হয়ত'—না, স্কুলও এতক্ষণে ছুটি হ'য়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। চিন্তার কাঁটাটা ঘুরেই চলেছে। ট্যাক্সির চাকার মত। চিনুর খোঁজ নেওয়া, মায়ের অসুখ, বিভার বিয়ের ব্যবস্থা করা। তুলছে জাহাজখানা। অশান্ত বে-অফ্-বিস্‌কে। জলের ঝাপ্‌টা এসে লাগে গায়ে।…হাঁরে দিনেশ, আমরা যে ভজহরিকে বাঁচাতে ঘেরাও

করলাম মাস্টারকে, মিউটিনীয়ার বলে জেল হবেনাত' আমাদের ?··· পাগলা নাকি ? মাস্টার জানে যে সাক্ষী পাবে না একজনও। আর এটা যে মিউটিনি নয়, দেশাভিমান, তাও সে জানে। ···তোমাকে কোনদিন ভুলব না অশোক···আমিও যদি তোমাকে কিছু দিতে পারতাম।···কে যেন তীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে উঠল হ্যাচের ওধার থেকে—আঁই যাইয়ামরে কফিল—খাড়াইয়া যা। ইঞ্জিনঘরের নাড়ী টিপে ্য়েছি কণ্ট্রোল প্যানেলে। অতন্দ্র প্রহরী। প্রহরা দিয়ে চলেছি—

কোনদিকে যাব ?

চমকে উঠি ড্রাইভারের প্রশ্নে। ঝিমিয়ে পড়েছিলাম বুঝি। স্বপ্ন দেখছিলাম। তাড়াতাড়ি রাস্তার নির্দেশ দিই। কি রকম ভার মনে হচ্ছে মাথাটা। বিশ্রাম দরকার। স্নানেরও। না, আগে ঘুম। পরিশ্রান্ত মন। দপ্ দপ্ করছে মাথাটার ভেতরে। কে জানে, কি চাই। কিছুই বুঝতে পারছি না। এঁটে আসছে ত্ব'চোখের পাতা। কোনরকমে ট্যাক্সিভাড়াটা মিটিয়ে দিয়েই সোজা গিয়ে ঢুকি নিজের ঘরে। মাতালের মত টলতে টলতে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম খেয়াল নেই। কে যেন গা ধরে জোর নাড়া দিতে লাফিয়ে উঠে বসে দেখি বিভা। আমি উঠে বসতেই বলে, শিগ্গীর এস, মা যেন কেমন করছে। এর বেশী আর শোনবার ধৈর্য থাকে না। ছুটে মায়ের ঘরে এসে ঢুকতেই দেখি মাকে ত্ব'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছে চিনু। তার সবল হাত ত্ব'খানির ভেতরে নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়ে একটু শান্ত হ'য়েছেন মা। কিন্তু উত্তেজনার আভাষ পাওয়া যায় শ্বাস প্রশ্বাসের ঘনত্বে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি খাটের ধারটিতে। ধী ধীরে সহজ হ'য়ে আসে শ্বাসক্রিয়া। মাকে ভালভাবে শুইয়ে দিয়ে বিভার দিকে তাকায় চিনু। বলে—মায়ের কাছে একটু বস ঠাকুরঝি।

তুমি বস। বলে বিভা—স্বপ্ন দেখে আবার আঁৎকে উঠলে ঠে পারব না আমি। তার চাইতে আমি দাদাকে খেতে দিইগে' যাই।

যা বলছি তাই কর। চিনুর গলায় এবারে হুকুমের সুর ফুটে ওঠে।

আর বিভাও মেনে নেয় তা। এগিয়ে এসে বসে মায়ের মাথার কাছে।